প্রকাশনার ৮৫ বছর

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী

সংখ্যা : ১৩ ❖ ১৩ - ১৯ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

পুনরুত্থান সংখ্যা - ২০২৫

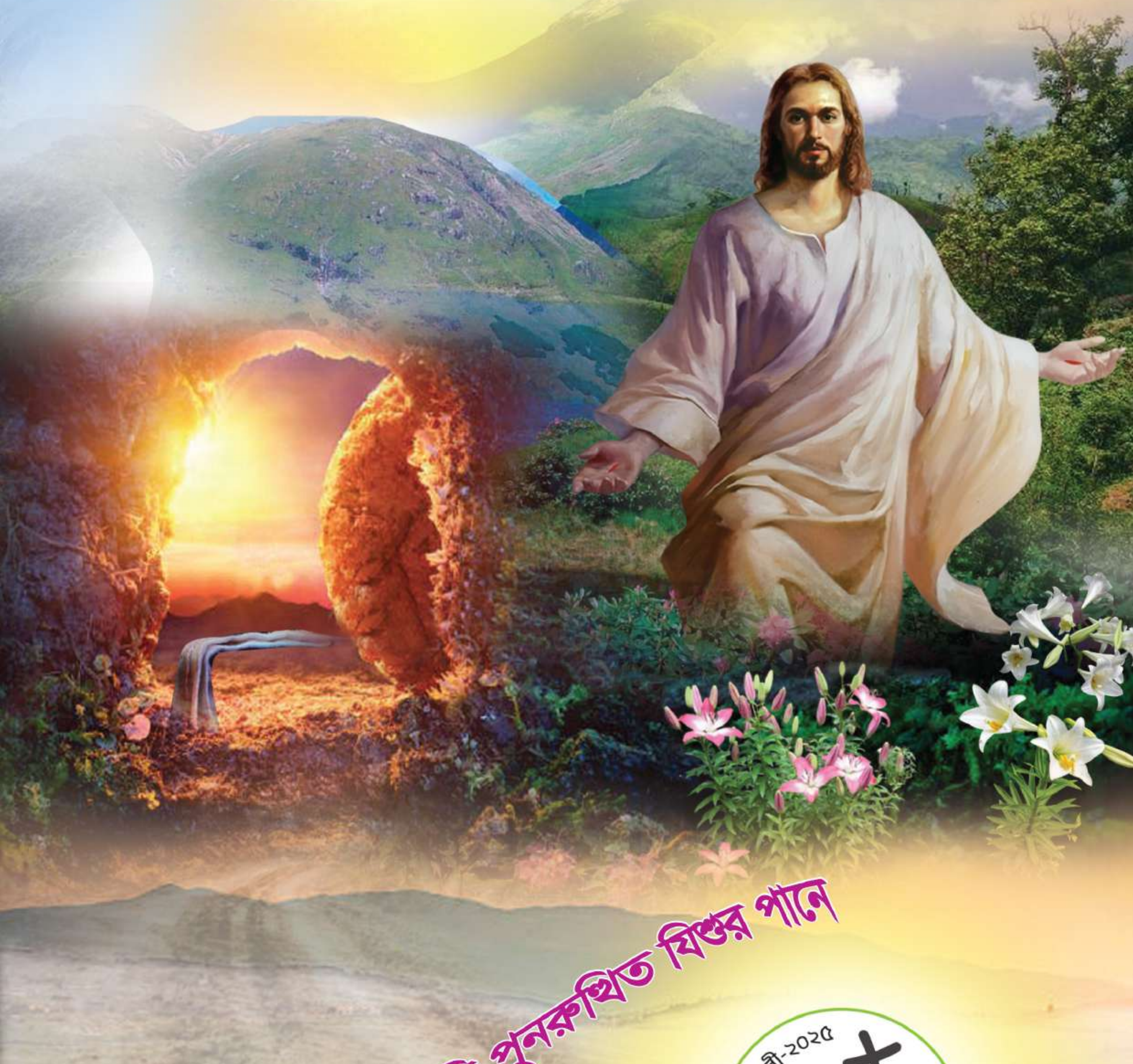

আশা নিয়ে যাত্রা করি পুনরুত্থিত যিশুর পানে

জুবিলী-২০২৫

আশার তীর্থযাত্রী

১৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী

ঈশ্বর তোমার আত্মাকে
অনন্ত শান্তি দান করুন।

প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ

জন্ম : ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

১৪ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, দেখতে দেখতে ১৫টি বছর পেরিয়ে গেল। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছ তুমি। আমরা সবাই তোমার শূন্যতা মনে প্রাণে সর্বক্ষণ অনুভব করি। আমরা বিশ্বাস করি, পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের জন্য তুমি তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রদান করো, যেন একদিন তোমার সাথে প্রভুর রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তুমি ছিলে, তুমি থাকবে, আমাদের সবার অন্তরে এবং তোমার সকল কাজে।

তোমারই প্রিয়জনেরা

ছেলে ও ছেলে বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ - মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জ্বলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইম্মানুয়েল সি গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক, আনন্দ ও টাইগো
৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার (পারুল ভিলা)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য জেভিয়ার টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ১৩
১৩ এপ্রিল - ১৯ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
৩০ চৈত্র - ০৬ বৈশাখ, ১৪৩১-১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

যিশুর পুনরুত্থান ও আশার তীর্থযাত্রাতে আমরা

২০ এপ্রিল, রোববার। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা মহাসমারোহে পালন করবে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান মহোৎসব পাস্কা বা ইস্টার সানডে। খ্রিস্টবিশ্বাসী সবাই উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠবে: আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ জয় জয় প্রভুর জয়। গত ১৮ এপ্রিল ছিল গুড ফ্রাইডে বা পুণ্য শুক্রবার; স্মরণ করা হয়েছে যিশুর পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু। মানুষ কৃচ্ছ্রসাধন করে, উপবাস থেকে নিজ পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে; নিজ পাপ স্বীকার করে ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে হয়েছে পুনর্মিলিত। আজ আনন্দের সঙ্গে স্মরণসহ পালন করা হচ্ছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান।

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থের পাতায় সীমাবদ্ধ এক অলৌকিক ঘটনা নয়। এটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তি, আমাদের আশার প্রাণস্পন্দন, এবং সারা বিশ্বের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের আজীবন যাত্রার সূচনা। যিশুর পুনরুত্থানে মানুষের জীবনে উষার আলোর উদয় হয়েছে। যে সকালে প্রথম ইস্টারের সূর্য উদিত হয়েছিল, তা কেবল শূন্য সমাধিকে আলোকিত করেনি। এটি মানব ইতিহাসের উপর এক ঐশরিক আলো ফেলেছিল।

যিশুর পুনরুত্থানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মৃত্যুই শেষ নয়, আছে অনন্ত জীবন। অন্যায়-অত্যাচার-অন্ধকার কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আলো আসবেই- যিশুর পুনরুত্থান এই আশাই আমাদেরকে দান করে। কবর থেকে উঠে এসে খ্রিস্ট পাপ ও নিরাশার শৃঙ্খল ভেঙে দিয়েছেন। তিনি জীবনের অর্থ নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। শুধু অস্তিত্ব বজায় রাখার মতো যেনতেন ভাবে চলা নয়, বরং জাগ্রত হওয়া, নিত্য নিজেকে নতুন করা, এবং শাশ্বত প্রতিশ্রুতির আলোয় চলাই প্রকৃত জীবন।

পুনরুত্থান অতীত ঘটনার শুধু স্মরণোৎসব নয়। এটি একটি জীবন্ত ও সক্রিয় শক্তি, যা আমাদের প্রত্যেককে আশার তীর্থযাত্রায় অংশ নিতে আহ্বান করে। আমরা বর্তমানে এমন এক পৃথিবীতে রয়েছি যেখানে অন্ধকার প্রায়ই আলোর চেয়ে প্রবল মনে হয়। এখানে আছে শোকের উপত্যকা, সন্দেহের মরুভূমি, এবং অনিশ্চয়তার খাড়া পাহাড়। তবুও, আমরা একা চলি না। আমরা চলি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে, যিনি আমাদের সাথেই আছেন এবং চলার পথ আলোকিত করে চলেছেন। যিশুর পথে চলতে আমরা আশাবাদী। খ্রিস্টীয় অর্থে আশা কোনো কল্পনাপ্রসূত চিন্তা নয়। এটি এক অটল আস্থা, যা সমাধি নয় পুনরুত্থানে মনোযোগী। পুনরুত্থান বা শাশ্বত জীবনের দিকেই প্রত্যেকজন মানুষের চিরন্তন যাত্রা। আসলে প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসী এক একজন তীর্থযাত্রী হয়ে ওঠে কোনো দূরবর্তী গন্তব্যের দিকে নয়, বরং গভীর বিশ্বাস, পরিপূর্ণ ভালোবাসা, এবং ঈশ্বরের হৃদয়ের দিকে যাত্রা করেই।

আশার এই তীর্থযাত্রা আমাদের আহ্বান জানায় এক পুনরুত্থান-ভিত্তিক জীবনের জন্য। এটি এমন এক জীবন যেখানে আমরা সাহস করে ক্ষমা করি, নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসি, এবং বিশ্বাস করি যে নতুন জীবন সবসময় সম্ভব। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ইস্টার একদিনের নয়, বরং তা প্রতিদিনের জীবনযাপনে প্রকাশমান।

এ বছর বাংলা নববর্ষ, পাস্কা বা ইস্টার সানডের এক সপ্তাহ আগেই পালন করেছি। নববর্ষ তো নতুন জীবনই ঘোষণা করে। নতুনকে স্বাগত জানিয়ে সেদিন গেয়ে উঠেছিল, : এসো হে বৈশাখ, এসো এসো। একইভাবে আমরা এই পুনরুত্থান উৎসবে নতুন জীবনকে স্বাগত জানাই। আমাদের জীবন ঘোষণা করুক যে আমরা কথায়, কাজে, আচরণে, সম্পর্কে, ধর্মীয়, সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক অঙ্গনেও নতুন হয়ে ওঠবো। নতুন হবার আশা নিয়ে পাস্কা বা পুনরুত্থান পর্ব পালন করি আনন্দ নিয়ে।

এই আনন্দের দিনেও একটি আক্ষেপ! ইস্টার তথা যিশুর পুনরুত্থান-রহস্য খ্রিস্টধর্মের অন্যতম একটি প্রধান ধর্মীয় বিষয় ও উৎসব হওয়া সত্ত্বেও দিনটি ছুটির দিন নয়। অধিকন্তু এই দিনের আগে পরে পরীক্ষা থাকায় এই দিনটিতে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা মুক্তধারায় মহোৎসবটি পালন করতে পারছেন না। ধর্মপ্রাণ মানুষের দেশ বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন ও আনন্দ যথাযথভাবে করার জন্য যেখানে ছুটির দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে খ্রিস্টান সমাজ ইস্টার সানডেতে ছুটি প্রত্যাশা করতেই পারে। দেশের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিষয়টি বিবেচনায় আনবেন, এটি খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদের সবার আশা।

পুনরুত্থিত যিশুর শান্তি ও আনন্দ সবার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। শুভ পাস্কা, শুভ পুনরুত্থান, হ্যাপি ইস্টার!! খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া!! †

কেননা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না। *(যোহন ২০: ১-৯)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সূচীপত্র

প্রবন্ধ

- আর্চবিশপের বাণী - *আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই* ◆৫
- কাথলিক বিশ্বাসের ভিত্তি: খ্রিস্টের পুনরুত্থান - *ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং* ◆৬
- খ্রিস্টের পুনরুত্থান: ঐশ-আশার তীর্থযাত্রী হওয়ার আহ্বান - *নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি* ◆৭
- বলিকৃত মেষশাবক : নিস্তার রহস্যের অনুধ্যান ...... - *ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি* ◆৯
- পুনরুত্থানের তাৎপর্য এবং আমাদের শিক্ষা - *যোগেন জুলিয়ান বেসরা* ◆১০
- শূন্য সমাধি থেকে এক রূপান্তরিত বিশ্ব: ইস্টারের .... - *ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও* ◆১২
- জেরুশালেমের পুণ্যভূমিতে আমার... - *সিস্টার ফ্লোরেন্স মিতা দাস এসএসএমআই* ◆১৫
- পুনরুত্থান পর্ব ও খ্রিস্টীয় জীবন - *ফাদার দিলীপ এস. কস্তা* ◆১৭
- পাপময় জীবন পরিত্যাগের ভাবনায় হোক পুনরুত্থান উৎসব - *ফাদার নরেন জে. বৈদ্য* ◆১৯
- যিশুর পুনরুত্থান ও আমাদের মুক্তি - *মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া* ◆২০
- যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসের যাত্রা - *ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি* ◆২১
- যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান এবং খ্রিস্ট ধর্মের চূড়ান্ত বিশ্বাস - *যোসেফ শ্যামল গমেজ* ◆২২

খোলা জানালা

- শতবর্ষের জুবিলী উৎসব: বাইবেলীয় ও মাণ্ডলিক অনুধ্যান - *ফাদার শিপন পিটার রিবেরু* ◆২৩
- জুবিলীবর্ষ: পরিবারে আশার তীর্থোৎসব - *ড.ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা* ◆২৫
- ওয়ারিশান সম্পত্তি অশান্তির উত্তরাধিকার - *ড. ইসিদোর গমেজ* ◆২৮
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা - *চয়ন হিউবার্ট রিবেরু* ◆৩২
- দক্ষতার ঘাটতি পূরণে প্রযুক্তিনির্ভর কারিগরি.. - *জেমস্ গোমেজ* ◆৩৪

মহিলাঙ্গণ

- প্রভু যিশুর নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা.... - *হেলেন রোজারিও* ◆৩৬
- সাদা-কালো জীবন-১২ - *মালা রিবেরু* ◆৩৬

যুব তরঙ্গ

- শিক্ষাগত যোগ্যতা নাকি দক্ষতা: বাংলাদেশের... - *ড. স্যান্ডি ফ্রান্সিস পিরিস* ◆৩৮
- পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যুবদের আদর্শ ও শক্তি - *ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি* ◆৩৯
- এসো হে প্রাণের বৈশাখ - *ব্রাদার অংকন পিটার রিবেরু* ◆৪১

ব্যক্তিত্ব/স্মৃতিকথা

- সুবাসদাকে যেমনটি দেখেছি - *ডেভিড স্বপন রোজারিও* ◆৪২

ভ্রমণ কাহিনী

- অপরূপ শ্যামদেশ - *রক রোনাল্ড রোজারিও* ◆৪৩

স্বাস্থ্যকথা

- হার্ট অ্যাটাক কেন হয়, লক্ষণ ও তাৎক্ষণিক করণীয় ◆৪৫

গল্প

- রাগ যখন পানি - *শিউলী রোজলিন পালমা* ◆৪৬
- অতিথি নারায়ণ - *সাগর কোড়াইয়া* ◆৪৭
- বাঘিনী কন্যার বিয়ে - *সুনীল পেরেরা* ◆৪৮
- ভয় - *খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন* ◆৫২
- শ্যামলের সুরা বিহীন উৎসব - *সুমন কোড়াইয়া* ◆৫৫
- ফিরে পাওয়া জীবন - *ফাল্গুনী ডি কস্তা* ◆৫৭
- আলোর পথে ফেরা - *প্রদীপ মার্সেল রোজারিও* ◆৫৮
- আমার প্রতি যিশুর আহ্বান - *সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ* ◆৬০
- নয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তবুও ভয় - *অসীম বেনেডিক্ট পামার* ◆৬১

ছোটদের আসর

- মিলনেই আনন্দ - *দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ* ◆৬২
- বিশ্বমণ্ডলীর সংবাদ - *ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু* ◆৬৩

পুনরুত্থান পর্বের শুভেচ্ছা

মুক্তিদাতা ও জগৎ পরিত্রাতা প্রভু যিশুর পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ জাতি, ধর্ম-বর্ণ সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। আমাদের প্রতিটি হৃদয়ে বর্ষিত হোক পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রেম ও শান্তি, মুক্তির লক্ষ্যে উৎসব হোক মঙ্গলময়। আপনাদের সকলকে জানাই পুণ্যময় পাস্কার প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা।

ঘোষণা

পবিত্র পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ১৮ - ২১ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ইস্টারের ছুটি বিধায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর (২০-২৬ এপ্রিল) সংখ্যা প্রকাশ হবে। তাই পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশ পাবে ২৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে। - সম্পাদক

পুনরুত্থান উৎসব উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা

বাংলাদেশ টেলিভিশন

পুনরুত্থান রবিবার (২০ এপ্রিল) : "হাত দু'খানি দেখ"

সময় : রাত ১০টার ইংরেজি সংবাদের পর (সময় পরিবর্তীত হলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ফেইসবুক পেইজ ও স্থানীয় পাল-পুরোহিতদের মাধ্যমে)।

মূল রচনা : **ডেভিড প্রণব দাশ**

নাট্যরূপ : সুনীল পেরেরা

ব্যবস্থাপনায় : বাণীদীপ্তি

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও ইউটিউব চ্যানেলে থাকছে ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী: www.facebook.com/weeklypratibeshi

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী: ইউটিউব চ্যানেলে
www.youtube.com/@ WeeklyPratibeshi

নিয়মিত ধর্মীয় গান শুনতে ভিজিট করুন:
বাণীদীপ্তি: www.youtube.com/@BanideeptiMedia

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে
আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ ওএমআই
এর বাণী

আমরা খ্রিস্টানগণ বিশ্ব মণ্ডলীর সাথে প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান পার্বণ অর্থাৎ ইস্টার সানডে পালন করছি। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার পঁচিশ বছর পূর্বে ঈশ্বর তনয় যিশু খ্রিস্ট মানব পরিত্রাণের জন্য এ ধরাতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন। যিশুর জনপ্রিয়তা এবং ঈশ্বর ও মানবমুখী নতুন ধরনের শিক্ষা ও নীতিবোধ প্রচারের কারণে ইহুদী ধর্মনেতারা তার বিরোধিতা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত রোমান শাসকের মধ্য দিয়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন।

প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান হলো খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্রিয় বিশ্বাস। খ্রিস্টধর্ম দাঁড়িয়ে আছে এই সত্যের উপর, যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন এবং তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করেছেন। জীবিত প্রভু হিসাবে তিনি শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছেন। তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং স্বর্গে পিতার দক্ষিণ পাশে উপবিষ্ট হয়েছেন। তিনি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করে তারাও মৃত্যুবরণ করবে না। তারা সবাই অনন্ত জীবন লাভ করবে।

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের এই শিক্ষা দান করে যে, আমাদের জীবনেও আমরা যেন পুনরায় উত্থিত হই। আমরা দীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্তানত্ব লাভ করেছি। মন্দতা, অসত্য ও অন্যায্যতাপূর্ণ জীবন থেকে এখন উঠে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সময়। আমরা আমাদের পাপময় ও পুরাতন জীবন পরিত্যাগ করে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের জীবন, আলো ও সত্যের পথে জীবন যাপন করি। যিশুর পুনরুত্থান আমাদেরকে আরও শিক্ষা দান করে যে, সত্যকে কখনও কবর দিয়ে চাপা দেয়া যায় না, দিলে সত্য আরও শক্তিশালী হয়ে জেগে উঠে। সত্য, ভালবাসা ও ন্যায্যতা একদিন জয়ী হবেই। মিথ্যা ও অসত্য চিরতরে পরাভূত হবে। যারা যিশুর কথায় ও কাজে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুসারে জীবন ধারণ করে তারাও যিশুর মত মৃত্যুকে জয় করবে এবং লাভ করবে শাশ্বত জীবন।

কাথলিক মণ্ডলীতে এ বছর প্রভু যিশুর জন্মের ২০২৫ বছরের জন্ম-জুবলী উৎসব পালন করা হচ্ছে। বিষয় বস্তু হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে: আমরা আশার তীর্থ যাত্রী। এই উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিস তাঁর পত্রে লিখেছেন: আশা আমাদেরকে নিরাশ করে না। বিশ্বাস থেকেই আশা জন্ম নেয়। প্রবক্তা তাদের জীবনে ঈশ্বর হয়ে উঠেছেন আশার প্রদীপ: "সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ" *(ইসা ১২:২)*। আশা মানুষকে পথ দেখায়, এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়। আশা মানুষের মনকে সঞ্জীবিত রাখে, স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখে। আশা জীবনের একটি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি দান করে। আশা হলো প্রবল একটা ইচ্ছা এবং ভাল ও কল্যাণ করার এবং পাওয়ার একটা প্রত্যাশা। খ্রিস্টীয় আশা আমাদের আশাহত করে না কারণ এর ভিত্তি হলো যিশুর পুনরুত্থান। খ্রিস্ট নিজেই হলেন আমাদের আশার আলো এবং অন্ধকারের পথ প্রদর্শক, কেননা তিনিই হলেন "উজ্জ্বল প্রভাত তারা" *(খ্রিষ্ট জীবিত, ৩৩)*। জুবিলী বছর হবে আশাতে আমাদের জীবন নবায়িত করা। একই সাথে এটা একটা সুযোগ মনপরিবর্তন, মানুষ ও ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন, ক্ষমা লাভ করে ঈশ্বরের দয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাস ও ভালবাসা নবায়ন করা আশার মধ্য দিয়ে। আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন হলো একটা যাত্রা যা আমাদের যিশুর দিকে ধাবিত করে এবং একই সাথে প্রতিবেশির প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুপ্রাণিত করে। খ্রিস্টীয় আশা আমাদের চিন্তা-চেতনা, হৃদয়, আচার-আচরণে বয়ে আনে একটা পরিবর্তন ও রূপান্তর।

পোপ মহোদয় আমাদের আহ্বান করে এ জগতে আমরা যেন আশার দৃশ্যমান চিহ্ন হয়ে উঠি, বিশেষ করে সেই সমস্ত ভাই-বোনদের কাছে যারা কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করছে। পরনিন্দা, পরচর্চা, ধ্বংসাত্মক সমালোচনা পরিহার করে আমরা অন্যকে স্বীকৃতি দান করি, অন্যের মর্যাদা দান করি, অন্যকে গ্রহণ করি এবং অন্যের প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে আশাপূর্ণ জীবন ও সমাজ গড়ে তুলি। যিশুর পুনরুত্থান আমাদের অন্তরে গভীর আশার সঞ্চার করে কারণ পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে যিশু মিথ্যা, অসত্য, অন্যায় এমনকি মৃত্যুকে জয় করেছেন। তাই আসুন আমরা নতুন মানুষ হয়ে পুনরুত্থানের পথে জীবন যাপন করি। পুনরুত্থান প্রত্যেকের জীবনে বয়ে আনুক ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদ, বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও শান্তি।

+ বিজয় এন ডি' ক্রুজ, ওএমআই
আর্চবিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ
প্রেসিডেন্ট, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

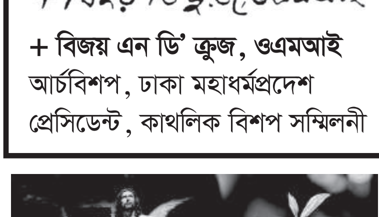

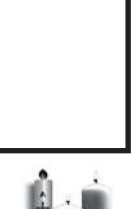

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার ৮৫ বছর

পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৩ এপ্রিল - ১৯ এপ্রিল, ৩০ চৈত্র ১৪৩১ - ৬ বৈশাখ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কাথলিক বিশ্বাসের ভিত্তি: খ্রিস্টের পুনরুত্থান

ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান কাথলিক বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় ও মহিমান্বিত ঘটনা। এটি শুধুমাত্র এক ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রতীক, যা আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে এবং নতুন জীবনের প্রত্যাশা জাগায়। পুনরুত্থান রবিবার হলো সেই মহিমান্বিত দিন, যেদিন যিশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হন এবং মানবজাতির জন্য এক নতুন আশার দ্বার উন্মোচন করেন।

পুনরুত্থান কাথলিকদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। যিশুর পুনরুত্থান কাথলিক বিশ্বাসীদের জন্য অপরিহার্য, কারণ এটি সাক্ষ্য দেয় যে, যিশু শুধু একজন মহান ধর্মগুরুই নন, বরং তিনিই ঈশ্বরের পুত্র ও মানবজাতির ত্রাণকর্তা। তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের পাপের শাস্তি পরিশোধ হয়েছে এবং আমরা পরিত্রাণের সুযোগ পেয়েছি। সাধু পলের কথা অনুসারে, "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে মিথ্যাই তোমাদের বিশ্বাস" *(১ করিন্থীয় ১৫:১৭)*। অর্থাৎ, যদি পুনরুত্থান না ঘটে, তবে খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়।

পুনরুত্থান রবিবার এই বার্তাই বহন করে যে, মৃত্যু ও পাপের ওপর বিজয় হয়েছে ঈশ্বরের পরিকল্পনার। যিশুর পুনরুত্থান পাপ ও মৃত্যুর শক্তি চিরস্থায়ী নয় বরং ঈশ্বরের মহিমা ও করুণাই চিরস্থায়ী। যিশু আমাদের নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে এবং আশ্বস্ত করেন যে, আমরা যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখি, তবে আমরাও নতুন জীবনে পুনরুত্থিত হতে পারবো।

যিশুর পুনরুত্থান খ্রিস্টভক্তদের জীবনে আশার উৎসস্বরূপ। যিশুর পুনরুত্থান আমাদের শেখায় যে, কষ্ট, দুঃখ বা হতাশা কখনোই চূড়ান্ত নয়; ঈশ্বর সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য মুক্তির পথ তৈরি করেন। এছাড়াও, যিশুর আত্মত্যাগ ও পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে, ঈশ্বর আমাদের কতটা ভালোবাসেন এবং আমাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন প্রস্তুত রেখেছেন।

পুনরুত্থানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

পাপ ও মৃত্যুর ওপর বিজয়: যিশু নতুন আদম, যিনি মানবজাতিকে পাপ ও মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন। তাঁর পুনরুত্থান এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে যে, মৃত্যুর সীমা নেই এবং যারা তাঁর অনুসরণ করে তারা চিরন্তন জীবনের অংশীদার হবে।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতা: যিশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে, ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, একজন ত্রাণকর্তা আসবেন, যিনি মৃত্যুকে পরাজিত করবেন। যিশুর পুনরুত্থানের মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

খ্রিস্টের দৈবিক পরিচয়ের প্রমাণ: যিশু পুনরুত্থানের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি শুধুমাত্র একজন মানুষ নন, বরং ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র যা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ভিতকে আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করে এবং তাঁর বাণীর সত্যতা নিশ্চিত করে।

আত্মিক পুনর্জন্ম ও নতুন জীবন: যিশুর পুনরুত্থান আমাদের শেখায় যে, কেবল শারীরিক পুনরুত্থানই নয় বরং আত্মিক পুনর্জন্মও সম্ভব। যখন আমরা যিশুর পথে চলি, তখন আমাদের জীবন নবজন্ম লাভ করে এবং পাপের শৃঙ্খল ভেঙ্গে যায়।

পুনরুত্থানের অর্থ: কাথলিক বিশ্বাসমতে, যিশুর পুনরুত্থান শুধুমাত্র অতীতের ঘটনা নয়, বরং প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনে তা কার্যকর। খ্রিস্টের প্রতি আস্থাশীল হলে তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি আমাদের মধ্যেও সক্রিয় হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে পুনর্জীবন লাভ করি।

ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস: যিশুর পুনরুত্থান খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ঈশ্বরের প্রতি আস্থাশীল হতে প্রেরিত করে এবং আশ্বস্ত করে যে, তিনি কখনো আমাদের পরিত্যাগ করেন না। আমরা যতই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ি না কেন, তিনি আমাদের উদ্ধার করেন।

ক্ষমা ও অনুগ্রহ: যিশু পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদেরকে অনন্ত জীবনের সুযোগ দিয়েছেন। তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করতে প্রস্তুত, যদি আমরা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করি।

আত্মিক শক্তি ও সাহস: যিশুর পুনরুত্থান আমাদের আত্মিক শক্তি প্রদান করে, যাতে আমরা জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হতে পারি। তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজ করে।

পুনরুত্থান ও মণ্ডলীর শক্তি: যিশুর পুনরুত্থান মণ্ডলীকে শক্তিশালী করেছে এবং তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস ও সাহস যুগিয়েছে। পুনরুত্থান রবিবার মণ্ডলীর সবচেয়ে পবিত্র ও আনন্দময় উৎসব। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, খ্রিস্টধর্ম কেবল একটি মতবাদ নয়, বরং এটি জীবন্ত বিশ্বাস যা আমাদের প্রতিদিনের জীবন পরিবর্তন করে।

পুনরুত্থানের গুরুত্ব: আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পুনরুত্থানের শিক্ষা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকার অর্থে যিশুর পুনরুত্থানের শক্তিকে অনুভব করতে হলে পাপ থেকে ফিরে এসে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে হবে। ঈশ্বরের প্রেম ও করুণাকে গ্রহণ করে অন্যদের ক্ষমা এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে। সেইসাথে, প্রার্থনা ও মণ্ডলীর শিক্ষা মেনে চলে আশার বাণী প্রচার এবং ঈশ্বরের সেবা করার মনোভাব গড়ে তোলতে হবে।

পরিশেষে, যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে বাস্তব ও কার্যকর। নতুন জীবন, নতুন আশার এবং ঈশ্বরের চিরস্থায়ী ভালোবাসার প্রতীক। পুনরুত্থান রবিবার আমাদের স্মরণ করায় যে, মৃত্যুর পরেও জীবন আছে, অন্ধকারের পরেও ভোরের আলো ফোটে এবং পাপের পরেও মুক্তির দুয়ার খোলা থাকে। কাথলিক বিশ্বাসীরা যিশুর পুনরুত্থানে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, কারণ এটি তাদের জীবনের মূল ভিত্তি। আমরা যদি তাঁর পুনরুত্থানের পবিত্র শক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করি, তবে আমাদের জীবন প্রকৃতপক্ষেই অনুগ্রহ ও আশায় পরিপূর্ণ হবে। প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের শক্তি আমাদের সকলের জীবনে কাজ করুক এবং আমাদের হৃদয়ে সত্যিকারে পুনর্জন্মের আলো জ্বালিয়ে দিক।

"আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তবে, সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে" (যোহন ১১:২৫)।

আল্লেলুইয়া! খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন! সত্যিই তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন! ❑

খ্রিস্টের পুনরুত্থান: ঐশ-আশার তীর্থযাত্রী হওয়ার আহ্বান

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্ট পুনরুত্থিত খ্রিস্ট। পুনরুত্থান উৎসব হল আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের প্রধান উৎসব ও আনন্দময় ঘটনা। পুনরুত্থান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'পুনরায় উত্থান'।

পুনরুত্থান আমাদের অনন্ত জীবনের আশ্বাস দেয়। পুনরুত্থান আমাদের খ্রিস্টে বিশ্বাসী করে তোলে, যে খ্রিস্টবিশ্বাস আমাদের অন্তরে আশা সঞ্চার করে। এই আশা আমাদেরকে সকল মন্দতা পরিহার করতে, পবিত্রতায় জীবন যাপন করতে এবং সমস্ত সত্তা দিয়ে তাঁকে ভালবাসতে খ্রিস্ট প্রভু আমাদের প্রত্যেককে সেই আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন ক্রুশীয় মৃত্যু বরণের মধ্য দিয়ে। তিনি চেয়েছেন আমরা যেন তাঁর মহিমান্বিত জীবনে প্রবেশ করতে পারি। যিশু খ্রিস্ট এসেছিলেন আমাদের মুক্তি দিতে, যেন আমরা নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হতে পারি। আমাদের এই রূপান্তর অন্ধকার থেকে আলোর ঠিকানায়; মৃত্যু হতে অনন্ত জীবনে, দাসত্ব থেকে মুক্তির পথে; মলিনতা হতে শুদ্ধতায় এবং দুঃখ থেকে শান্তির রাজ্যে বসবাস করার জন্য। আমরা পাপী ছিলাম কিন্তু খ্রিস্ট আমাদের ধার্মিক ক'রে গড়ে তুলেছেন।

আমাদের দৈনন্দিন যাপিত জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুকেই বরণ করি। আর একই সাথে আমাদেরকে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতাও করতে হয়; কেননা আমাদের জীবন কোন ভাবেই মৃত্যুতে শেষ নয়। তাই তো আমরা পরাজয়েও বিজয়ের স্বপ্ন দেখি, হতাশায়ও আশার ঘর বাঁধি, অসুস্থতায়ও সুস্থতার পথ খুঁজি, সমস্যায় সমাধানের পথ রচনা করি। বাতাসে তাড়িত তুষ বা ধূলিকণার মত আমাদের এই জীবন নয়। আমরা খ্রিস্টান; খ্রিস্ট আমাদের আর আমরা খ্রিস্টের। আমরা মরণে থেমে যাব না বরং পুনরুত্থানে এগিয়ে যাব। আমরা নিঃশেষ হতে আসিনি বরং চিরঞ্জীব হতে আমরা এক পাড় হতে অন্য পাড়ে যাই। আমাদের সাধনা ও সন্ধান কোন নশ্বর জীবনের জন্য নয়। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন আমাদের সকলের জন্য; আমাদের জীবনের জন্য। আমাদের জীবনে পুনরুত্থান উৎসব যেন পাথর সরানোর উৎসব!

প্রভু যিশুর কবরে পাথর সরানো অবস্থায় ছিল এবং সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল আলোক-রশ্মি। পাথর দিয়ে যখন কোন কিছু ঢাকা থাকে তখন কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে নতুনত্ব থাকে না। যখন পাথর সরানো হয় তখন মাত্র মানুষ সেখানে প্রবেশ করতে পারে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যেও অনেক ছোট বড় পাথর রয়েছে।

অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, অন্যকে ঘৃণা করার প্রবণতা, মিথ্যা বলা, সমালোচনা ও অন্যের সুনাম নষ্ট করা, অন্যের ভালো সহ্য না হওয়া, অন্যকে ক্ষমা না করা, অন্যের অমঙ্গল কামনা করা এবং অনেক সময় নিজেকেই গ্রহণ করতে না পারা এগুলো আমাদের জীবনের এক একটি পাথর। এই সমস্ত পাথর যখন আমাদের হৃদয়ে থাকে, তখন আমাদের প্রতিদিনকার বোঝা অনেক ভারি হয়ে উঠে। তখন আমরা সহজ মানুষ হতে পারি না। খ্রিস্টের আলো তখন আমাদের জীবনের প্রবেশ করতে পারে না। আর যখন-ই আমরা হৃদয় থেকে একে একে পাথর সরাতে পারি তখন আমাদের জীবনে খ্রিস্টের আলো প্রবেশ করতে পারে। তখন আমরা নতুন মানুষ হই। প্রভু যিশুর শিক্ষানুসারে, কোন বীজ যখন মাটিতে বপন করা হয় তখন সে তার পুরাতন আমিত্বকে ত্যাগ করে। কারণ পুরাতনকে ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে সে নতুনকে গ্রহণ করে। আমাদেরও ঠিক তেমনি ভাবে পুরাতন আমিত্বকে ত্যাগ করতে হয় নতুন আমিত্বকে পরিধান করার জন্য। আমাদের জীবনে নতুন আমিত্ব হল পুনরুত্থিত খ্রিস্ট।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- 'ক্ষুদ্রকে ত্যাগ কর বৃহৎকে পাওয়ার জন্য'। পুনরুত্থানের পূর্ব রাত্রিতে অর্থাৎ নিস্তার জাগরণী উপাসনায় আমরা বেশ অর্থপূর্ণ চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহার করে থাকি। যেমন- প্রথমটি হল আগুন; যা আলোর উৎস। আমরা আলোর উৎসব করি। আলোর শোভাযাত্রা রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত করে। নিস্তার প্রদীপ হয়ে উঠে সকল আলোর উৎস, যা ঘোষণা করে স্বয়ং খ্রিস্টই হলেন দিনের নক্ষত্র। এই নক্ষত্র কখনো অস্তমিত হয় না। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আপন জ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকার ঢেকে দেন। দ্বিতীয়টি হলো জল, যা জীবনের উৎস। এই পুণ্য জল লোহিত সাগর, অর্থাৎ কান্না, মৃত্যু ও ক্রুশের রহস্য আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এখন এই জল আমদের কাছে হয়ে উঠেছে জীবন জল, যা শুষ্কতায় আমাদের সিক্ত করে। এভাবে জল আমাদের দীক্ষাস্নানের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পরিত্রাতা প্রভু যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়ে উঠি। পুনরুত্থিত খ্রিস্টে দীক্ষিত হয়ে আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি। দীক্ষাস্নানে আমরা আমাদের পুরনো সত্তাকে সমাহিত করি এবং খ্রিস্টে নব জীবন লাভ করি। আমরা হয়ে উঠি এক নতুন মানুষ ও নতুন সৃষ্টি। যিশু খ্রিস্ট আমাদের পাপের শৃঙ্খল ছিন্ন করে দান করেছেন বিজয় ও স্বাধীনতা। আজ আমরা বিজয়ী। আজ আমরা স্বাধীন। তাই মৃত্যুর সাথে আর নয় আমাদের বসবাস। আমরা অন্ধকার ঘৃণা করি, কারণ আমরা আলোর সন্তান, আলোর পথের যাত্রী।

ঈশ্বর কখনো চান না আমরা মৃত্যুর মধ্যে

থেকে যাই, মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যাই। হ্যাঁ, মানুষ হিসেবে আমরা মৃত্যুকে মেনে নেই। ঈশ্বর মানুষকে আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানব জীবন অবিনশ্বর হওয়ার কথা। তবে কেন আমাদের জীবনে মৃত্যু আসে? ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এই চিরন্তন সম্পর্ক শয়তান কিন্তু সহ্য করতে পারেনি। তাই শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করে যেন মানব সন্তান ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। শয়তানের পথে যারা পা বাড়ায় তারা জীবনকালেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। শয়তানের সঙ্গী হওয়া মানেই মৃত্যুকে মেনে নেয়া। এভাবেই ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তবে মানুষের এ মৃত্যু মানুষের আদি মর্যাদাকে কেড়ে নিতে কিংবা ক্ষুণ্ন করতে পারে না। শয়তান চিরকালের জন্য আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। কেননা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট পুনরুত্থানের গুণে পাপের ও শয়তানের রাজত্ব চূর্ণ করেছেন।

মুক্তিদাতা খ্রিস্ট মানব রচিত পাপ-পঙ্কিলতা আপন কাঁধে নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে আমাদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা যখন খ্রিস্টকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে রাখি তখন মৃত্যু আমাদের জন্য কোন বিষয়ই নয়। পুনরুত্থান হল নীরবতা ও প্রত্যাশার দিন। আমাদের পরিত্রাণের ইতিহাস কত দীর্ঘ, কত সুন্দর, কত পবিত্র। প্রথমেই ছিল সৃষ্টির সেই নীরব অবধিকাল। সবই নিস্তব্ধ ছিল; ঈশ্বরের বাণীতে সবই সৃষ্ট হয়েছিল এবং সবই উত্তম ছিল। পিতা ঈশ্বরের সৃষ্টির ক্ষমতায় নিস্তার রাত্রিতে একটি আশ্চর্য ও মহান ঘটনা ঘটেছে; যিশু পুনরুত্থান করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আমাদের জীবনেও নতুন জীবনী শক্তি এসেছে। যিশু জীবন জ্যোতি, তাঁর সঙ্গে আমরা জীবনের পথ খুঁজে পাই। যিশু মুক্তিদাতা, তাঁর দয়ায় আমরা ক্ষমা পেয়ে মুক্ত হই। পূর্বকালের পুণ্যাত্মাগণও অধোলোকে মুক্তির আশায় জেগে ছিল। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট প্রভু তাঁদেরও স্বাধীন করে তুলেছেন। বিজয়ী খ্রিস্টরাজার সাথে তাঁরাও পিতার শাশ্বত ভবনে প্রবেশ করেছেন।

পুনরুত্থান পর্বের আরেকটি নাম হল পাস্কা। পাস্কা অর্থ হল "যাত্রা"; মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা, পাপ থেকে পুণ্যের পথে যাত্রা। ইস্রায়েল জাতি ৪০০ বছর পর মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে প্রতিশ্রুত দেশের উদ্দেশ্যে মরুভূমির পথ ধরে ৪০ বছর যাত্রা করেছিলেন। এভাবে তারা সেই দুগ্ধ-মধু প্রবাহিত দেশে প্রবেশ করেছিলেন। আর পিছনে ফেলে এসেছিলেন মৃত্যু, দাসত্ব ও পরাধীনতার শৃঙ্খল। যিশু খ্রিস্ট কেবল দুই হাজার বছর আগে মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেননি; তিনি আজও আমাদের জন্য প্রতিদিন মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেন। তা অনুধাবন করার জন্য আজ আমাদের হৃদয়ের আরও গভীরে যেতে হবে, বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে হবে। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হল পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে প্রচার করা। সেই সাথে নিজের ও অন্যের বিশ্বাস বৃদ্ধি করা। যারা প্রভুকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তাদেরকে প্রভু সেই মহাদান "বিশ্বাস" দান করেন। যত বেশী করে প্রভু বা প্রতিবেশিকে ভালোবাসা যাবে, তত গভীর হবে আমাদের বিশ্বাসের জীবন এবং আমরা হয়ে উঠব যিশুর একান্ত আপনজন। মানব জীবন থেমে থাকে না।

মানব জীবন স্থবির নয় বরং সদা প্রবাহমান। তাই জীবন সরোবরে উত্থান-পতনের তরঙ্গ নিত্য বিরাজমান। আমরা কোনক্রমেই এই অমোঘ বিধান অস্বীকার করতে পারি না। জীবনপথে উত্থান-পতন এমন কোন সমান্তরাল প্রক্রিয়া নয়। আমরা স্বভাবতই ক্রমবর্ধমান উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি, যদিও আমাদের সীমাবদ্ধ সামর্থ তা সমর্থন করে না। ফলশ্রুতিতে, আমাদের যাচ্না ও পাওনার মধ্যে এক বিরাট দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। পুণ্যের চেয়ে মন্দ সহজলভ্য। পুণ্যের জন্য সাধনা করতে হয়, মন্দে সাধনা নিষ্প্রয়োজন। পুণ্যের জন্য অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে হয় আর মন্দ আমাদের আশেপাশে নাচানাচি করে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রভু যিশু খ্রিস্টের দীক্ষাস্নানই পুনরুত্থানের পূর্বচ্ছবি। তাই আত্মশুদ্ধিকালের প্রারম্ভেই মণ্ডলী আমাদেরকে যিশুর দীক্ষাস্নান ধ্যান করার সুযোগ করে দেয়। প্রভু যিশু খ্রিস্টের দীক্ষাস্নান ঘটনাটি আমরা এভাবে প্রত্যক্ষ করি- তিনি মানব জাতির পাপের বোঝা শিরোধার্য করে জর্ডন নদীর জলে ডুব দেন। শুদ্ধকরী ও জীবনদায়ী জল জগতের সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে দিয়ে যায়। তিনি পুনরায় উত্থিত হন। পবিত্র আত্মা যিশুকে ঈশ্বর-পুত্ররূপে আমাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই দায়বদ্ধতায় যিশু আমাদের পাপের ক্রুশ কাঁধে নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। আমাদের সমস্ত কালিমা তিনি সমাহিত করেন। তাঁর হৃদয় থেকে বের হয়ে আসা জল ও রক্ত দিয়ে তিনি আমাদেরকে ধৌত করেন। তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হয়ে যিশু মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন আর আমরা লাভ করেছি অনন্ত জীবনের সনদ। প্রভু যিশুর পুনরুত্থান আমাদেরকে আশ্বাস দেয়- যিশুই আমাদের জন্য মুক্তিপণ হয়েছেন যেন আমরা দায়মুক্ত হতে পারি *(মথি ২৬:২৮)*; যিশুর মৃত্যু আমদের স্বাধীন ও চির-জীবন্ত করে তুলে *(ইসা ৫৬:৬-১০; রোমীয় ৪:২৫)*; যিশু মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন, তাই আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই *(২ পিতর ১:১৬; শিষ্য ১:১৩)*; আমরা ঈশ্বরের আত্মাকে আমাদের অন্তরে লাভ করি *(শিষ্য ১:৮; এফে ১:১৯-২০)*; ঈশ্বর আমাদেরকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসেন *(যোহন ৩:১৬-১৭ ও ১ যোহন ১৩:৩৪-৩৫)*; আমাদের জীবনে ঈশ্বর একটি মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন *(মার্ক ৮:৩৫; শিষ্য ১৫:২৬; ফিলি ১:২১)*; আমরা স্বর্গের নাগরিত্ব লাভ করি *(১ পিতর ১:৪; ১ করি ২:৯; যোহন ১৪:৬ ও রোমীয় ১০:৯)*।

অন্যদিকে, প্রভু যিশু পুনরুত্থিত না হলে- বৃথাই যেতো প্রেরিতশিষ্যদের সুসমাচার প্রচার *(১ করি ১৫:১৪)*; মূল্যহীন হতো আমাদের বিশ্বাস *(১ করি ১৫:১৪)*; প্রেরিতশিষ্যগণ হতেন মিথ্যা জীবনসাক্ষী *(১ করি ১৫:১৫)*; আমরা এখনো পাপে নিমজ্জিত থাকতাম *(১ করি ১৫:১৭)*; আমরা মৃত্যুতেই বিলিন হয়ে যেতাম *(১ করি ১৫:১৮)*। প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের পর আমরা প্রেরিতদূত সাধু পিতরের মুখে শুনতে পাই এই কথা, "শোন, আমি যা বলছি, শুনে রাখ- নাজারেথের যিশু এমন একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর পরিচয় পরমেশ্বর তোমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। কারণ তিনি যে মৃত্যুর বশীভূত হয়ে থাকবেন, তা কিছুতেই সম্ভব ছিল না" *(শিষ্য ২:২২-১৪)*।

খ্রিস্টমণ্ডলী ও তাঁর পবিত্র ঐতিহ্য আমাদের শিক্ষা দেয়, স্বর্গে কেউ কখনো আরোহণ করেনি, স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ সেই মানবপুত্র ছাড়া; যিনি স্বর্গে রয়েছেন। আসলে যিশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে ছিলেন আর একই সময়ে তিনি স্বর্গেও ছিলেন। এই পৃথিবীতে তিনি দেহধারীরূপে ছিলেন আর স্বর্গে ছিলেন ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায়। ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায় তিনি সর্বত্রই ছিলেন। তিনি জননীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু পিতা থেকে কখনো দূরে থাকেননি। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ ঈশ্বর এবং পরিপূর্ণ মানুষ। তাঁর ঐশরত্বের দ্বারা আমরা সৃষ্ট হয়েছি আর তাঁর মানবত্ব দ্বারা আমরা মুক্তি পেয়েছি। আহা! কি অপূর্ব ঈশ্বরের লীলা! তিনি আপন মহিমায় মানব-সন্তান হলেন যেন মানুষ ঐশ-সন্তান হয়। তিনি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে অবরোহণ করলেন যেন আমরা তাঁর দ্বারা পৃথিবী থেকে স্বর্গে আরোহণ করতে পারি। ❑

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার ৮৫ বছর

বলিকৃত মেষশাবক : নিস্তার রহস্যের অনুধ্যান
সার্দিসের বিশপ মেলিতো-এর ধর্মোপদেশ

অনুবাদ : ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

খ্রিস্ট, যিনি আমাদের পরিত্রাণ রহস্য, তাঁর প্রবক্তাগণ সম্বন্ধে বহু আশ্চর্যজনক বিষয়ে পূর্বঘোষণা করেছেন। তাঁর গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

তিনি স্বর্গ থেকে ভূতলে অবরোহণ করেছেন যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানবের জন্য, তিনি কুমারী মারীয়ার মধ্য দিয়ে মানব-স্বরূপে আচ্ছাদিত হয়েছেন, এবং মানবদেহে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করার সক্ষমতা নিয়ে এবং তিনি তো আমাদের সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণা নিজের শরীরে বহন করেছেন। যার মৃত্যু নেই, তিনি তাঁর সেই আত্মিক সত্তায়, মানুষের বিনাশকারী শয়তানের বিনাশ ঘটিয়েছেন। তাঁকে বধ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মেষেরই মতো তাঁকে বধও করা হয়েছে, যেন তিনি আমাদেরকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারেন; যেমন ইস্রায়েল জাতিকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছে। তিনি আমাদেরকে শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করেছেন, যেমন তিনি ইস্রায়েল জাতিকে ফারাও-এর হাত থেকে মুক্ত করেছেন; এবং আমাদের হৃদয়কে তাঁর পুণ্য রক্ত-চিহ্নে অঙ্কিত করেছেন। তিনি মৃত্যুকে লজ্জিত ও ধিক্কার-ক্লিষ্ট করেছেন, ঠিক যেমন মোশী ফারওকেও লজ্জিত ও ধিক্কার-ক্লিষ্ট করেছেন। তিনি ধূর্ততাকে শাস্তি দিয়েছেন এবং অন্যায্যতার সন্তানদের প্রাণ হরণ করেছেন, ঠিক যেমন মোশী মিশরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং করেছেন সন্তানহীন। তিনি আমাদেরকে পরাধীনতা থেকে নিয়ে এসেছেন স্বাধীনতায়, অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে নবজীবনে, নিপীড়ন থেকে শাশ্বত জীবন রাজ্যে।

তিনি আমাদের মুক্তির 'পাস্কা' অর্থাৎ মুক্তিপণ স্বরূপ। তিনি বহুজনের মধ্যে ছিলেন যেন বহুভাবে মুক্তিপণ শোধ করেন। আবেলের মধ্যে তাঁকে বধ করা হয়েছে, ইসহাকের মধ্যে তাঁকে বলির কাষ্ঠরূপ ক্রুশের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে, যাকোবের মধ্যে তাঁকে হতে হয়েছে ভিন্‌দেশী, যোসেফের মধ্যে তাঁকে কৃতদাসরূপে বিক্রি করা হয়েছে, মোশীর মধ্যে তিনি ইস্রায়েল জাতির উদ্ধারকারীরূপে প্রকাশিত হয়েছেন, দাউদের মধ্যে তিনি হয়েছেন নির্যাতিত, প্রবক্তাদের মধ্যে তিনি হয়েছেন নিপীড়িত। ধন্যা কুমারীর মধ্যে তিনি মানব দেহধারণ করেছেন। ক্রুশবৃক্ষের উপরে তাঁর একটি অস্থিও ভেঙ্গে ফেলা হয়নি। তাঁকে মাটির বুকে সমাধি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তিনি মৃত্যু থেকে উত্থিত হয়েছেন; তিনি উন্নীত হয়েছেন স্বর্গলোকের সর্বোচ্চ গৌরবের আসনে। তিনি সেই নিরব মেষশাবক, তিনি সেই বলিকৃত মেষশাবক যিনি জন্মেছেন নিষ্পাপ কুমারীর গর্ভে। তাঁকে মেষের পাল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বধ করার জন্য। পড়ন্ত বেলায় তিনি বলিরূপে সমর্পিত হয়েছেন, দিবাবসানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। কিন্তু ক্রুশবৃক্ষের উপর যাঁর একটি অস্থিও ভেঙ্গে ফেলা হয়নি, মাটির বুকে তাঁর দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি; কারণ তিনি নিজে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং মৃতদেরকে সমাধির অতল থেকে তুলে এনেছেন।

"সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঐশ মহিমা থেকে বঞ্চিত, তথাপি সকলেই অন্তরের ধার্মিকতা ফিরে পায় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে – যে মুক্তি সাধিত হয়েছে স্বয়ং যিশুখ্রিস্টেরই মাধ্যমে। তিনি সেই মেষশাবক, যিনি বিশ্বের পাপ হরণ করেন। যাঁকে পরমেশ্বর সকলের সামনে তুলে ধরেছেন সেই প্রায়শ্চিত্ত-বলিরূপে, যাঁর প্রাণ-বিসর্জনে সাধিত প্রায়শ্চিত্ত মানুষের অন্তরে সার্থক হয়ে উঠবে বিশ্বাসেরই গুণে।" *(রোমীয় ৩:২৩-২৫, যোহন ১:২৯)*

মূল রচনা: Second Reading of the Office of Readings of Holy Thursday, taken from ***Homily of Melito of Sardis,*** one of the Greek Bishops and an apologist, born c. 100 AD and died 180 AD.

মৃত্যুঞ্জয়ীর পদধ্বনি

যোগেন জুলিয়ান বেসরা

মধ্য গগনে রবি যেন
ঠিক মাথার উপর দুলছে
যেন গনগনে আগুনের ফুলকি
ছড়াচ্ছে চারদিক;
গরম বাতাসের দমকা হাওয়ায়
শরীরটা যেন পুড়ছে।
ঠিক এমনি সময়ে নিঃস্তব্ধ লোকালয়ে
গুটিকয়েক মানুষের অপেক্ষা
নিঃশব্দ শোকে।

সূর্যটা হঠাৎ পশ্চিমে হেলে পড়তেই
নেমে এলো ঘোর কাল মেঘ,
ঢেকে ফেলল ঘন কাল আঁধার;
প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি আর ঝড়ো-হাওয়ার
কানফাটা আওয়াজ
আকাশ বিদীর্ণ করে প্রাণ পাখিটা
বেরিয়ে গেল কার?
হা হা, সেই তো মানবরূপী ঈশ্বর প্রভু যিশু
যিনি এসেছিলেন আমাদের এ ধরায়
মানবের মুক্তিকল্পে।
নিঃশব্দ দেহটা তাঁর
হতাশা আর কান্নার মাঝে পরম মমতায়
শোয়ানো হলো এ পৃথিবীর কবরে।

তারপর একি বিজয়ের সুর আকাশে বাতাসে
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে,
নক্ষত্র থেকে ছায়াপথে,
বিশ্বব্রহ্মান্ডের সর্বত্র।
প্রকাণ্ড পাথরখানা সরিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানি
শুভ্র বস্ত্রখণ্ড পরিহিত হয়ে
তিনি বেরিয়ে এলেন;
তিনদিনও ধরে রাখতে পারেনি
তাঁকে এ পৃথিবীর কবর,
চারদিকে শুনি সেই মৃত্যুঞ্জয়ীর পদধ্বনি।

বহু আপনজনদের দিলেন দেখা
হতাশা আর নিরাশার পৃথিবীকে দিলেন
আশার আলোয় ভরিয়ে,
মুক্তির ভরসা জাগিয়ে;
তিনিই তো অকাতরে দিয়েছেন
সকলেরে প্রেমসাগরে ভাসিয়ে।
জয়তু মুক্তিদাতা যিশু,
সদাপ্রভু ভগবান;
তোমারই দয়ায় পেয়েছি
আমরা পরিত্রাণ।।

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

পুনরুত্থানের তাৎপর্য এবং আমাদের শিক্ষা

যোগেন জুলিয়ান বেসরা

যিশুখ্রিস্ট ছাড়া আর কেউই এ পৃথিবীতে মারা যাওয়ার পর জীবিত হয়ে উঠেননি। মানব জাতির ইতিহাসে এটাই প্রথম ও শেষ একমাত্র ঘটনা যে, কেউ মৃত্যুবরণের পর স্বশরীরে পুনরুত্থান করেছেন। কোন মানুষের পক্ষে মারা যাওয়ার পর জীবিত হয়ে উঠা সম্ভব নয়। যিশু ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্বর, বলে-ই তাঁর পক্ষে বেঁচে ওঠা সম্ভব হয়েছে। আর তিনি ঈশ্বর বলে-ই এই পৃথিবীতে থাকার সময় যে শিক্ষা ও নির্দেশনা দিয়েছেন, তা বৃথা যেতে পারে না বা মিথ্যা হতে পারে না। তিনি বলেছেন- শেষ বিচারের দিনে সকলে পুনরুত্থান করবে। তাই আমরাও যে পুনরুত্থান করব, তা আলোর মতই সত্য। তবে বিচারের পর কে কোথায় থাকবো, তা আমাদের জীবনের সঞ্চয়ের (পাপ/পুণ্য) উপরেই নির্ভর করবে।

দেহ ও আত্মার ঠিকানা

মানুষের প্রতিটি জীবন কবরে গিয়ে শেষ হয়, অর্থাৎ এ পৃথিবীতে আমাদের নশ্বর দেহের শেষ ঠিকানা হয় কবরে। আর অবিনশ্বর আত্মার ঠিকানা হয় ঈশ্বরের কাছে। অর্থাৎ যেখান থেকে মানবের শুরু সেখানেই তাকে ফিরে যেতে হয়। দেহ আর আত্মা মিলে-ই মানুষ। ঈশ্বর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন; তাই মৃত্যুর পর মানুষের দেহটা মাটিতেই মিশে যায়। আর মানুষ সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর তাতে ফুঁ দিয়ে আত্মা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন; তাই মৃত্যুর পর আত্মা ঈশ্বরের কাছেই ফিরে যায়। এই সহজ হিসাব যদি মানুষ মনে রাখে, তাহলে ভাল মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করার উৎসাহ পেতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের নশ্বর দেহের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে মাটিতে বা ধূলিতে মিশে যাওয়া। এই পৃথিবীতে আমরা দেহ-মনের জন্য যা কিছু অর্জন করি, যেমন- সাফল্য, প্রশংসা, খ্যাতি, টাকা, বছরের পর বছর ধরে অর্জিত স্থাবর সম্পদ, কিছুই আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারি না। তবে আত্মার জন্য আমরা যা কিছু অর্জন করি, তা আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু দেহের জন্য আমরা যেভাবে পরিশ্রম করে অর্জন করার চেষ্টা করি, আত্মার জন্য কি সেভাবে করি? চিন্তার বিষয়, এবং সচেতন হওয়ার বিষয়। মানুষের জীবনটা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই সংগ্রামের এবং কষ্টের। তবে জীবনের চলার পথে এটারও প্রস্তুতি থাকা দরকার যে, পুনরুত্থানের পর আমি কোথায় থাকব। কারণ এ পৃথিবীর অস্থায়ী ঠিকানায় ভালভাবে থাকার জন্য আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করি ও পরিশ্রম করি, মৃত্যুর পর স্থায়ী ঠিকানায় থাকার জন্য আমাদের পরিশ্রম কি আরো বেশী হওয়া দরকার নয়? অনেকে হয়তো ভাবেন যে, মৃত্যুর পর তো সবই শেষ, কিসের আত্মা, কিসের দেহ? মৃত্যুর পর কোন কিছুরই অস্তিত্ব আর থাকে না। তাদের জন্য পূর্বের কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দেই। মৃত্যুর পর দেহ যদি তার শুরুর (origin) জায়গায় অর্থাৎ মাটিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়, তবে আত্মাও, যদি আত্মা না বলতে চান তবে জীবন-প্রদীপ বলতে পারেন, অবশ্যই তার শুরুর (origin) কাছে ফিরে যেতে বাধ্য; এবং তা হলো ঈশ্বরের কাছে। তাই পালানোর কোন পথ নেই আত্মার।

আদম-হবার পথ অনুসরণ?

বর্তমান যুগে অনেকেই আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবার পথ অনুসরণ করছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে আদম ও হবা যেমন সাপের কথা বিশ্বাস করেছিল যে, তারা যদি নিষিদ্ধ গাছের ফল খায় তবে তারা ঈশ্বরের সমান বা তার চেয়েও বেশী ক্ষমতাবান হতে পারবে; এবং তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে শয়তানের কথামত কাজ করেছিল। এটা ছিল অহংকার ও লোভের চূড়ান্ত প্রকাশ, যা তাদের পতন ঘটিয়েছিল। তেমনি এ যুগে শয়তান মানুষের কানে কানে বলে যে, তুমি যদি অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী হও, নাম, যশ, খ্যাতি অর্জন কর, তবে এ পৃথিবীতে তুমি ক্ষমতাশালী হয়ে মহাসুখে জীবন কাটাতে পারবে। তাই মানুষ যেকোন উপায়ে সম্পদ অর্জন করতে চায়, সেটা অবৈধ উপায়ে হলেও। মানুষ ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশ পালন করতে চায় না, অবাধ্য হয়। মনে করে যে, ঐ আদেশ-নির্দেশ মেনে জীবনযাপন করলে দরিদ্র হয়ে থাকতে হবে, দুর্বল মানুষ হিসাবে সমাজে বসবাস করতে হবে। ঈশ্বরের শক্তিতে আস্থা বা বিশ্বাসের অভাবের কারণেই মানুষ এরূপ চিন্তা করে থাকে। তার চেয়ে নিজের শক্তির উপরেই বেশী বিশ্বাস, আস্থা রাখতে চায়। এর ফলে আদম-হবা যেমন মৃত্যু ডেকে এনেছিল, তেমনি আমরাও সেরকম পরিনামই ডেকে আনি। তাই সময় থাকতে নতুন মানুষ হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে যা মঙ্গলসমাচারের পাতায় পাতায় বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্তমান যুগেও একই চক্রে যেন আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। ক্ষমতাবান মানুষ নিজেকে অনেক সময় ঈশ্বর হিসাবেই যেন জ্ঞান করে। এমনভাবে জীবনযাপন করে যেন মনে হয় কখনো মরবে না; এই পৃথিবীর সবকিছুই যেন তার পদতলে রয়েছে। সর্বশক্তিমান দয়াময় ঈশ্বরকে প্রভু বলে স্বীকার না করে আদম ও হবার মত শয়তানের চক্রান্তে পড়ে যায়। তখন নিজ সৃষ্টিকর্তা থেকে অনেক দূরে চলে যায়, আর আপাতঃ স্বাধীন জীবন বেছে নেয়, যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সে পাপের শৃংখলে বাধা পড়ে যায়। সেই শৃংখল থেকে মুক্তির উপায় একটিই, তা হলো প্রভু যিশুকে মুক্তিদাতা হিসাবে স্বীকার করে নেয়া এবং তাঁর মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবনযাপন করা। মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য ঈশ্বরের বাণীই যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রশ্নের উত্তর পবিত্র বাইবেলের কোন না কোন পাতায় অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই গোটা বাইবেল খুব মনোযোগের সাথে পাঠ করতে হবে।

রহস্যময় পৃথিবীতে রহস্যময় মানুষের জীবন

ঈশ্বরের সৃষ্টি যে উত্তম তার বর্ণনা পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে রয়েছে। আর তিনি সকল সৃষ্টি মানুষের সুবিধার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এই ধরুন, পৃথিবীকে গোল করে সৃষ্টি করেছেন; তাইতো ভূমি ও পানি আলাদা হয়ে রয়েছে। যদি পৃথিবী গোল না হয়ে চ্যাপ্টা হতো তবে তা হয় শুধু ভূমি অথবা শুধু পানি থাকত এবং তাতে মানুষ বসবাস করতে পারতো না। আসলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টিই এক রহস্য ঘেরা জগত যা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ জানা কোনদিনই সম্ভব নয়। কারণ ঈশ্বর অসীম আর মানুষ সসীম, মানুষের জ্ঞান যতই বেশী হোক না কেন তার সীমা সবসময়ই থাকবে। মানুষ এ পর্যন্ত অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে যা এক সময় কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে অনেক সফল হলেও তা সমগ্রের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, এক বিন্দুর চেয়েও ছোট। এই পৃথিবীর অনেক

রহস্যই এখন পর্যন্ত মানুষ উন্মোচিত করতে সক্ষম হয় নি। আমাদের গোটা সৌরজগতকে পুরোপুরিভাবে জানা তো এখন পর্যন্ত বহু দূরের পথ। আর অন্যান্য গ্যালক্সির কথা তো চিন্তারও বাইরে।

ঈশ্বর যখন মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যে থাকা সবকিছু এবং আদম ও হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন সবকিছুই নিখুঁত হয়েছিল। এদেন উদ্যানটি সুন্দর ছিল। আমাদের আদি পিতামাতা ঈশ্বর প্রদত্ত এদেন উদ্যানে মহাশান্তিতে বসবাস করছিলেন। ঈশ্বর প্রায়শই উদ্যানে হেঁটে বেড়াতেন এবং আদম ও হবার সাথে কথা বলতেন। কী মনোরম দৃশ্য ছিল সেটা। কিন্তু মানুষ শয়তানের প্রলোভনে পাপ করল, আর সেই সুন্দর উদ্যান থেকে বহিষ্কৃত হলো। কিন্তু দয়াবান ঈশ্বর তারপর থেকেই মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য পরিকল্পনা করলেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে নিজ পুত্র খ্রিস্টযিশুকে এ জগতে পাঠালেন; আর প্রভুযিশু ক্রুশের উপর নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে সেই পরিকল্পনা পূর্ণ করলেন, পতিত মানুষকে সকল পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করলেন। তবে এই করুণা বা দয়া আপনা আপনি কেউ পায় না; মানুষকে তা গ্রহণের জন্য অন্তরাত্মা খুলে দিতে হয় এবং প্রভুযিশুকে ত্রাণকর্তা হিসাবে স্বীকার করে নিতে হয়। করুণাময় পিতা ঈশ্বরের এহেন উপহার মানুষ যদি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে না চায়, তবে জোর করে তাকে তা চাপিয়ে দেয়া হয় না। তবে যুগে যুগে মানুষের আচরণে এক প্রকার রহস্যময় আচরণ প্রতীয়মান হয়। কী পেলে যে মানুষ সন্তুষ্ট হবে, তা বোঝা মুস্কিল হয়ে যায় অনেক সময়। ঈশ্বর মানুষকে অসীম স্বাধীনতা দিয়েছেন; এমনকি তাঁকে অস্বীকার করার স্বাধীনতা পর্যন্ত। এই মহাবিশ্বের মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার মধ্যে একই সাথে সাধু বা দেবতুল্য মানুষ এবং চরমভাবে মন্দ বা শয়তানসম মানুষের দেখা মেলে। তবে আশার কথা যে, মানবরূপী পুত্র-ঈশ্বরকে যে বিপথগামী শয়তান লোকেরা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল, তারাই শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে যিশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে। আর প্রভুযিশু তো এই জন্যই এ পৃথিবীতে এসেছিলেন যে, মন্দ পাপক্লিষ্ট লোকেরা যেন জীবন ফিরে পায়।

আমার জীবনে পাস্কাপর্বের তাৎপর্য

ইষ্টার বা পাস্কা হলো সেই বাস্তবতা যে, যিশুখ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং মৃত্যু ও পাপের উপর জয় লাভ করেছেন। যদি আমার জীবনে এমন কিছু জায়গা থাকে যেখানে আমি এখনো নতুন জীবনের জন্য অপেক্ষা করছি, আমি কি আশা করতে পারি না যে যিশুর পুনরুত্থান আমাকে সেই জীবন এনে দিতে পারে? প্রভু যিশু নতুন জীবন দেয়ার জন্য সবসময়ই প্রস্তুত আছেন; আমাকে শুধু সেই জীবন খুঁজে নিতে হবে। পাস্কাপর্ব ঈশ্বরের মঙ্গল অনুগ্রহের প্রতি মনোযোগ দিতে আমাদের উৎসাহিত করে। ঈশ্বর সত্যিই আমাদের আরোগ্য ও নতুন জীবন দিতে চান। আমরা কি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত? মঙ্গলসমাচারের আলোকে তিন ভাবে পুনরুত্থানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১। যিশুর পুনরুত্থান বোঝায় যে, তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু-ই যথেষ্ট আমাদের পাপের ক্ষমা লাভের জন্য। সাধু পল করিন্থীয়দের কাছে লিখিত **১ম** পত্রে জোর দিয়ে বলেছেন, খ্রিস্ট শাস্ত্রমতে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁকে কবর দেয়া হয়েছিল, এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থান করে না থাকেন তবে আমাদের বিশ্বাস নিরর্থক এবং আমাদের পাপও ক্ষমা করা হয় নি। অর্থাৎ সাধু পল এর মতে যিশুর পুনরুত্থান ও আমাদের পাপের মূল্য হিসাবে তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর যথার্থতার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। মৃত্যুর তিন দিন পর যিশুর পুনরুত্থানের মাধ্যমে সকলের সামনে এটাই ঘোষিত হলো যে, পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রের বলিস্বরূপ ক্রুশীয় মৃত্যুতে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

২। যিশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে, মৃত্যু সকলের জন্য ও চিরদিনের জন্য পরাজিত হয়েছে। সাধু পিতর পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঘোষণা করেছিলেন, ঈশ্বর যিশুকে মৃত থেকে জীবিত করেছেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করেছেন, কারণ মৃত্যু তাঁকে কবরে ধরে রাখতে পারেনি; মৃত্যু যিশুকে গ্রাস করতে পারেনি। যিশুর পুনরুত্থান মানে এটা বুঝায় যে, তিনি শুধু নিজের জন্য মৃত্যুকে পরাজিত করেননি, আমাদের সকলের জন্যও করেছেন। তিনি দ্বিতীয় আদমরূপে মানবতার নতুন প্রতিনিধি হিসাবে মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেছেন। এটা নতুন সৃষ্টির আরম্ভ এবং সৃষ্টির ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় খুলে যাওয়াকে বুঝায়।

৩। যিশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে, পৃথিবীর বস্তুগত বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না। শিষ্যেরা যখন সাক্ষ্য দেন যে, প্রভুযিশু পুনরুত্থান করেছেন, তাঁরা বুঝাতে চেয়েছেন যে, যিশু মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠে বাস্তব জীবনে ফিরে এসেছেন। পুনরুত্থিত যিশু কোন ভুত বা অশরীরী আত্মা ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাস্তবের মানুষ যিনি সব মানুষের মতই খাওয়া-দাওয়া করেছেন। যিশু তাঁর শরীর নিয়ে কবর থেকে বের হয়ে আসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর জড়বাদীতার প্রয়োজনীয়তাও আমাদের দেখালেন। তাঁর এই পুনরুত্থান শুধু ঈশ্বরের ক্ষমাশীলতা এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাই দেয় নি, এটা যিশু-নামের মধ্যে নিহিত কথা ও কাজ এবং দয়া ও ন্যায্যতার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে সকল প্রকার মন্দতা ও দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদেরকে প্রেরণা ও শক্তি জোগায়।

পরম পিতার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

প্রভুযিশুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর পালক পিতা ধন্য যোসেফ ও তাঁর মাতা ধন্যা মারীয়ার সাথে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আসে। আমাদের জীবনের সেইসব মানুষ এবং ঘটনাবলী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা যা আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি, তা বিশ্বজুড়ে তাঁর মঙ্গলবার্তা প্রতিধ্বনিত হতে দেখার এবং যতটা সম্ভব মানুষের সাথে তা ভাগ করে নেয়ার আকাংখায় পরিণত করে। প্রভুযিশু আমাদের এমন এক জীবন বেছে নিতে আহ্বান করেন যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করবে এবং আমাদের পরিত্রাণ লাভে সক্ষম করবে। প্রভুযিশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদেরকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পথ দেখালেন। আমরাও শেষদিনে স্বশরীরে পুনরুত্থান করবো এবং বিচারের পর ঈশ্বর ধার্মিকদেরকে হয়তো অন্য কোন পৃথিবীতে তথা অন্য কোন গ্রহে বা স্বর্গ নামক সুন্দর স্থানে অনন্ত সুখ ও শান্তিতে থাকতে দিবেন, প্রত্যাদেশ গ্রন্থে যেভাবে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর মন্দ লোকদেরকে এ পৃথিবীতেই বা নরক নামক যন্ত্রণাময় স্থানে ফেলে রেখে যাবেন, যেখানে অনন্তকাল ধরে রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, কান্না, হাহাকার, মারামারি, যুদ্ধ, মৃত্যু ইত্যাদি লেগেই থাকবে।

তাই আমাদের আর দেরী করা মোটেও সমীচিন নয়, বরং আমাদের জন্য পুনরুত্থিত যিশুর এই অসাধারণ উপহার গ্রহণ করে এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। পৃথিবীতে থাকাকালীন তিনি আমাদের যেভাবে ঈশ্বর ও প্রতিবেশিকে ভালবাসার শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার সাথে একীভূত হয়ে তাঁর শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করার মহাসুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারি। *"শয়তান যদিও এই পৃথিবীতে এখনো সক্রিয়, তবে সে একজন পরাজিত শত্রু। তার ধ্বংস নিশ্চিত হয়েছে; এবং শয়তান জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিক্ষিপ্ত হয়েছে" (প্রত্যাদেশ ২০:১০)।* তাই প্রভুযিশুর জয় মানে তাঁর শিষ্য হিসাবে আমাদেরও জয়। ❑

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার ৮৫ বছর

পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৩ এপ্রিল - ১৯ এপ্রিল, ৩০ চৈত্র ১৪৩১ - ৬ বৈশাখ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ

শূন্য সমাধি থেকে এক রূপান্তরিত বিশ্ব: ইস্টারের বিশ্বজনীন আহ্বান

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

ভূমিকা: ইস্টার বা পাস্কা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মূলস্তম্ভ – যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের আনন্দোৎসব। খ্রিস্টধর্মে এ ইস্টার একটি মহাপর্ব। প্রভু যিশু খ্রিস্টের মৃত্যুর পর তাঁর স্বগৌরবে পুনরুত্থান স্মরণে প্রস্তুতি ও রীতিকৃত্যের মিশেল। সহস্র বছর ধরে ধর্মীয় বিশ্বাস আর বাহারী কৃষ্টি-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গোটা বিশ্বে জয়-ডঙ্কা বাজিয়ে আসছে এ ইস্টার। বলা বাহুল্য, ধর্মতাত্ত্বিকভাবে যিশু জন্মোৎসব খ্রিস্টমাস তথা বড়দিন থেকেও এ ইস্টার বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পুনর্জন্ম নয় বরং পুনরুত্থানের এক অনন্য ঘটনা আর ঘোষণার সাক্ষী হয়ে আছে 'দা হলি সেপূলকার'। সেই পুণ্যভূমি প্যালেস্টাইন-ইস্রায়েলে। একটি শূণ্য কবর স্মারক ও প্রতীক হয়ে এখনো টিকে আছে। এ কবর বিশ্বের সব খ্রিস্টানের জন্য পাপ আর মৃত্যুর উপর পরিত্রাতা যিশুর মহা বিজয় চিহ্ন। মূক এ কবর ছড়িয়েছে একটি বারতা, তিনি বেঁচে উঠেছেন। মৃত্যু শেষ কথা নয়। আছে পুনরুত্থান। আছে অনন্ত জীবন।

তবে প্রশ্ন আসে, ঐতিহাসিক এ ইস্টার বা পাস্কা কী শুধুমাত্র খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের জন্যই নিয়ে আসে বিশেষ বাণী-বারতা, না-কি বিশ্বের অন্যান্যদের জন্যও আছে কোন আহ্বান, আবাহন, অনুরণ? আসলে ইস্টার সব মানবজাতিকেই এক অভিন্ন আশা আর নবীকরণের প্রস্তাব করে। আজকের জগৎ সংগ্রাম করছে মানুষের মাঝে বিচ্ছেদ-বিভেদ, অবিচার-অন্যায় আর হতাশা-নিরাশা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসসহ আরও অনেক কিছুর সাথে। আর সেখানেই প্রভু যিশুর পুনরুত্থান ব্যক্তি ও সমাজকে প্রয়োজনীয় রূপান্তর ও পুনর্জীবনের আলোতে আসার আমন্ত্রণ জানায়। ব্যক্তি ও সমাজকে তাড়িত করে ভালোবাসা, ন্যায়পরায়নতা, সম্প্রীতি আর শান্তির প্রতিশ্রুতিতে (কার্ল রানার, ১৯৬৬; ২য় জন পল, ১৯৮৮)। তাই এ প্রবন্ধে ইস্টারের ধর্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। ইস্টারের সর্বজনীন নবীকরণ আহ্বান আলোচনা করা হয়েছে। অধিকন্তু, বিশ্বের প্রধান ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলোতে কীভাবে পুনরুত্থান, পুনর্জন্ম ও নবজন্ম ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তা-ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি, তুলে ধরা হয়েছে পুণ্য পাস্কার বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক প্রভাব।

১। যিশু খ্রিস্টের শূণ্য সমাধি: একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রতিফলন

যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনা বিবরণ চারটি মঙ্গলসমাচারেই নথিভুক্ত আছে *(মথি ২৮:১-১০; মার্ক ১৬:১-৮; লুক ২৪:১-১২; যোহন ২০:১-১৮)*। শূন্য সমাধি খ্রিস্টীয় ঐশতত্ত্বে কেন্দ্রস্থিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ – এটি খ্রিস্টের ঐশরিকতা ও মসিহীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার নিদর্শন (এলিসন, ২০২১)। যদিও খ্রিস্টমণ্ডলী তার আদি বা প্রাথমিক যুগে এ ঘটনা নিয়ে সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ইতিহাসভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত যিশুর পুনরুত্থান ঘটনাগুলোর সত্যতাই সমর্থন করে। ধর্মতত্ত্ববিদ দুন্ (২০০৯) যুক্তি দেখান যে, যিশুর শিষ্যদের পুনরুত্থান বিশ্বাস করা আর সে বিশ্বাসের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করাই হলো সবচেয়ে বড় আস্থার প্রমাণ। অর্থডক্স ঐতিহ্যে পুনরুত্থানের রূপান্তরকারী আর আলোদায়ী শক্তিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। সাধু জন ক্রিসোস্তম ৪র্থ শতাব্দীতে তাঁর 'পাস্কাল হোমিলি'তে মৃত্যুর উপর বিজয়ের ঘোষণা প্রচার করেছেন। নিস্তার রজনীতে সুদীর্ঘ মহা নিস্তার বন্দনাও গেয়েছেন। তদুপরি, পুনরুত্থানের বাইবেলীয় বর্ণনা ইহুদী জাতির মেসিয়ানিক বা 'প্রতিশ্রুত অভিষিক্তজনের আগমন প্রত্যাশা'-র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কারণেই প্রথম শতাব্দীর ইহুদীদের কাছে এ ঘটনা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল (ইভান্স, ২০০৮)।

২। যিশুর পুনরুত্থান: ইহুদী, মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধ চিন্তকদের দৃষ্টিভঙ্গী

বিশ্বের অখ্রিস্টান ধর্মীয় ঐতিহ্যের বহু পণ্ডিত ও ধর্মতত্ত্ববিদ যিশুর মৃত্যু, কবর ও পুনরুত্থান নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন – ইতিহাস, দর্শন বা আন্তঃধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। নীচে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদের কথা তুলে ধরা হলো:

২.১ পিনকাস লাপিদে (ইহুদী পণ্ডিত)

ইহুদী ধর্মতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদ পিনকাস লাপিদি (১৯২২-১৯৯৭) যুক্তি দেন যে, যিশুর পুনরুত্থান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর রচিত বই দা রেজেরেকশন্ অব যিজাস: আ যূয়িশ পারসপেকটিভ্ (১৯৮৩)- এ তিনি লিখেছেন: "আমি যিশুর পুনরুত্থানকে শিষ্যদের কল্পনা হিসেবে নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করি।" তিনি বিশ্বাস করতেন যে, "ইয়াওয়ে তথা ঈশ্বর যিশুকে জাতিসমূহের প্রতি একটি নিদর্শনস্বরূপ পুনরুজ্জীবিত করতেই পারেন।" তবে তিনি যিশুকে মসীহ্ হিসেবে মেনে নেননি।

২.২ ফজলুর রহমান, শাবীর আলী এবং রেজা আসলান (মুসলিম চিন্তাবিদ, ইসলামী পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ)

প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ফজলুর রহমান (১৯১৯-১৯৮৮) যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানসহ খ্রিস্টধর্মের মুখ্য বিষয়গুলো নিয়ে আন্তঃধর্মীয় ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যদিও ইসলাম ঐতিহ্যগতভাবে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং পুনরুত্থান অস্বীকার করে। রহমান বিশ্বাস করতেন যে, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতে পারে এই বিশ্বাসগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে। তিনি পুনরুত্থানকে একটি ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক সত্য হিসেবে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের আভ্যন্তরীণ বাস্তবতা হিসেবে মূল্যায়ন করেন।

সমকালীন ইসলামী পণ্ডিত শাবীর আলী যিশুর পুনরুত্থান কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করেন, তবে তিনি ব্যাখ্যাদান করেন ভিন্নভাবে। ইসলামী ধর্মগ্রন্থ ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং পুনরুত্থান অস্বীকার করলেও *(সূরা ৪:১৫৭)*, আলী একাডেমিক আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে স্বীকার করেছেন যে, "প্রথম যুগের খ্রিস্টানদের মধ্যে যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাসই মানব ইতিহাসে একটি সুগভীর ও রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলেছিল।"

ইসলামী পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ রেজা আসলান তাঁর বই জেলট্: দা লাইফ এন্ড টাইমস্ অব যীজাস্ অব নাজারেথ (২০১৩)-তে লিখেছেন, যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাসই আদি মণ্ডলীতে খ্রিস্টধর্মের দ্রুত বিস্তার ও বৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। যদিও তিনি পুনরুত্থানকে একটি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন না, তথাপি এর ক্ষমতা ও গুরুত্বকে বিশ্বের ইতিহাস গঠনের একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

২.৩ স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী (হিন্দু চিন্তাবিদ)

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), যিশু খ্রিস্টের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যদিও তিনি পুনরুত্থানকে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের নির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে দেখেছেন, তথাপি তিনি যিশুর আত্মত্যাগ ও আধ্যাত্মিক জয়কে একটি সর্বজনীন সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"যিশু ছিলেন সত্যিকার ত্যাগ ও প্রেমের প্রতীক।" তাঁর দৃষ্টিতে, "যিশুর পুনরুত্থান মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতের রূপান্তরের একটি চিত্র, যা মানবজাতিকে আত্মজাগরণ ও সেবার পথে আহ্বান করে।"

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) যিশুর পুনরুত্থানকে স্পষ্টভাবে গ্রহণ করেননি, তবে তিনি যিশুর শিক্ষাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। একবার তিনি বলেছিলেন: "যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন, তিনি অন্যদের, এমনকি শত্রুদেরও ভালোর জন্য নিজেকে আত্মত্যাগ হিসেবে নিবেদন করেছিলেন এবং হয়ে উঠেছিলেন জগতের মুক্তিদাতা।" এ বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় যে, তিনি যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং রূপান্তরের শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দেখেছেন।

২.৪ ডি. টি. সুজুকি ও থিচ নাত হান (বৌদ্ধ পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ)

দাইসেতসু তেইতারো সুজুকি (১৮৭০-১৯৬৬), একজন জাপানি বৌদ্ধ পণ্ডিত। তিনি পুনরুত্থানকে একটি গভীর আধ্যাত্মিক প্রতীক রূপে মেনে নিয়েছিলেন। যদিও তিনি এটিকে একটি আক্ষরিক ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করেননি, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, "পুনরুত্থান একটি সার্বজনীন সত্যের প্রতীক, যা নবীকরণ, অতিক্রমণ ও আলোকিত হওয়ার ধারণাকে প্রতিফলিত করে এবং বৌদ্ধ দর্শনের রূপান্তরের শিক্ষার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ।"

ভিয়েতনামী জেন সাধক, লেখক ও শান্তিকর্মী থিচ নাত হান (১৯২৬-২০২২) আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একজন পথপ্রদর্শক। তিনি যিশুর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন। তাঁর মতে, "যিশুর পুনরুত্থান কেবল ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং একটি জীবন্ত চেতনা – এ চেতনা ভালোবাসা, ক্ষমাশীলতা ও অপরের জন্য আত্মোৎসর্গের।" তিনি লিখেছেন: "যিশু আজও বেঁচে আছেন – প্রতিবার যখন আপনিও তাঁর মত ভালোবাসেন, ক্ষমা করেন, বা শান্তি স্থাপন করেন, তখন যিশু খ্রিস্টও পুনরুত্থিত হন।" তাঁর দৃষ্টিতে, "যিশুর পুনরুত্থান ও বুদ্ধের নির্বাণ একই রকম আধ্যাত্মিক সত্যের অভিমুখ, যা আত্মজ্ঞান ও মুক্তির পথ দেখায়।"

৩. পুনর্জন্ম এবং পুনরুত্থান: প্রত্যাবর্তনের চক্র বনাম এককালীন পুনরুত্থান

পুনর্জন্ম এবং পুনরুত্থান ধর্মীয় ঐতিহ্য জুড়ে মৃত্যুর পরে জীবনের দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে পুনর্জন্ম, কর্ম দ্বারা গঠিত আত্মার বিভিন্ন রূপে পার্থিব অস্তিত্বে বারবার প্রত্যাবর্তনকে বোঝায়। এই চক্রাকার প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না কেউ মুক্তি (মোক্ষ বা নির্বাণ) অর্জন করে। বিপরীতে, ইহুদীধর্ম (সব সম্প্রদায় নয়), খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম এবং জরথুস্ত্রবাদের ভিত্তি পুনরুত্থান, এককালীন ঐশরিক কর্মকে বোঝায় যেখানে মৃতদের পুনরুত্থিত করা হয়, প্রায়শই একই দেহে, রূপান্তরিত বা মহিমান্বিত করা হয়, বিচারের মুখোমুখি হতে বা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে। পুনর্জন্ম একাধিক জীবনের মাধ্যমে নৈতিক ধারাবাহিকতার উপর জোর দিলেও পুনরুত্থান ভবিষ্যতের চূড়ান্ত বাস্তবতায় ব্যক্তির পরিচয় পুনরুদ্ধারের উপর জোর দেয়। তাদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, উভয় ধারণাই নিশ্চিত করে যে মৃত্যু শেষ নয়, যা বিশ্বাসীদের আশা, জবাবদিহিতা এবং এই জীবনের বাইরে আধ্যাত্মিক রূপান্তরের সম্ভাবনা প্রদান করে।

৪. ইস্টারের রূপান্তরমূলক শক্তি (পাস্কা)

ইস্টার বা পাস্কা, নবীকরণের প্রতীক, যা ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক এবং বৈশ্বিক স্তরে রূপান্তরের আহ্বান জানায়। এটি ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্দীপিত করে দৃঢ়তা। শক্তিশালী করে বিশ্বাসী সম্প্রদায়গুলোর পারস্পরিক সংহতি মৈত্রি। উদাত্ত আহ্বান জানায় সমাজের নিরাময় ও ন্যায়বিচারের জন্য। আজকের সংকটময় বিশ্বে, ইস্টারের বার্তা আশা, সহানুভূতি এবং একটি ভাল ভবিষ্যতের জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণের সবিশেষ প্রেরণা যোগায়।

৪.১ ব্যক্তিগত রূপান্তর

ইস্টার ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক নবীকরণের আহ্বান জানায়। পল রোমীয় ৬:৪-এ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন: "অতএব, আমরা মৃত্যুতে তাঁর সাথে সমাহিত হয়েছিলাম, যাতে খ্রিস্ট যেমন মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন... তেমনি আমরাও যেন নতুন জীবন যাপন করতে পারি।" এই নবীকরণ প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষমা এবং নৈতিক পুনর্জন্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায় (ও. কলিন্স, ২০১২; পোপ বেনেডিক্ট ১৬শ, ২০১১)। প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মশাস্ত্রীগণ যেমন বনহোফার (১৯৪৯) উল্লেখ করেন, পুনরুত্থান বিশ্বাসে সক্রিয় শিষ্যত্বের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন, এ নিষ্ঠাতাই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক রূপান্তরকে প্রভাবিত করে।

৪.২. সাম্প্রদায়িক রূপান্তর

পুনরুত্থান আদি বা প্রেরিতিক মণ্ডলীর খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে ভালোবাসা, সেবা এবং সমতার মূলনীতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল *(প্রেরিত ২:৪২-৪৭)*। বিশ্বাসীদের মাঝে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের উপস্থিতি নিজেদের ভিতরকার ঐক্যকে উৎসাহিত করে, ভাঙা বা বিভক্ত সমাজকে একীভূত করে এবং ক্ষত নিরাময়ের আহ্বান জানায় (হানস্ কুং, ২০০১)। কাথলিক চার্চ এ বিষয়টি তুলে ধরেছে গাউডিয়াম এৎ স্পেস নির্দেশনামায়। এখানে জোরালোভাবে খ্রিস্টানদের সামাজিক ন্যায়বিচারে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে, যা খ্রিস্টের পুনরুত্থানের প্রতিফলন (২য় ভাতিকান, ১৯৬৫)।

৪.৩. বৈশ্বিক ও সামাজিক রূপান্তর

ইস্টারের বার্তা ন্যায়বিচার এবং শান্তির আন্দোলনে প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিনিয়ত। ঐতিহাসিক উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে নাগরিক অধিকার আন্দোলন, যেখানে বিশ্ব বরণ্যে নেতৃবৃন্দ যেমন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র পুনরুত্থান থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন, এবং একটি নিপীড়নমুক্ত বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিলেন (পোপ ফ্রান্সিস, ২০১৫)। অর্থোডক্স চার্চ পুনরুত্থানকে স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি যত্ন নেওয়ার আহ্বান হিসেবে দেখে, যা প্যাট্রিয়ার্ক বার্থোলোমিউয়ের পরিবেশগত উদ্যোগগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে (প্যাট্রিয়ার্ক বার্থোলোমিউ, ২০১০)। তাছাড়া, খ্রিস্ট মণ্ডলী সৃষ্টির রূপান্তর আর নবীকরণের বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিবেশগত ন্যায়বিচারের পক্ষে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, জনমত ও গণসম্পৃক্ততা গড়ে তুলছে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত (লাউদাতো সি, হোক তব জয়গান, ২০১৫)।

৫. ইস্টারের সার্বজনীন আহ্বান: সমস্ত মানবতার জন্য একটি বার্তা

ইস্টারের বার্তা খ্রিস্টধর্মের বাহিরেও বিস্তৃত, যা হলো বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে প্রতিধ্বনিত হয়। পাস্কার নবীকরণ এবং আশা সম্পর্কিত বিষয়গুলি আন্তঃধর্মীয় ও ঐক্যবাদী সংলাপের প্রেরণা দেয়। আবার সাম্য-মৈত্রি-ঐক্যের প্রচারও করে। একটি বহু-ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বে, ইস্টার সহানুভূতি, ন্যায়বিচার এবং পুনর্মিলনের সহভাগিতা মূল্যবোধকে অনুপ্রাণিত করে, যা সর্বসাধারণের অভিন্ন কল্যাণের জন্য।

৫.১ খ্রিস্ট ধর্মের বাহিরে

নবীকরণ এবং কষ্টের ওপর বিজয়ের বিষয়গুলো অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যেও পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্মে, পুনর্জন্মের (পুনর্জন্ম) ধারণা ইস্টারের নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতির সাথে মিলিত হয় (পানিক্কার, ১৯৯৯)। তেমনি, ইহুদি ধর্মে পাসওভারের উদযাপন মুক্তির প্রতীক, যা খ্রিস্টান বিশ্বাসে খ্রিস্টকে পাসকাল ল্যাম্ব হিসেবে অভিহিত করার ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ (স্যান্ডার্স, ১৯৯৩)। বৌদ্ধধর্মে, পুনর্জন্ম এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের পথের দর্শন, নবীকরণ, রূপান্তর এবং কষ্টের ওপর বিজয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে (হার্ভে, ২০১৩)। ইসলাম ধর্মে, শেষ বিচার দিবসে দেহের পুনরুত্থান সম্পর্কে বিশ্বাস একটি অনুরূপ ন্যায়বিচার এবং দৈব নবীকরণের ধারণাকে জোর দেয় (নাসর, ২০০২)।

৫.২. আন্তঃধর্মীয় এবং ঐক্যবাদী দৃষ্টিকোণ

ইস্টার বিভিন্ন ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপের আহ্বান জানায়। শান্তি, পুনর্মিলন এবং মানব মর্যাদার প্রতি যে সাধারণ গুরুত্ব দেওয়া হয় তা আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে। কাব (২০০১) বলেন যে, ইস্টারের বিষয়গুলি সার্বজনীন আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা পারস্পরিক সম্মান এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যে পুনরুত্থানের রূপান্তরশীল শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিভক্ত পৃথিবীতে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সংহতির সেতু বিনির্মাণ করতে সহায়ক হতে পারে। বিশ্ব চার্চ পরিষদ ইস্টারের ভূমিকা তুলে ধরে প্রচার করে যে, মহা বিভাজনে বিভক্ত মণ্ডলীতে ঐক্য এবং ব্যাপক আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে পবিত্র পাস্কা (ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস্, ২০১৩)।

৫.৩. বহু-ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বের প্রাসঙ্গিকতা

ইস্টার বর্তমানকালীন চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়, যেমন সামাজিক ন্যায্যতা, শরণার্থী সংকট এবং পরিবেশগত অবক্ষয় (ক্রসান, ১৯৯৫)। পুনরুত্থান দুঃখের মধ্যে আশার প্রতীক, যা একটি ন্যায়বদ্ধ এবং সহানুভূতিশীল পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানায় (মার্টন, ১৯৬৬)। ইস্টার নবীকরণ এবং রূপান্তরের জন্য সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা, যা বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসেও দেখা যায়। বৈশ্বিক সংকট এবং অস্তিত্বগত অনিশ্চয়তার এই অতি আধুনিক যুগে ইস্টারের বার্তা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

৬. আজকের পৃথিবীতে ইস্টারের বার্তা বাঁচিয়ে রাখা

ইস্টার আমাদের ডাকে-আশা জাগাতে, হৃদয়ে করুণা জাগ্রত করতে, আর ন্যায়ের পথে চলতে। এই বার্তা শুধু কানে শোনার নয়, বরং জীবনে ধারণ করার। বিশ্বাসীরা যেন হয়ে ওঠে নতুন জীবনের বীজবপনকারী – যারা একবুক সাহসে এগিয়ে আসে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। চার্চসমূহ যেন হয় সেই আলোর দীপ্ত কেন্দ্র, যা নবজাগরণ ঘটায়, প্রান্তিকদের পাশে দাঁড়ায়, আর সমাজকে নিয়ে চলে মিলন, উন্নয়ন এবং টেকসই শান্তির পথে।

৬.১ ব্যক্তি ও সমাজের জন্য আহ্বান: ইম্যাকুলি ইলিবাগিজার গল্প

বর্তমান যুগে ইস্টারের জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে ওঠে ইম্যাকুলি ইলিবাগিজার গল্পে। ইম্যাকুলি ছিলেন একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী, যখন ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে রুয়াডায় জাতিগত হিংসা শুরু হয়। তুতসি জাতিগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তিনিও হয়ে ওঠেন হত্যাযজ্ঞের লক্ষ্য। বেঁচে থাকার জন্য, তিনি আরও সাতজন নারীর সঙ্গে ৯১ দিন কাটিয়েছিলেন একটি ছোট্ট বাথরুমে লুকিয়ে। এই সময় তিনি প্রতিদিন রোজারি প্রার্থনা করতেন, আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁর কাথলিক বিশ্বাস। সমস্ত পরিবারকে হারানোর গভীর শোকেও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন খ্রিস্টের পুনরুত্থানের বার্তায় আশ্রয়-যা তাকে দিয়েছিল ক্ষমা করার শক্তি ও জীবনের নতুন অর্থ। তাঁর বিশ্বাস, ক্ষমা ও পরিবর্তনের নব জীবন যাত্রা প্রমাণ করে যে পুনরুত্থানের শক্তি কেবল ধর্মতত্ত্বে নয় –জীবনের গভীরতাতেও বিদ্যমান।

ক্ষমার বাণীতে উত্তরণের পথ: লুকিয়ে থাকার সেই দীর্ঘ দিন শেষে, বাইরের জগতে ফিরে ইম্যাকুলির জন্য অপেক্ষা করছিল কঠিন বাস্তবতা-ধ্বংসস্তূপ থেকে নিজেকে পুনর্গঠন করা। কিন্তু প্রতিশোধের চিন্তা নয়, বরং তিনি বেছে নেন ক্ষমার অনন্য পথ। এমনকি যিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছিলেন, সেই ঘাতকের মুখোমুখি হয়ে তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এই সিদ্ধান্ত কোনো সহজ পথ ছিল না, কিন্তু তা ছিল ইস্টারের বার্তা – পুনরুত্থান ও মুক্তির-উপর ভিত্তি করে গৃহীত। তাঁর এই মনোভাব শুধু তাঁর নিজস্ব জীবনকেই পাল্টে দেয়নি, তা হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

আধুনিক কালের এক ‘পুনরুত্থান’: ইম্যাকুলির কাহিনী হলো ইস্টারের এক জীবন্ত সাক্ষ্য। তাঁর এই “ব্যক্তিগত পুনরুত্থান” আমাদের আহ্বান করে-ঘৃণার জবাবে ভালোবাসা দিতে, হতাশার মাঝে আশার আলো জ্বালাতে ও অন্যায়ের সাক্ষাতে মিলনের পথে হাঁটতে।

বিশ্বাসীদের ইস্টারের এই চিরন্তন বার্তাকে জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করতে আহূত হয়েছে। ক্ষমার কাজের মাধ্যমে। সেবায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। ন্যায়বিচারের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলার মাধ্যমে। চার্চগুলোও এই সামাজিক রূপান্তরের কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখে –দারিদ্রতা, মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক অসমতার মতো অনেক বিষয় নিয়ে।

বিশ্বাসীদের আহ্বান জানানো হচ্ছে যেন তারা ইস্টারের বার্তা বাস্তব জীবনের মধ্য দিয়ে বহন করেন। ক্ষমার অনুশীলন, সেবামূলক কার্যক্রম এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে সোচ্চার অবস্থানের মাধ্যমে (লিঙ্কন, ২০১০)। চার্চগুলো এই দায়িত্ব পালনে মুখ্য ভূমিকা রাখে – দারিদ্র্যতা, মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক অসাম্যের মতো ইস্যুগুলোর মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে। যখন একজন ব্যক্তি ইস্টারের পুনর্জীবনের বার্তাকে নিজের জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন সেই পরিবর্তন ধীরে ধীরে সমাজেও প্রতিফলিত হয়। এইভাবে, ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি ও কর্মই সামগ্রিক সামাজিক রূপান্তরের পথ প্রশস্ত করে। এইভাবে, প্রতিটি বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এক “জীবন্ত ইস্টার”-যিনি প্রতিদিনের জীবনে পুনরুত্থানের আশা ও নতুন জীবনের বাণী বয়ে নিয়ে আসেন।

৬.২ মহামারী-পরবর্তী বিশ্ব, যুদ্ধ ও গণঅভিবাসনের প্রেক্ষাপটে চার্চের দায়িত্ব

কোভিড-১৯ মহামারী আমাদের সমাজের ভেতরের দুর্বলতা ও অসমতা প্রকাশ করে দিয়েছে এবং দেখিয়েছে যে, পুনর্নবীকরণ, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা কতটা প্রয়োজনীয়। পুনরুত্থানের বার্তা কেবল বিশ্বাসের প্রতীক নয়, বরং একটি কর্মপ্রেরণাদায়ক আহ্বান - যা চার্চকে অবিরামভাবে আহ্বান করে আশার বাতিঘর, নিরাময়ের স্থান এবং ন্যায়বিচারের কণ্ঠ হয়ে উঠতে (রাইট, ১৯৯৮)।

যখন পৃথিবী এখনো মহামারীর প্রভাব, যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চল এবং গণঅভিবাসনের সংকট মোকাবিলা করছে, তখন বিশ্বাসভিত্তিক চার্চ ও সম্প্রদায়গুলো অনন্যভাবে এই বাস্তবতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। চার্চ শুধু আত্মিক শান্তি প্রদান করে না, বরং বাস্তবিক সহায়তাও দিতে পারে যেমন, নির্বাসিতদের অধিকার রক্ষা, ক্ষতবিক্ষতদের সেবা এবং বিভক্ত মানুষের মধ্যে পুনর্মিলনের সেতুবন্ধন গড়ে তোলা।

ইস্টার বা পাস্কার বার্তা ও দিক্‌নির্দেশনা – সব রকম ভোগান্তি ও হতাশা-অন্ধকারের পরেও জীবনের নবযাত্রা সম্ভব। এই বার্তা আহ্বান জানায় যেন চার্চ নতুনভাবে মানুষকে স্বপ্ন দেখায়, মানব মর্যাদা পুনঃস্থাপনে এগিয়ে আসে এবং সহমর্মিতা ও শান্তির ভিত্তিতে এক মানবিক ভবিষ্যৎ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার: রূপান্তরিত এক জগতে বিশ্বজনীন আহ্বান

শূন্য কবরে নিহিত বার্তাটি শুধু একটি অতীত ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। এটি এক জীবন্ত সত্য, যা সমগ্র মানবজাতিকে রূপান্তরের পথে আহ্বান করে। ইস্টারের (পাস্কার) আহ্বান ধর্মীয় সীমারেখা অতিক্রম করে – একটি আশাবাদী, পুনর্জাগরণময় এবং ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। যেভাবে খ্রিস্টের পুনরুত্থান ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছে, তেমনি বিশ্বাসী ও সদিচ্ছা সম্পন্ন প্রতিটি মানুষকেই এখন একটি শান্তিপূর্ণ, মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রেমময় পৃথিবীর জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

যখন আমরা দেখি যে পুনরুত্থানের ধারণাটি অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়, তখন আমরা ইস্টারের বার্তার বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। এই উপলব্ধি আমাদেরকে একসাথে পথ চলার অনুপ্রেরণা জোগায় - একটি নবীকৃত, ন্যায়নিষ্ঠ এবং সম্প্রীতিময় পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে। ❑

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার
৮৫ বছর

জেরুশালেমের পুণ্যভূমিতে আমার এক অভুতপূর্ব অভিজ্ঞতা

সিস্টার ফ্লোরেন্স মিতা দাস এসএসএমআই

যিশু খ্রিস্টের জন্মভূমিতে তীর্থ করার আকাঙ্খা সকল খ্রিস্টভক্তের একটি সুপ্তবাসনা। বাংলাদেশে বসবাসরত খ্রিস্টভক্তদের জন্য এটা একটা অপূরণীয় অভিলাষ হলেও বেশ কিছু খ্রীষ্টভক্তের পুণ্যভূমিতে তীর্থ করতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। ঈশ্বর আমাকে অনেক অনুগ্রহ করেছেন এবং সুযোগ করে দিয়েছেন যাতে আমি খ্রিস্টধর্মের প্রধান দু'টি কেন্দ্রীয় দেশ, ইস্রায়েল এবং ইতালী, বিশেষ করে জেরুশালেম এবং রোমে তীর্থ করতে পারি। পবিত্র বাইবেলের উপর পড়াশোনা করার সুবাদে আমি রোমে বসবাস করেছি ১২ বছর (জুন ২০১৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫)। এই পড়াশোনারই অংশ হিসেবে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে জেরুশালেমে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বাইবেলের ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন এবং এগুলো নিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করার জন্য আমাকে ১ মাসের জন্য জেরুশালেমে থাকতে হয়েছিল। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা প্রায় ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী, যারা পবিত্র বাইবেল নিয়ে Pontifical Biblical Institute - এ পড়াশোনা করতাম, জেরুশালেমে গিয়েছিলাম বাইবেলের ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করতে। প্রতিবছর Pontifical Biblical Institute থেকে ছাত্র-ছাত্রীগণ এই কোর্সটি করার জন্য জেরুশালেমে যান। যীশু সংঘের যাজকদের দ্বারা পরিচালিত জেরুশালেমের কেন্দ্রে স্থাপিত Biblicum center - এ আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানেই আমাদের ক্লাশ হত এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে গিয়ে ব্যবহারিক পাঠদান সম্পন্ন হত।

আমাদের এই স্কুল থেকে গলগথা *(যোহন ১৯:১৭; মথি ২৭:৩৩; মার্ক ১৫:২২; লুক ২৩:৩৩)* যেখানে যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল এবং যে বাগানে যিশুকে কবর দেওয়া হয়েছিল, খুব বেশী দূরে নয়। এই স্থানে স্থাপিত গীর্জাটি "The Holy Sepulchre Church" নামে পরিচিত। যোহন ১৯: ৪১-৪২ অনুসারে, যে স্থানে যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তার কাছেই একটি বাগান ছিল আর ঐ বাগানে একটি নতুন সমাধি ছিল যেখানে যিশুকে কবরস্থ করা হয়েছিল। এবং এই বাগানে সমাধি গুহার বাইরে পুনরুত্থিত যিশু প্রথম মাগ্‌দালার মারীয়াকে দেখা দিয়েছিলেন *(যোহন ২০:১৪)*। "The Holy Sepulchre Church" টি ৫টি ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনাকে ধারণ করে আছে: (১) যেখানে যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল *(যোহন ১৯:১৭-১৮)*; (২) ক্রুশ থেকে নামিয়ে যেখানে যিশুকে রাখা হয়েছিল *(যোহন ১৯:৩৮-৩৯)*; (৩) যিশুর সমাধি (যোহন ১৯: ৪১-৪২); (৪) যেখানে যিশু মাগ্‌দালার মারীয়াকে দর্শন দিয়েছিলেন *(যোহন ২০: ১১-১৮)*; এবং (৫) যেখানে সাধ্বী হেলেনা যিশুর ক্রুশটি আবিষ্কার করেছিলেন। এই গীর্জাটি পুরাতন জেরুশালেম শহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গীর্জাটি প্রথম গড়ে তুলেছিলেন রোম সম্রাট মহান কনস্টানটাইন ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীতে এই গীর্জাটি অনেকবার ধ্বংস করা ও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল এবং পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন করা হয়েছে। গীর্জাটির বর্তমান অবকাঠামোটি গড়ে তোলা হয়েছে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে।

যিশুর কবরটি সংরক্ষিত করার জন্য এর উপর একটি ছোট্ট মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে, যাকে বলা হয়, "The Edicule"। কালভেরী পর্বতে যে বৃহৎ পাথরের উপর প্রভু যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটি গ্লাস দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং এর উপরে একটি বৃহৎ ক্রুশ সম্বলিত একটি বেদী তৈরী করা হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার খ্রিস্টভক্ত আসেন এখানে তীর্থ করতে। তারা ঘন্টার পর ঘন্টা এখানে থেকে প্রার্থনা করেন ও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। অনেক ভক্ত আবার সারা রাত নিশি জাগরণ ও প্রার্থনায় কাটান। আমিও অন্যান্য সহপাঠী সিস্টারদের সঙ্গে মিলিতভাবে ওখানে নিশিজাগরণ ও প্রার্থনা করেছিলাম। কালভেরীতে কষ্টভোগী যিশুর উপস্থিতি উপলব্ধি করে মনের মধ্যে একটা গভীর প্রশান্তি ও সুখ অনুভূত হয়েছিল যা আর কখনও হয়নি। অধিকাংশ খ্রিস্টভক্ত তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে কালভেরীতে যান। যিশুর যাতনাভোগ ও কষ্টের সঙ্গে নিজের দুঃখ-কষ্ট, অসুস্থতা-সমস্যা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করে সেগুলো ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের উপায় বা অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে শেখেন। যেকোন সমস্যা, দুঃখ-কষ্টকে আমি ঈশ্বরের দান এবং অনুগ্রহ লাভের উপায় হিসেবে বিবেচনা করতে শিখেছি। যিশুর সমাধিতে গিয়ে নিজের জাগতিক ও নেতিবাচক মন-মানসিকতাকে যিশুর সাথে সমাধিস্থ করে এবং সমাধি থেকে বেরিয়ে পুনরুত্থিত যিশুর দর্শন লাভের জন্য যখন মাগ্‌দালার মারীয়ার মত বাইরের গ্রোটোতে গিয়েছি তখন নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। পুনরুত্থিত যিশুর কণ্ঠস্বর এবং স্পর্শ নিজের মধ্যে যেমন উপলব্ধি করতে পেরেছি, তেমনি ওখানকার নিরব-নিস্তব্ধ পরিবেশে যিশুর পদধ্বনি ও উপস্থিতি অনুভব করতে পেরেছি। এ এক অভুতপূর্ব অনুভূতি। এক ধরণের স্বর্গীয় আনন্দ ও তৃপ্তি আমার মনকে প্রফুল্ল করে তুলেছিল, যা আমি আগে কখনও উপলব্ধি করে নি। এক আশ্চর্য প্রশান্তিতে আমার হৃদয় মন ভরে গিয়েছিল। যিশুর সঙ্গে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ, মৃত্যুবরণ করে ও সমাধিস্থ হয়ে নিজের রূপান্তর ঘটে, নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা এ যেন এক নতুন জন্ম।

এছাড়াও জেরুশালেম শহরে যে বাড়ীতে যিশু তার শিষ্যদের সঙ্গে শেষ ভোজ করেছিলেন, মহাযাজকের প্রাসাদে যেখানে মহাযাজক, যাজকগণ, প্রবীণগণ ও শাস্ত্রীগণ যিশুর বিচার করেছিলেন *(মথি ২৬:৫৭-৭৫)*, পিলাতের প্রাসাদে যেখানে যিশুর বিচার কার্য সম্পন্ন করা হয়েছিল *(মথি ২৭:১১-৩০)*, যেখানে যিশুকে কষাঘাত করা হয়েছিল, যে রাস্তা দিয়ে যিশু ক্রুশ বহন করে কালভেরী পর্বতে গিয়েছিলেন সেই সকল ঐতিহাসিক স্থান দেখার ও যিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস ও অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করার সুযোগ আমার হয়েছিল।

---

[১] সাধ্বী হেলেনা হলেন রোম সম্রাট মহান কনস্টানটাইন-এর মা, যিনি ৩২৬ খ্রিস্টাব্দে জেরুশালেমে তীর্থ করতে গিয়ে যেখানে যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেখানে খনন কাজ চালান এবং তিনটি ক্রুশ খুঁজে পান, যার একটি ছিল যিশুর ক্রুশ এবং তা প্রমাণিত হয়েছিল আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে।

[২] সেই বাড়ীটিকে বলা হয় "The Cenacle on Mount Zion"।

এছাড়াও আমি গিয়েছিলাম বেথলেহেমে শহরে যেখানে যিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন *(লুক ২:৪-৭)*। এই শহরটি জেরুশালেম থেকে ১০ কি.মি দক্ষিণে এবং প্যালেস্টাইন এর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। হিব্রু বাইবেল অনুসারে বেথলেহেম রাজা দায়ূদেরও জন্মভূমি *(লুক ২:৪-৫)*। এই শহরে যিশুর জন্মস্থানে স্থাপিত গীর্জাটির নাম "The Church of the Nativity"। এই গীর্জাটি গড়ে তোলা হয়েছিল রোম সম্রাট মহান কন্‌স্টানটাইনের আমলে ৩২৭ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়াও আমি গিয়েছিলাম গালিল সাগর, জর্ডন নদী, কাফার্নাউমে সাধু পিতরের বাড়ীতে *(মথি ৮:১৪)*, যে পর্বতে বসে যিশু অষ্টকল্যাণ বাণী দিয়েছিলেন *(মথি ৫:২-১২)*, তাবর পর্বতে যেখানে যিশুর দিব্য রূপান্তর ঘটেছিল *(মথি ১৭:১-৯)*, যে এলাকায় যিশু শিক্ষা দিয়েছিলেন, পাঁচ হাজার লোককে *(মথি ১৪:১৩-২১; মার্ক ৬:৩০-৪৪; লুক ৯:১০-১৭; যোহন ৬:১-১৫)* এবং চার হাজার লোককে খাইয়েছিলেন *(মথি ১৫:৩২-৩৮)*। জর্ডন নদীর যে অংশে যিশু দীক্ষাগুরু সাধু যোহন কর্তৃক দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন *(মথি ১৩:১৩-১৭)*, সেখানে গিয়ে আমি নদীর পানিতে হেঁটেছি! কানা নগরে যে বিয়ে বাড়ীতে যিশু জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন *(যোহন ২:১-১০)* সেখানে গিয়েছি। নাজারেথ শহরে সাধু যোসেফ ও মা মারীয়ার বাড়ীতে গিয়েছি *(মথি ২:২৩)*। সেখানে যেন এখনও তাদের অদৃশ্য উপস্থিতি বিরাজমান। গালিল সাগরে যে অংশে যিশু অনেক সময় নৌকায় করে এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে গিয়েছেন *(মথি ৮:১৮, ২৮; ৯:১)* সেখানে গিয়ে হাটু পানিতে নেমে হেঁটেছি।

যেহেতু আমরা পড়াশোনা করে মানসিকভাবে ও আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এই সকল স্থান পরিদর্শন করেছিলাম তাই আমাদের অনুভূতিটাও খুব প্রখর ছিল। সমগ্র মঙ্গলসমাচার যেন আমার কাছে এক জীবন্ত মঙ্গলসমাচার হয়ে উঠেছিল। আমি যেন সেই যিশুর আমলে বাস করছিলাম। আমার আবেগ ও অনুভূতি যেন ঐতিহাসিক যিশুর স্পর্শ উপলব্ধি করতে পারছিল। আমি পিতা পরমেশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে এমন একটি সুযোগ ও অনুগ্রহ দান করার জন্য।

যিশু একজন ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন। তিনি ইহুদী জাতির মানুষ ছিলেন। তিনি বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নাজারেথ এ বড় হয়েছিলেন। গালিলেয়া ও এর আশ-পাশের অঞ্চলে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করেছিলেন, অনেক আশ্চর্যকাজ করেছিলেন যার অল্প কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা মঙ্গলসমাচারে বর্ণনা করা হয়েছে। ইহুদী জাতির ধর্মীয় নেতাদের রোষানলে পড়ে রোমীয় শাসকের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছিলেন। পিলাত তাকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। রোমীয় শাসননীতি অনুসারে জেরুশালেমে তার উপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। শেষে তাঁকে জেরুশালেমের বাইরে নিয়ে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে আবদ্ধ রাখার ক্ষমতা মৃত্যুর ছিল না। মৃত্যুকে পরাজিত করে তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়ে মাগ্‌দালার মারীয়া *(যোহন ২০:১১-১৮)*, প্রেরিত শিষ্যদের *(লুক ২৪:৩৬-৪৩; যোহন ২০:১৯-২১:১৩)* এবং শত শত মানুষকে দেখা দিয়ে তিনি যে পুনরুত্থিত হয়েছেন তার নানা প্রমাণ দিয়েছিলেন *(১ করি ১৫:৬)*। আর এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন সমগ্র মানব জাতির মুক্তিদাতা প্রভু। খ্রিস্টধর্ম কোন ভ্রান্ত ও মনগড়া বা কাল্পনিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। খ্রিস্টধর্ম ও বিশ্বাস খাঁটি সত্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সবকিছুই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। ❑

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY LIMITED

Reg. No. 1209/1970

Church Community Centre, 9, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1215, Phone: 9115935

নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ - ২০২৫

এতদ্বারা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিমিটেড এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৯/১/২০২৫ তারিখের ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন আগামী ২৩/০৫/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত, চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, সমিতির নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী, একজন ম্যানেজার, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং চার জন পরিচালক বিরতীহীনভাবে সমিতির সদস্য-সদস্যাদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে।

উক্ত নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করে ভোট প্রদানের জন্য এবং বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনী কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

ডমিনিক রঞ্জন গমেজ
সেক্রেটারি
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার ৮৫ বছর

পুনরুত্থান পর্ব ও খ্রিস্টীয় জীবন

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা

০১. পাস্কা পর্বের প্রস্তুতি

খ্রিস্টীয় উপাসনা বর্ষচক্রে তপস্যাকাল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ উৎসব। তপস্যাকালের যাত্রা শুরু হয় ভস্ম বুধবার কপালে ছাই লেপনের মধ্য দিয়ে। তপস্যাকালের আহ্বান হলো মন পরিবর্তন, আত্মমূল্যায়ন এবং মন্দতা ও পাপের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার। তপস্যাকালে দান *(মথি ৬: ২-৪)*, প্রার্থনা *(মথি ৬:৫-৬)* ও উপবাসের *(৬: ১৬-১৬)*, উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তপস্যাকালীন সময়ের আধ্যাত্মিক অনুশীলন গুলো: খ্রিস্টযাগ, পাপস্বীকার, ক্রুশের অর্চনা, ক্রুশের পথ ইত্যাদি। কোন কোন এলাকায় যিশুর কষ্টের পালা গান, যাতনা ভোগের পালা, কষ্টের গীত, যিশুর পা ধুয়ানো অনুষ্ঠান করে থাকে। ৪০ দিনের আধ্যাত্মিক যাত্রার আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে খ্রিস্টভক্ত যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্বের অংশীদার হয়ে উঠে। পাস্কা পর্বের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিই প্রধান এবং তপস্যার মাধ্যমে মন পরিবর্তন করা।

০২. পাস্কা থেকে পুনরুত্থান

মূল হিব্রু শব্দ থেকে 'পাস্কা' শব্দটির উদ্ভব। পাস্কা আক্ষরিক অর্থ হলো: পার হওয়া, অতিক্রম করা, এড়িয়ে যাওয়া, রেহাই পাওয়া, স্বাধীন হওয়া ইত্যাদি। ইস্রায়েল জাতি দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে ৪০০ বছর এবং যাত্রা পথে ৪০ বছর লেগেছিল। মহা নায়ক মোশীর নেতৃত্বে দেশে পৌঁছতে বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা ও ঈশ্বরের দয়া-কৃপা-অনুগ্রহ লাভ করেছিল। ইহুদী জাতির ভৌগলিক সীমারেখা থেকে স্বাধীন দেশ লাভ করেছিল। তারই স্মরণে তার নিস্তার জাগরনী উৎসব উদ্‌যাপন করতো এবং মেষ শাবক বলি দিতো। নতুন নিয়মে যিশু হলেন বলিকৃত মেষ। তিনি গোটা মানব পরিত্রাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অন্ধকার দুরীভূত হয়েছে। পাপের পরাজয় হয়েছে এবং যিশু পুনরায় উত্থিত হয়েছেন। তাই পুনরুত্থান শব্দটি দিয়ে বিশ্বাসের জীবনে জেগে উঠা, জাগরিত হওয়া, সজীব হওয়া, পুনরায় আরম্ভ হওয়াকে বুঝায়। পুনরুত্থান তাই নতুনভাবে যাত্রা করাকে বুঝায়; হতাশা-নিরাশা অবসান ঘটিয়ে যিশুর সাথে পথ চলাকে বুঝায়। পুনরুত্থান হলো জাগরিত হওয়া, সচেতন সজাগ হওয়া।

০৩. পবিত্র বাইবেল ও মণ্ডলীর শিক্ষায় পাস্কা পর্ব

পবিত্র 'জুবিলী বাইবেলের' ঐশতাত্ত্বিক শব্দ টীকায় অর্থপূর্ণভাবে পাস্কা ও পুনরুত্থান পর্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে যা বাইবেলের, মণ্ডলীর শিক্ষা ও পাস্কা পর্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্পষ্ট ভবে ফুটে উঠেছে। "পাস্কা পর্বে ইস্রায়েলীয়েরা মিশর দেশ থেকে মুক্তিলাভের কথা স্মরণ করত। পরবর্তীকালে এই পর্বের সঙ্গে আর একটা পর্ব যোগ দেওয়া হল যার নাম খামিরবিহীন রুটির পর্ব; এই উপলক্ষে ইস্রায়েলীয়েরা পুরানো যত খামির ফেলে দিত; তার মানে, পাপময় আচরণ বর্জন করে তারা খাঁটি মানুষের মত জীবন যাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করত। যিশু সম্ভবত পাস্কা-ভোজেই নিজ নবসন্ধি স্থির করলেন। 'পাস্কা' শব্দের সম্ভাব্য অর্থই পাশ কাটিয়ে যাওয়া, ডিঙিয়ে যাওয়া, পার হওয়া, উত্তরণ *(যাত্রা ১২; ২ বংশ ৩৫:১৮; মথি ২৬:২৬; ১ করি ৫:৮)*"।

০৪. 'খ্রিস্ট পুনরুত্থিত, সত্যিই পুনরুত্থিত', আল্লেলুইয়া!

যিশুর জীবনের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা তথা ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনরুত্থান এসেছে। তপস্যাকালের ৬ষ্ঠ রবিবার হলো তালপত্র রবিবার এবং তালপত্র রবিবারে যিশুর যাতনাকালের কাহিনী পাঠ ও ধ্যান করার মধ্যে দিয়ে মহাসপ্তাহে প্রবেশ করা হয়। পুণ্য সপ্তাহের প্রতিটি দিনের আলাদা আলাদা অর্থ ও সৌন্দর্য রয়েছে। সোমবার: খ্রিস্ট পুনরুত্থিত, মঙ্গলবার: পুনরুত্থিত খ্রিস্টের বিজয় শেষ অবধি বিরাজমান, বৃহস্পতিবার: নতুন যাত্রা, শুক্রবার: পুনরুত্থিত খ্রিস্টের রক্তে মুক্তি বা পরিত্রাণ, শনিবার: যিশুতে নতুন জীবন। মহাসপ্তাহের পুণ্য বৃহস্পতিবার, পুণ্য শুক্রবার এবং শনিবার অর্থ যিশুর জীবনের নানা দিক প্রকাশ করে। এই দিনগুলোকে 'দিসবত্রয়' বলা হয়: পুণ্য বৃহস্পতিবার 'প্রভু যিশুর শেষ ভোজে'র স্মরণোৎসব *(মথি ২৬: ২৬-২৯, মার্ক ১৪:২২-২৫)* ১২ জন শিষ্যদের নিয়ে। এদিন যিশু খ্রিস্টপ্রসাদ ও যাজকবরণ সংস্কার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই পুণ্যদিনকে 'যাজক দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পুণ্য শুক্রবার: প্রভু যিশুর ক্রুশীয় যন্ত্রণা, মৃত্যুর কথা স্মরণ ও ধ্যান করা হয়। খ্রিস্টীয় উপাসনায় পুণ্য শুক্রবারে ক্রুশীয় মৃত্যু স্মরণ উৎসবটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনে। পুণ্য শনিবার: নিস্তার জাগরণীর মধ্য দিয়ে যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। 'খ্রিস্ট পুনরুত্থিত, সত্যিই পুনরুত্থিত', আল্লেলুইয়া! এই ধুয়ো বাণী খ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্বকে পূর্ণতা দান করে।

০৫. যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা

আদিমণ্ডলীতে উৎসবময় ব্যঞ্জনায় পুনরুত্থান পর্বটি উদযাপন করা হতো। পুনরুত্থান পর্ব ও রবিবারই ছিল একমাত্র উৎসব। ৩২৫ খ্রিস্টাব্দের নিসিয়া মহাসভায় প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র প্রার্থনাটি আনুষ্ঠানিক লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পুনরুত্থান পর্বটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার পর সঠিক দিন ও সময়ক্ষণ নির্ধারণ করা হয়। পাস্কা পর্বটি এসেছে ইহুদীদের নিস্তার পর্ব থেকে। খ্রিস্টধর্মীয় শব্দার্থ বইয়ে বলা হয়েছে, "ইহুদীদের একটি মহাপর্ব; প্রতি বছর 'নিশান' মাসের ১৫ তারিখে পর্বটি উদ্‌যাপিত হয় (নিশান হলো নির্বাসনোত্তর হিব্রু ক্যালেণ্ডারের প্রথম মাস অর্থাৎ আমাদের মার্চ ও এপ্রিল মাস)। এ পর্বের সময় মিশরীয় দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধারের ঘটনাকে স্মরণ করা হয় *(দ্রঃ যাত্রা পুস্তক ১২ অধ্যায়)*। পাঠটির শেষ হয় বলির মেষ ভোজনের মধ্যে দিয়েই। পরবর্তী দিনগুলোতে খামিরবিহীন রুটির পর্বের সাথে সমন্বয় রেখে পর্বটি সপ্তাহব্যাপী পালিত হয়। খ্রিস্টীয় নিস্তার উৎসব হল ঈশ্বরের মেষশাবক যিশুখ্রিস্টের বলি-উৎসর্গ

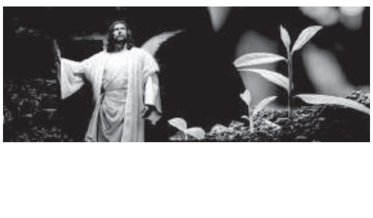

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

যার দ্বারা মানবজাতি পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের স্বাধীন পুত্র-কন্যা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে" *(শব্দটীকা ২৪৫)*। যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কথা বর্ণিত হলো:

➢ যিশু বলেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে; আর জীবিত যে-কেউ আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতেই পারে না-কোন কালেই না" *(যোহন ১১:২৫-২৬)*।

➢ মহান সাধু আথানাসিউস (২৯৬-৩৭৩) পুনরুত্থান পর্বকে 'মহা রবিবার' নামে আখ্যায়িত করেন। প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে পুণ্য সপ্তাহকে 'মহা সপ্তাহ' বলে আখ্যায়িত করে।

➢ 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'পুনরুত্থান' রহস্য দ্বারা খ্রিস্ট মৃত্যুকে চূর্ণ করেছেন তার সেই রহস্যের মহাশক্তি আমাদের পুরানো কালপ্রবাহে প্রবেশ করে যে পর্যন্ত না সবকিছু তার অধীন হয়" (ধারা ১১৬৯)। পুনরুত্থিত পর্বটি রবিবারের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই প্রতিটি রবিবারকে একটি 'ছোট পাস্কা' বলা হয়।

➢ 'কাথলিক মণ্ডলী ধর্মশিক্ষা'য় পুনরুত্থান বিষয় বলা হয়েছে, "হে খ্রিস্ট, তোমার পুনরুত্থানের রবিবার দিন তোমার দ্বারা সম্পাদিত মহা আশ্চর্য কাজগুলো যখন ধ্যান করি তখন আমরা বলি: ধন্য এই রবিবার কারণ এই দিনে আরম্ভ হয়েছে সৃষ্টি... পৃথিবীর পরিত্রাণ... মানবজাতির নবায়ন। রবিবার দিনে স্বর্গ পৃথিবী আনন্দ করেছে এবং সমগ্র বিশ্বমণ্ডলী আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ধন্য এই রবিবার কারণ এই দিনে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে যাতে আদম ও নির্বাসিত সবাই নির্ভয়ে সেই দ্বারের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে পারে" (ধারা ১১৬৭)।

➢ বাইজান্টাইন উপাসনায় উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রভুর দিন পুনরুত্থানের দিন, খ্রিস্টভক্তের দিন, যা হচ্ছে আমাদের দিন। একে প্রভুর দিন বলা হয়, কারণ এই দিনে প্রভু পিতার নিকট বিজয়ীরূপ পুনরুত্থান করেছেন। বিধর্মীরা যদি একে সৃষ্টির দিন বলে তার তাদের সঙ্গে আমরা একমত কারণ এই দিনে পৃথিবীর আলো উদিত হয়েছে, এই দিনে প্রকাশিত হয়েছে ন্যায়ের সৃষ্টি যার কিরণ স্কন্ধে নিরাময় স্বায়িত হয়"।

➢পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতার আলোকে সাধু পল বলেন, "আমিতো খ্রীষ্টকে জানতে চাই; জানতে চাই কেমনতর তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি; আমি চাই তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণারও অংশীদার হতে, তাঁর মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করে সমরূপ হয়ে উঠতে" *(ফিলিপ্পীয় ৩:১০)*। তিনি আরো বলেন, "যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই তিনি তোমাদের মরণশীল দেহকেও সঞ্জীবিত করে তুলবেন তোমাদের অন্তরনিবাসী তাঁর সেই আত্মারই শক্তিতে" *(রোমীয় ৮: ১১)*।

➢ কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা' বইয়ের ১১৬৯ নং ধারায় বলা হয়েছে: "সুতরাং পুনরুত্থানপর্ব শুধুমাত্র অনেক পর্বের একটি পর্ব নয়, বরং এটি হচ্ছে 'পর্বের পর্ব' এবং 'মহোৎসবের মহোৎসব' ঠিক যেমনটি হয় খ্রিস্টপ্রসাদের ক্ষেত্রে, কারণ খ্রিস্টপ্রসাদ হচ্ছে 'সংস্কারের সংস্কার' (মহা সংস্কার)।

➢ সাধু আথানাসিউস পুনরুত্থান পর্বকে 'মহা রবিবার' বলে অভিহিত করেছেন, এবং প্রাচ্য মণ্ডলীগুলো 'পুণ্য সপ্তাহকে' মহা সপ্তাহ বলে আখ্যায়িত করেছে। পুনরুত্থান রহস্য, দ্বারা খ্রিস্ট মৃত্যুকে চূর্ণ করেছেন, তার সেই রহস্যের মহাশক্তি আমাদের পুরনো কাল প্রবাহে প্রবেশ করে যে পর্যন্ত না সবকিছু তাঁর অধীন হয়"।

➢ স্বর্ণ যুগের বিশিষ্ট লেখক ও বাগ্মি সাধু জন খ্রীসোস্তম (৩৪৭-৪০৭) বলেন: "এই সপ্তাহকে 'মহা সপ্তাহ' বলা হয় এ কারণে নয় যে, এর মধ্যে আরও বেশী দিন রয়েছে, বা এই দিনগুলো বেশী দীর্ঘ, বরং এই কারণে যে, এই সপ্তাহে ঈশ্বর দ্বারা মহান কাজ সাধন করা হয়েছে"।

➢ হিপ্পো নগরীর মহান সাধু আগষ্টিন (৩৫৪-৪৩০) পুনরুত্থান পর্বকে আল্লেলুইয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, "আমরা পুনরুত্থানের জনগণ এবং আল্লেলুইয়া আমাদের গান"।

➢ সার্দিসের ধর্মপাল মেলিতনের 'পাস্কা উপদেশ' "তবে এসো আবদ্ধ সকল জাতির মানুষ; পাপমোচন গ্রহণ কর। কেননা আমিই তো তোমাদের পাপমোচন, আমিই পরিত্রাণদায়ী পাস্কা, আমি তোমাদের খাতিরে বলীকৃত মেষশাবক, আমিই তোমাদের প্রক্ষালন, আমিই তোমাদের জীবন, আমিই তোমাদের পুনরুত্থান, আমিই তোমাদের আলো, আমিই তোমাদের পরিত্রাণ, আমিই তোমাদের রাজা। আমি নিজেই স্বর্গের উর্ধ্বস্থানে তোমাদের নিয়ে যাই; আমি নিজেই তোমাদের পুনরুত্থিত করে তুলব ও স্বর্গস্থ পিতাকে তোমাদের দেখাব। আমি নিজেই আমার ডান হাতে তোমাদের উন্নীত করব"।

০৬. পুনরুত্থান পর্ব; আল্লেলুইয়া আমাদের গান

হিব্রু শব্দ থেকে আল্লেলুইয়া শব্দটির উদ্ভব। আল্লেলুইয়া শব্দটির অর্থ হলো ঈশ্বরের গৌরব কীর্তন ও প্রশংসা করা, "মঙ্গলসমাচারের যিশু ও তার শিষ্যেরা স্তুতিগান করেন। "এবার স্তোত্র গান করার পর তাঁরা জৈতুন পর্বতের পথে বেরিয়ে পড়লেন" *(মথি ২৬:৩০)*। পুনরুত্থানের আত্মিক শক্তি ও অনুগ্রহে আমরা নতুনভাবে পথ চলার শক্তি ও সাহস অর্জন করি। এম্মাউসের যাত্রাপথে দু'জন ভগ্ন হৃদয় শিষ্য *(লুক ২৪: ১৩-৩৫)* খ্রিস্টকে চেনার পর অন্তরে শক্তি সাহস ও আনন্দ উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা প্রচার করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। প্রকৃত অর্থে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের শান্তি আশির্বাদ আমাদেরকে ব্যাকুল করে তোলে সেই সংবাদ অন্যকে জানাতে- 'কবরে নাইরে যিশু কবরে নাই'। বিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলবেডের (১১১০-১১৬৭) পাস্কা বিষয়ক অনুধ্যানটি খুবই অর্থপূর্ণ। তিনি পাস্কা পর্বের উপদেশে বলেন, "প্রথম পাস্কা হলো, ইহুদিদের পাস্কা, দ্বিতীয়টি হলো খ্রিস্টানদের পাস্কা, তৃতীয়টি পুণ্যজনদের বা সিদ্ধ পুরুষদের পাস্কা। ইহুদিদের পাস্কায় একটা মেষশাবক বলিকৃত, আমাদের পাস্কায় খ্রিস্ট বলিকৃত, পুণ্যজনদের ও সিদ্ধপুরুষদের পাস্কায় খ্রিস্ট গৌরবান্বিত। ইহুদিদের পাস্কায় একটা মেষশাবক বলিকৃত হয় বটে কিন্তু তার দৃষ্টান্তরূপে খ্রিস্টের আত্মবলিদানের পূর্বাভাস উপস্থিত। অপরদিকে আমাদের পাস্কায় খ্রিস্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ নয় বাস্তবে বলিকৃত হন"।

খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য পুনরুত্থানকাল হলো পুণ্য সংস্কার গুলোর মধ্যে দিয়ে খ্রিস্টীয় জীবনের ঐশ কৃপা ও পূর্ণতা লাভের সময়। এই সংস্কার গুলো হলো: 'দীক্ষাস্নান, খ্রিস্ট প্রসাদ ও হস্তার্পণ' যা খ্রিস্টীয় জীবনের প্রবেশ সংস্কার এবং খ্রিস্টীয় জীবনের পূর্ণতা দান করে। পুণ্য শনিবারের জল নব জীবনের অর্থ প্রকাশ করে যা গোটা বছর দীক্ষাসংস্কার ও বাড়ি আশির্বাদসহ সকল প্রকার আশীর্বাদে ব্যবহার করা। তাই পুনরুত্থান পর্ব হলো আনন্দের গৌরবের এবং আত্মিক শক্তি ও অনুগ্রহ লাভের সময়। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ব্যতীত খ্রিস্ট মণ্ডলী নেই। মরনজয়ী খ্রিস্ট আমাদের দান করুক নব জীবনের আনন্দ, শান্তি, ক্ষমা ও ভালোবাসা। সাধু আগষ্টিনের ভাষায় পুনরুত্থান হলো "আমরা পুনরুত্থানের জনগণ এবং আল্লেলুইয়া আমাদের গান"। 'খ্রিস্ট পুনরুত্থিত এবং সত্যিই পুনরুত্থিত'। শুভ পাস্কা!!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

● কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, জেরী প্রিন্টিং, ঢাকা, ১৯৯৯।

● জীবন বাণী- ৬: বাইবেল ধ্যান-পত্র, (সম্পাদনা: ফাদার সিলভানো গারেল্লো) আলোর পথ পুনরুত্থানের পথ, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০১৩।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার
৮৫ বছর

পাপময় জীবন পরিত্যাগের ভাবনায় হোক পুনরুত্থান উৎসব

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

যিশু হলেন মরণ-বিজয়ী মহাবীর। মৃত্যুকে জয় করে আবার বেঁচে ওঠা একেবারে অভিনব, অভুতপূর্ব ঘটনা। যিশুর কাছে মৃত্যু হার মেনেছে। তাই সাধু পল বলেছেন: "ওহে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? কোথায় মৃত্যু, তোমার সেই অঙ্কুশ?" *(১ করিন্থীয় ১৫: ৫৫)*। খ্রিস্টের পুনরুত্থান হলো আমাদের নবজীবনের অঙ্গীকার। খ্রিস্ট চান, আমরা যেন শান্তি ও মিলনের রাজ্যে বাস করি। প্রেম, দয়া, ক্ষমা, সহযোগীতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হই। পুনরুত্থানের বারতা হলো পুনরুত্থিত খ্রিস্টের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে নতুন মানুষে রূপান্তরিত হওয়া।

আমরা কি সত্যিই পুনরুত্থিত ব্যক্তি? আমরা কি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের স্পর্শ পেয়েছি? লোকেরা কি আমাদের জীবনে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের ছাপ দেখতে পায়? কোথায় আমরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পেতে পারি? আমরা কী করতে পারি যাতে বিশ্বাসীভক্তগণ সত্যিই পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে? কী পদক্ষেপ অনুসরণ করলে, আমরা যিশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে সক্ষম হব? যিশুর সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়ে নতুন জীবনের প্রতিফলন আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে কী উপায়গুলির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি কি পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে আমরা যিশুর পুনরুত্থানের বার্তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রচার করতে সক্ষম হব?

পুনরুত্থানকালের তাগিদ ও আত্মিক চিন্তাভাবনা

খ্রিস্টীয় জীবন হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস। *"মুখে তুমি যদি সকলের সামনে যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং অন্তরে যদি বিশ্বাস কর যে, পরমেশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করবে" (রোমীয় ১০:৯)*।

শাস্ত্রবাণী স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের যাত্রা অন্ধকার থেকে আলোতে । সাধু পলের কথা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করুক : *"তোমরা যখন খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন তোমরা সেই সব কিছু পেতে চেষ্টা কর, যা রয়েছে উর্ধ্বলোকে। তোমাদের মনটা সর্বদাই ভরে থ াকুক ওই উর্ধ্বলোকের যা কিছু, তারই চিন্তায়-যা কিছু এই মর্তলোকের, তার চিন্তায় নয়" (কলসীয় ৩:১)*।

যখন আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের সহায়তায় আমাদের পাপকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই, তখনই আমাদের মধ্যে পুনরুত্থিত শক্তি কাজ করে। মৃত্যুর উপর খ্রিস্টের জয়ে আমরা উল্লসিত হই ও আনন্দ করি।

যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ফলে আমরা "নুতন সৃষ্টি হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছি। খ্রিস্টমণ্ডলী ও বিশ্বাসীভক্তের মিলন সমাজ হলো পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দেহ। খ্রিস্টীয় জীবন হলো নতুন জীবন, খ্রিস্টেতে জীবন যাপন। পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্টের মত চিন্তা ও কাজ করা। "তোমাদের মনোভাব তেমনটি হওয়া উচিত, যেমনটি খ্রিস্ট-যিশুর নিজেরই ছিল" *(ফিলিপ্পীয় ২:৫)*।

মন্দতা পরিত্যাগের ভাবনা: 'খ্রিস্ট, আমাদের নিস্তার পর্বের মেষশাবক যিনি, তিনি কি বলিরূপে উৎসর্গকৃত হননি? সুতরাং এসো আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি পুরানো খামির দিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধর্মেরও খামি নিয়ে নয়,বরং আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠার খামির বিহীন রুটি নিয়ে' *(১ করি ৫:৭-৮)*। প্রাত্যহিক জীবন বাস্তবতার নিরিখে আজ যেন মৃত্যুর সংস্কৃতি হানা দিচ্ছে। ধ্বংস যজ্ঞ ও জীবন বিনাশের বাস্তবতা খুবই প্রকটভাবে অনুভুত হচ্ছে। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে (৮০০) আট শর বেশী মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২১ হাজারের বেশী। অনৈতিক কার্যকলাপ, বৈষম্য, বিরোধিতা, বিদ্রোহ, বিপ্লব, বিশৃঙ্খলা, বিচ্ছিন্নতা. বিদ্বেষ, বিদ্রুপ, বাক-বিতণ্ডা, অপ্রেম ও অশ্রদ্ধা, অবিচার, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ, যৌন নিপীড়ন, বাসে ডাকাতি, আত্মিক জীবনের প্রতি উদাসীনতা, মানব নৈতিকতার বিপর্যয়, এবং যুদ্ধ বিগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ন্যায্যতা আজ পদদলিত। স্বজনপ্রীতির জয় জয়কার। নারীর প্রতি সহানুভূতি নেই। প্রতিশোধ নেওয়া যেন নিত্য দিনের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব ও পুলিশের হাতে মানুষ গুম, অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন। বিধ্বস্ত হয়ে গেছে দেশের ব্যাংক খাত। দেশে গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' বা 'দুষ্কৃতিবিরোধী অভিযান' শুরু হয়েছে। এরপরও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না সেই প্রশ্ন উঠছে। বৈষম্য দূরীকরণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নির্বিকার। রাজনীতিবিদদের খাসলত পাল্টাচ্ছে না এবং কোন অনুশোচনা নেই। দেশে এখন বাটপার, লুটেরা ও গোঁয়ার গোবিন্দ মব তৈরি হচ্ছে। বৈষম্যহীন দেশ গড়ার প্রত্যয় নেই। চলমান পরিস্থিতি একের পর এক যা ঘটছে, তা স্বাভাবিক নয়। প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন ইস্যুতে বিশৃঙ্খলা, সংঘাত ও সহিংসতা ঘটছে। জনমনে হতাশা ও উৎকণ্ঠা তৈরি করছে। কোন পথে হাঁটছে রাজনীতিবিদগণ?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে নৈতিকতা বর্জিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ঘটছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি কাগজে কলমেই থেকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের অন্তর জগতকে যিশু খ্রিস্টের চিন্তার আলোকে আলোকিত করি। সহিংসতামুক্ত দেশ গড়ি। নারী কন্যাদের সুরক্ষা দান করি। আমরা ছুঁড়ে ফেলার দেয়ার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করি। পাপ ও মৃত্যুর উপর খ্রিস্টপ্রভুর পুনরুত্থান চেতনা আমাদের অনুপ্রেরণা দান করুক।

আমরা যদি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পাই, তাহলে আমরা তো খ্রিস্টীয় আচরণ করব। দুর্নীতির জয়গান গাইতে পারবো না। কথা ও আচরণের ছুরি দিয়ে ভাই বোনদের আহত করবো না। আলোর পথেই চলবো। যখন আমরা একত্রে ন্যায্যতা, শান্তি, পুনর্মিলন ও মানব উন্নয়নের কাজে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখি, ভাল চিন্তা করি, তখন আমরা পুনরুত্থানের পথে চলি।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা দেয়। খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হতেন স্বর্গ দ্বার থেকে যেত রুদ্ধ, ভোগ করতে পারতাম না জীবন বৃক্ষের অমৃত ফল।

উপসংহার: পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্টই আমাদের আশা। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, 'খ্রিস্ট যিনি ছিলেন, যিনি আছেন তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই সূচনা তিনিই সমাপ্তি! তাঁরই হাতে কালচক্র, তাঁরই হাতে যুগ-যুগান্ত! তাঁর পবিত্র ও গৌরবান্বিত পক্ষক্ষতের গুণে তিনি আমাদের রক্ষা ও পালন করেন'।

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মন্দতা ও পাপময় জীবন পরিত্যাগ করে আমরা যেন সত্য ও আলোর পথে জীবন যাপন করি। 'আর নয় বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা হোক সাম্য'। আসুন, বৈষম্য ও শোষণমুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় বেশী অবদান রাখি। অনেক দরিদ্র মানুষ মানব মর্যাদা অনুসারে জীবন যাপন করা থেকে বঞ্চিত। বিশ্বময় ন্যায্যতার সুবাতাস প্রবাহিত হচ্ছে না। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা হচ্ছে না। সকলের অন্তরে জেগে উঠুক সৃষ্টির-প্রকৃতির যত্নের ও রক্ষার চেতনা। ক্ষমতার দাপট, মারামারি, রেষারেষি, জোর-জবরদস্তি ইত্যাদি পরিত্যাগ করে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের প্রেরণা ছড়িয়ে দেই পরিবার ও সমাজে। মানুষের কাছে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মুখচ্ছবি হয়ে উঠি। যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসবের ঐকান্তিক কামনা হোক মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের সাথে "কবর থেকে উঠে" পুনরুত্থিত জীবন শুরু করা। ❑

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

যিশুর পুনরুত্থান ও আমাদের মুক্তি

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সাথে তিনিও উঠলেন, মহাশক্তি নিয়ে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করলেন, সমগ্র জগত আলো করে মানুষকে তাড়িত করলেন সেই আলোর পথ ধরে এগিয়ে যাবার। যিশুর গৌরবদীপ্ত পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে অন্ধকার ভেদে যে আলোর অভ্যুদয় ঘটেছে সেই প্রোজ্জ্বল আলো চিরকালীন, অমরত্বের; সে আলো আমাদের অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়ার, অন্ধকার কারাবাস থেকে নিজেকে মুক্ত করার। যারা অন্তর ভরে এই প্রভাতের উজ্জীবিত আলোর স্বাদ গ্রহণ করতে পারি তারা চিরকাল তাঁর সান্নিধ্য লাভে প্রবৃদ্ধ হই; যারা অন্তরের দীনতাকে আঁকড়ে থাকি, পাপে লুপ্ত হয়ে পড়ি তাদের জন্য যিশুর পুনরুত্থানের তাৎপর্য কেবল লৌকিকতায় ভরা, কিছুকাল পরে যা ম্লান ও স্থির হয়ে পড়ে।

ক্রুশের পরে যিশুর করুণ মৃত্যুর গাঁথা যেমন আমাদের বুকে রক্ত ঝরায়, দুঃখবোধকে বাড়িয়ে তোলে, তেমনি মৃত্যু থেকে তাঁর জীবিত হয়ে ওঠা, অরুণ আলোয় তাঁর দীপ্ত প্রকাশ আমাদের হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করে, আমাদের ভয়-ভাবনাকে দূর করে। তার রক্তাক্ত মুখের ছবি আমাদের হৃদয় পটে যেনো কেঁদে কথা কয়ে ওঠে; তাঁর দুঃখভোগ আমরা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করি, যা আমাদের খ্রিস্টের পথে, জীবনের পথে চলতে আহূত করে। পক্ষান্তরে মৃত্যুকে পরাজিত করে তাঁর জীবিত হয়ে ফিরে আসা আমাদের মুক্তির পথ সুগম করে তোলে।

ঈশ্বর পুত্র হয়েও যিশু ক্রুশের ভার বহন করে নিদারুণ-কঠিন যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে হার না মানা জীবনটা মৃত্যুকেই মেনে নিলেন কেবল মানুষকে পাপের ভার থেকে রক্ষা করার জন্য। আমরা পাপী জেনেও ঈশ্বর আমাদের পরিত্যাগ করেন না, তার এই ত্যাগ আমাদের নম্র ও পরস্পর ভালোবাসতে শেখায়। পবিত্র মঙ্গলসমাচারে *(লূক ২৪:৭)* এমনটিই লেখা আছে যে, "মনুষ্য পুত্রকে পাপী মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইতে হইবে, ক্রুশারোপিত হইতে এবং তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে।" যতবার তাঁর এই জীবনদানের কথা ভাবি ততবারই আমাদের বিবেক দুঃখে ও অনুতাপে ম্রিয়মাণ হয়ে ওঠে, তাঁর করুণ আর্তনাদ যেনো বুকে বর্শা বিদ্ধ করে, তাঁর তৃষ্ণার্ত জিভ আমাদের অন্তর পোড়ায়, তার পাজরের ক্ষত আমাদের অনুভূতিকে রক্তাক্ত করে। পরিত্রাণদায়ী সেই যিশু অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের হাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর পরও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ফিরে এলেন আমাদের মাঝে তার বর্শাবিদ্ধ বুকের পাজরে আমাদের টেনে নিতে, তাঁর রক্তাক্ত হাতে আমাদের বেঁধে রাখতে, তার ক্ষত বিক্ষত পায়ের সাথে পা মিলিয়ে চলতে।

সকল মৃতের মধ্য থেকে জীবনদায়ী যিশু খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান জগতে এক অতি আশ্চর্য ও চমৎকার নিদর্শন যা পৃথিবীতে আগে কখনো ঘটেনি এবং ভবিষ্যতে ঘটবে না। এই নিদর্শন মানবজাতির উত্থানের পথকে আরও সুগম করে, স্পন্দিত ও নিরাময় হয় দেহ-আত্মা, সাড়া জাগায় আমার ঘুমন্ত সত্তায়। জগতের সকল মানুষের প্রতি তাঁর যে নিবেদিন প্রাণ তার একবিন্দু টানও হয়তো আমরা অনুভব করিনা আমাদের ভাই মানুষের প্রতি। কারো জীবনের বিচ্যুতি ঘটলে, অন্ধকার আঁধারে ডুবে মরলে তাকে টেনে তুলে ধরি না অথচ একই পিতা ঈশ্বরের আদর্শে ও স্বপ্নে আমরা মানুষেরা, যারা ইচ্ছে করলেই সকল অহংকার, স্বেচ্ছাচারিতা ভুলে পরস্পর ভালোবাসার জন্য নিবেদিত হতে পারি।

পাপের পরীক্ষা ভীষণভাবে আমাদের জীবনকে বিশৃঙ্খল করে, বিপথগামী করে, আমাদের মনকে দুর্বল করে তোলে, কখনো কখনো আমাদের জীবনকে নাশও করে। পাপের হাতছানি সজোরে সরাতে না পারলে আমাদের জীবন তিলে তিলে আরও অন্ধকারের দিকে ধাবিত হবে, আমরা যতবার পাপের পথে সিদ্ধ হবো ততবার যিশুর দেহ ক্রুশে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হবে। আমাদের ধর্মাচরণই ক্রুশবিদ্ধের যন্ত্রণা থেকে যিশুকে আরাম দেয় এবং পুনরুত্থানের তাৎপর্য আরও মহিমান্বিত করে।

ঈশ্বর আমাদের নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন সুন্দর পৃথিবীর সাথে মানিয়ে চলতে, মানুষের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে জীব ও প্রকৃতির প্রেমে ও আত্মায় মিলিত হতে; যেই মিলনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পাবে তাঁর সৃষ্টির মাহাত্ম্য। ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের ভিতরে একটি প্রবল ও পরাক্রম সত্তা দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন নিজের আত্মাকে রক্ষা করার, পরিশুদ্ধভাবে জীবন যাপন করার। কিন্তু আমাদের হৃদয় এতটাই ধূসর, দৃষ্টি এতটাই ক্ষীণ যে, সেই আপন সত্তাকে বিলিয়ে দিই লোভ-লালসা আর পাপের অন্ধকারে। জগতে অন্ধকার নামে বিশ্রামের জন্য, স্বস্তি ও আরামের জন্য; তার পাপময় গহীনে ডুবে থাকার জন্য নয়। অথচ মানুষ জ্ঞানহীনের মতো পাপের অন্ধকারে মজে থাকে আর সৃষ্টির মহিমাকে কলুষিত করে। এই অন্ধকারের আঁচড়ে ধীরে ধীরে আমাদের বিবেকের অস্থিমজ্জায় শুরু হয় ক্ষত ও প্রদাহ।

আলো দানে সূর্যের যেই কৃপা মানুষ ও জগতের প্রতি, ঈশ্বরের কৃপা তারও অধিক, যা তাঁর পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট এবং তার শক্তি ও কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত এবং প্রকাশিত হয় প্রতিনিয়তই। নতুন ও চিরন্তণী বাণী এসেছে তাঁর পরাক্রমশালী কার্যের মধ্য দিয়ে; আর আমরা জগতবাসী ভূষিত হয়েছি তারই আলোর উদ্ভাসে।

পাপের আঁধারে ডুবে থাকা মানুষকেও ঈশ্বর ভালোবাসেন, তার মন ফেরানোর জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ভুলে ভরা মানুষ ঈশ্বরকে বারবার কষ্ট দিয়েছে তার কর্মের দ্বারা। অতিমাত্রায় পাপে ডুবে থাকা মানুষকে তুলে আনতে তিনি তার একমাত্র পুত্র যিশুকে জগতে পাঠালেন। অথচ সেই মানুষেরাই একসময় যিশুকে কঠিনতম শাস্তির মাধ্যমে হত্যা করে। তাতেও ঈশ্বর ক্ষান্ত হননি বরং আবারও মানুষকে ভালোবেসে মৃত্যু থেকে পরম মহিমায় জীবিত করে তুললেন যিশুকে। ঈশ্বর জগত জুড়ে আশ্চর্য কাজ করে চলেছেন সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই। মানুষ ও জগতকে ভালোবেসে তাঁর যেই ঐশরিক কর্মযজ্ঞ ও নিদর্শন, তার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের মহত্ত্ব খুঁজে পাই।

যিশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করি; যেই আত্মা পরম ঈশ্বরের আরেক রূপ। পবিত্র আত্মায় সিদ্ধ হয়ে আমরা খ্রিস্টের ভক্তগণ সাধু পিতরের মত ক্ষমতাধর ও সাহসী হয়ে ওঠি, জগতের মাঝে তাঁর মহিমা প্রচার ও বিস্তার করি। যিশুর এই পুনরুত্থান কেবল বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশের নয়, আত্মায় পরিশুদ্ধ হবার। যিনি আমাদের পাপের জন্য এতটা সহ্য করে মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনিই আবার আমাদের পরিত্রাণের জন্য কবর থেকে উত্থিত হয়েছেন; আমরা তাঁর পুনরুত্থিত মহিমার সাক্ষী হই, আমাদের কাজ ও ধর্মাচরণের মাধ্যমে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করি। ❑

যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসের যাত্রা

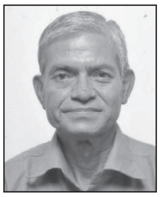

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

খ্রিস্টের অনুসারী হয়ে আজ আমরা যারা খ্রিস্টান নামে আখ্যায়িত হয়েছি, আমাদের একটি পরিচয়ই বড় করে সকলের নিকট জাহির করি "আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসী।" এ সত্য কথাটা আমাদের জীবনে সূত্রপাত হয়েছে যদিও দীক্ষাস্নানের পর থেকে, তথাপি মাতামণ্ডলীর স্বীকৃত বিভিন্ন বিশেষ পর্বোৎসবের মধ্য দিয়ে সে বিষয়টি আরো তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে উঠে যখন আমাদের জীবনে বিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে নিগূঢ়ভাবে তলিয়ে দেখি।

খ্রিস্টের জন্মোৎসব পালন করতে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা নিজেদের প্রস্তুত ও আত্মশুদ্ধি করি প্রভুকে গ্রহণ করার মানসে। অনুরূপভাবে আমাদের বিশ্বাসের যাত্রা অব্যাহত থাকে আর একটি মহোৎসব উদ্‌যাপনের জন্য। আর তা হ'ল যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্বাসের গভীরতা না থাকলে উৎসব পালন নামে মাত্রই উদ্‌যাপিত হয়। আমাদের দৌড়তো এমন এক বিশ্বাসের আওতাভুক্ত যে, বাস্তব জীবনের নিরীক্ষে প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিফলন ঘটাতে আমরা কিন্তু সংকল্পবদ্ধ। যখন আমরা বিশ্বাসীবর্গের বা প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র প্রার্থনাটি আবৃত্তি করি তখন দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করি-পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী, সিদ্ধগণের সমবায়, পাপের ক্ষমা, শরীরের পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা খিস্টের ঐশ জনগণ হয়ে আমাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, কাজকর্ম সবকিছুর মধ্যে একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য যেন সর্বদা ফুটে উঠে। খ্রিস্টভক্তদের উদ্দেশ্য করে একবার মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, "আমি খ্রিস্টানধর্ম ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি কিন্তু খ্রিস্টানদেরকে ঘৃণা করি।" এ উক্তিতে অবশ্য তিনি খ্রিস্টানদের প্রতি হেয় বীতশ্রদ্ধভাব দেখালেন কেন এ নিয়ে হয়তো আমাদের আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এটুকুই বলা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রভু-বিশ্বাস ও দীক্ষা সব এক করে দেখলে মণ্ডলীর স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসীবর্গের প্রার্থনাটি অর্থবহ হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

যিশু মৃত্যুকে জয় করে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়ে বিভিন্ন বিশ্বাসীগণকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" যিশুর বারো শিষ্যের মধ্যে পুনরুত্থিত যিশুকে দেখার যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তারই একটি দৃষ্টান্ত; অন্য সব শিষ্যগণ পুনরুত্থিত যিশুর অনির্বচনীয় শান্তির বাণী শুনে মোহিত হলেও থোমা নামে শিষ্যটি সে সময়ে অনুপস্থিত থাকার কারণে যিশুকে স্বচক্ষে না দেখা ও স্পর্শ করা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলেন না। তাই প্রায় সপ্তাখানেক পরে যিশু স্বয়ং উপস্থিত হয়ে থোমার বিশ্বাস বৃদ্ধিতে তাঁর ক্ষত স্থানে অঙ্গুলি স্পর্শ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। থোমা তখন বললেন, "প্রভু আমার ঈশ্বর আমার।" যিশু তাঁকে বললেন, "থোমা, তুমি কি আমাকে দেখেছ বলে বিশ্বাস করছ? যারা না দেখে বিশ্বাস করে তারা ধন্য।" *(যোহন ২০:২৮-২৯)* আমাদের বিশ্বাস আজ যিশুর ক্ষত স্থানে স্পর্শ করে নয় বরং না দেখে খ্রিস্টের উপস্থিতি আমাদের জীবনের উপলব্ধি থেকেই গড়ে উঠেছে। আমাদের অন্তরে বিশ্বাসের যে বীজ বপন করা হয়েছে আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বৎসর পূর্বে সেই বিশ্বাসের যাত্রা চলছে অবিরত পরিপূর্ণতা লাভের প্রত্যাশায়। প্রেরিত শিষ্যগণ যিশুর পুনরুত্থানের সম্বন্ধে মহাশক্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, "আমরা যা দেখেছি আর শুনেছি তা না বলে থাকতে পারি না।" *(প্রেরিত ৪:২০, ৩৩)* প্রভু যিশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।

প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শিষ্যদের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায়, তা বিশ্বাসের দৃষ্টিতে যথেষ্ট কঠিন মনে হলেও আধ্যাত্মিকভাবে এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, শিষ্যদের সাক্ষ্য সত্যেরই প্রকাশ ঘটেছিল সে যুগে। আর যিশুও শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের দেওয়া এ সুখবর পৃথিবীর সবস্থানে প্রচার করে। যে কেউ তাদের এ সুখবর বিশ্বাস করে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে সে-ই পাপ থেকে উদ্ধার পাবে; কিন্তু যে বিশ্বাস করে না ঈশ্বর তাকে দোষী বলে স্থির করে শাস্তি দেবেন। *(মার্ক ১৬: ১৫-১৬)* যিশু খ্রিস্ট যতদিন শিষ্যদের মাঝে ছিলেন তাদের বিভিন্ন উপমাকাহিনী এবং নিজ মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ও স্পষ্টভাবে তাদের জ্ঞানের চক্ষু খুলে দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে জগতে এসেছিলেন এবং এমন সাক্ষ্য জগতে রেখে গিয়েছেন যা পরবর্তী বিশ্বাসীগণের অর্থাৎ আমাদের নিকট তিনি চিরদিনের জন্য জীবিত আছেন। ঈশ্বর যেমন জীবন্ত ঈশ্বর তেমনি যিশুও জীবন্ত প্রভু। তিনি জীবনের প্রভু।

যিশুর পুনরুত্থানের পূর্ণ প্রমাণ হলো বিশ্বাসীদের কাছে তাঁর সাক্ষাৎ। শিষ্যেরা জীবিত যিশুকে দেখেছেন। এটিই হলো সুসমাচারে পুনরুত্থানের আসল সাক্ষ্য। শিষ্যেরা প্রথমে যিশুর পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু যে মুহূর্তে যিশু তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সেই মুহূর্তে তাদের সমস্ত সন্দেহ মুছে যায় এবং তারা যিশুতে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে অন্যদের কাছে তাঁর পুনরুত্থানের সুখবর ঘোষণা করতে আরম্ভ করেন। পুনরুত্থিত যিশুতে তাদের প্রথম অবিশ্বাস প্রমাণ করে যে, তারা জীবিত যিশুর সাক্ষাতে এমন নতুন কিছু লাভ করেছিল যা তাদের জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনে। তাঁকে জীবিত দেখে তারা তাঁর জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেন আর প্রমাণ পান যে, ঈশ্বর যিশুর দ্বারা তাঁর মুক্তির পরিকল্পনা পূর্ণ করেন। এখন শিষ্যেরা প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে সকলের কাছে তাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেন। নাজারেথের যিশুকে ঈশ্বর প্রভু ও মশীহ, এ দুই-ই করেছেন *(প্রেরিত ২:৩৬)*।

আমরা যারা হৃদয়ে উপলব্ধি করে এবং বিশ্বাস নিয়ে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করে যাচ্ছি এখন যিশুর সুখবর আমাদের জীবনে প্রকৃত ও পূর্ণ আনন্দের ঢেউ বয়ে দিচ্ছে। কেননা পুনরুত্থিত যিশুর সুসংবাদ আমাদের মনে প্রাণে বিশ্বাসের যে যাত্রা চলছে তা অক্ষুণ্ন রেখে যিশুর শিষ্যদের মত উচ্চকণ্ঠে আমরা বলতে পারি, যে বিশ্বাসে আমরা নিজেদের আবদ্ধ করেছি তা থেকে কেউ আমাদের আর বিচ্ছিন্ন করতে বা দূরে ঠেলে দিতে পারবে না।

পরিশেষে বলতে হয়, আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে বিশ্বাসের যাত্রায় যে আশাপূর্ণ আনন্দ ও শান্তি আমাদের জীবনকে ঘিরে রেখেছে, সেই মনোভাব নিয়েই যেন গৌরবময় প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী ও সাক্ষ্য রেখে সকলের কাছে আদর্শ স্বরূপ হতে পারি। তৎসঙ্গে প্রভু যিশুর অমৃতময় বাণীর আলোকে জীবন যাপন করতে পারি। যিশু বলেছেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ আমার উপরে বিশ্বাস করে তবে আমি যেসব কাজ করি সেও তা করবে। আর আমি পিতার কাছে যাচ্ছি বলে সে এ সবের চেয়েও আরও বড় বড় কাজ করবে। তোমরা আমার কাছে যা কিছু চাইবে তা আমি করব, যেন পিতার মহিমা পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ❑

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান এবং খ্রিস্ট ধর্মের চূড়ান্ত বিশ্বাস

যোসেফ শ্যামল গমেজ

ভূমিকা: যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান খ্রিস্ট ধর্মের মূল ভিত্তি। কারণ পুনরুত্থানকে ঘিরেই খ্রিস্ট ধর্ম বিশ্বাস এবং অনন্ত জীবনের আশা সঞ্চারিত হয়। এটি খ্রিস্টের ঈশ্বরত্বের চূড়ান্ত স্বীকৃতি, প্রাচীন ভবিষ্যৎবাণীর পরিপূর্ণতা এবং খ্রিস্ট বিশ্বাসের ভিত্তি। যিশুর পুনরুত্থানের মহিমায় উদ্ভাসিত বিশ্বাসীগণ মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের আদর্শ অনুসরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং এর মধ্য দিয়ে খ্রিস্টধর্মের বিকাশ, স্থায়িত্ব ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইতিহাস বলে বিশ্ব জুড়ে স্বয়ংবাদী এবং বিশ্বাসীরা একইভাবে এই ঘটনাটি পরীক্ষা করেছে। এর রূপান্তরকারী শক্তি অগণিত মানুষের জীবনে সান্ত্বনা ও আশার সঞ্চার করেছে। পবিত্র বাইবেলের বিবরণ, ঐতিহাসিক প্রমাণাদি, ধর্মতাত্ত্বিক তাৎপর্য অনুধাবন এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুশীলনে আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থানের প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি।

পবিত্র বাইবেল অনুযায়ী পুনরুত্থান: পবিত্র বাইবেলের চারটি সুসমাচার যথাক্রমে মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের লেখাতে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। প্রত্যেকটি সুসমাচারে বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে যে মারীয়া ও অন্যান্য নারীরা খুব ভোরে যিশুর সমাধিতে যান। সেখানে গিয়ে সমাধির পাথরখানা সরানো অবস্থায় দেখতে পান এবং দু'জন স্বর্গদূত তাদের বললেন, তোমরা মৃতদের মধ্যে জীবিতকে খোঁজ করছো কেন? তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন।

পুনরুত্থানের পর যিশু দেখা দেন: পুনরুত্থিত যিশু মেরী ম্যাগডেলিন এর সাথে দেখা দেন এবং তাকে সান্ত্বনা দেন *(যোহন ২০:১১-১৮)*। তিনি দুই শিষ্যের সাথে এম্মাউসের রাস্তায় হাঁটেন। শাস্ত্রের বাণী শুনে ও রুটি ভাজার অনুষ্ঠান করে তারা যিশুকে চিনতে পারেন *(লুক ২৪:১৩-৩৫)*। তিনি শিষ্যদের কাছে দেখা দেন এবং শিমোন পিতরকে তার ক্ষত স্থান দেখিয়ে আঙ্গুল দিয়ে বিশ্বাস করতে বলে শারীরিক পুনরুত্থান প্রমাণ করেন *(লুক ২৪:৩৬-৪৩)*। তিনি শিষ্যদের কাছে গালীল সাগরে দেখা দেন *(যোহন ২১)*। তিনি ৫০০ জনের অধিক লোকের কাছে দেখা দেন এবং ছোট একটি অভ্যন্তরীণ বৃত্তের বাইরে তার পুনরুত্থান নিশ্চিত করেন *(১ম করিন্থিয় ১৫:০৬)*।

যিশুর পুনরুত্থান এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ: সংশয়বাদিদের দাবি সত্ত্বেও যিশুর পুনরুত্থান প্রাচীন ইতিহাসে নথিভুক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে একটি। নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক কারণ যিশুর পুনরুত্থানের বিশ্বাসকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলে:

শিষ্যদের রূপান্তর: পুনরুত্থানের পূর্বে শিষ্যেরা যথেষ্ট ভীত ছিল এবং পরস্পর লুকিয়ে ছিল। যিশুর পুনরুত্থানের পর তারা সাহসের সাথে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রচার করেছিল, এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার জন্যও প্রস্তুত ছিল। পিতর যিনি যিশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন-যিশুর পুনরুত্থানের পর সেই শিষ্যই একজন নির্ভিক প্রচারক হয়েছিলেন। প্রেরিত ২:২৩ এ ঘোষণা করেছিলেন "ঈশ্বর যিশুকে জীবিত করেছেন এবং আমরা সবাই এর স্বাক্ষী"।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস ও বৃদ্ধি: পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্টের খবরকে কেন্দ্র করে নিপীড়ন সত্ত্বেও খ্রিস্টধর্ম দ্রুত বিস্তার লাভ করে। প্রেরিত ০৪:৩৩। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট বিশ্বাস এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, প্রাথমিক খ্রিস্টানগণ তাদের বিশ্বাস অস্বীকার করার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মুখোমুখি হতে দ্বিধা করে। তার্সাসের পল, খ্রিস্টানদের জন্য যিনি ছিলেন একজন অত্যাচারী নেতা। দামেস্কের পথে পুনরুত্থিত যিশুর দেখা পেয়ে তার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছিলেন *(প্রেরিত: ৯)*। পরিবর্তনকারী এই অত্যাচারী নেতা তার লেখায় *(১ম করি ১৫:০৩-০৮)* পুনরুত্থানের প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রদান করেন যা ঘটনার কয়েক দশকের মধ্যেই লেখা হয়।

শূন্য সমাধিকে অস্বীকার করতে ব্যর্থ হওয়া: অনেক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইহুদী নেতৃবৃন্দসহ রোমান কর্তৃপক্ষ পুনররুত্থিত যিশুর দেহ খুঁজে বের করতে পারেনি। শিষ্যেরা যিশুর মরদেহ চুরি করেছে এমন দাবিটি ঐতিহাসিকভাবেই ছিল অসম্ভব। কারণ শিষ্যেরা একদিকে যেমন ছিলেন ভীত অন্যদিকে তাদের ছিল না প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা।

পুনরুত্থানের ধর্মতাত্ত্বিক তাৎপর্য: যিশুর পুনরুত্থান ইতিহাসে শুধুমাত্র একটি ঘটনা মাত্র নয়। পুনরুত্থান ব্যতিত খ্রিস্ট বিশ্বাস অপরিপূর্ণ। ১ম করিন্থীয় ১৫:১৭ পদে বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে,"তুমি যদি খ্রিস্টে পুনরুত্থিত না হয়ে থাকো তবে বৃথাই তোমার বিশ্বাস, তুমি এখনো তোমার পাপের মধ্যেই আছো"।

পাপ এবং মৃত্যুকে জয়: পুনরুত্থান পাপের উপর খ্রিস্টের বিজয় প্রদর্শন করে *(রোমীয় ৬:০৯-১০)*। যিশুর পুনরুত্থান খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের অনন্ত জীবনের যোগ্য করে তোলে। "যেহেতু আমি বেঁচে আছি, তোমরাও বাঁচবে" *(যোহন ১৪:১৯)*।

যিশুর ঈশ্বরত্বের নিশ্চিতকরণ: বন্ধু যিশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। রোমীয় ০১:০৪। যিশুর পুনরুত্থান পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যৎবাণীগুলোকে পূর্ণ করে। গীতসংহিতা ১৬:১০, ইশাইয়া ৫৩:১০-১২। যিশুর পুনরুত্থান নতুন সৃষ্টির সূচনাকে চিহ্নিত করে *(২য় করিন্থীয় ০৫:১৭)*।

পুনরুত্থান এবং খ্রিস্টধর্মের চূড়ান্ত বিশ্বাস: যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস হল খ্রিস্টীয় পরিচয়ের মূল ভিত্তি। খ্রিস্টীয় মতবাদের প্রতিটি দিক যথ াক্রমে পরিত্রাণ, পবিত্রকরণ এবং অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি যিশুর পুনরুত্থানের উপর নির্ভর করে।

পরিত্রাণে পুনরুত্থানের ভূমিকা: যদি তুমি নিজ মুখে ঘোষণা কর যিশুই প্রভু এবং তোমার হৃদয়ে বিশ্বাস রাখো যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থান করেছেন, তবে তুমি রক্ষা পাবে *(রোমীয় ১০:০৯)*। পুনরুত্থান খ্রিস্ট বিশ্বাসীর ন্যায্যতা নির্দেশ করে *(রোমীয় ০৪:২৫)*।

পুনরুত্থান খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবন যাপনের ভিত্তি: পল খ্রিস্ট বিশ্বাসীদেরকে পুনরুত্থানের শক্তিতে বাস করার পরামর্শ দেন *(ফিলিপ্পীয়: ০৩:১০)*। পুনরুত্থান খ্রিস্টানদেরকে পবিত্রতা এবং রূপান্তরিত জীবনের আহ্বান জানায়। *(কলসীয় ০৩:০১-০৪)*।

পুনরুত্থান এবং দ্বিতীয় আগমন: পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। *(প্রেরিত ০১:১১)*। পুনরুত্থান খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের গৌরবের একটি পূর্বাভাস।

পুনরুত্থানের আলোতে বসবাস: পুনরুত্থান শুধুমাত্র ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ নয় বরং কর্মের আহ্বান। যারা পুনরুত্থিত খ্রিস্টে বিশ্বাস করে তারা প্রকৃত খ্রিস্টান কারণ তারা তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে এবং মৃত্যুর উপর তাঁর বিজয়ে বিশ্বাস করে। তাদের প্রায়শই বিশ্বাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে কারণ তারা তাদের পরিত্রাণের ভিত্তি হিসেবে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানে তাদের বিশ্বাস স্থাপন করে।

উপসংহার: যিশু খ্রিস্টের পূনরুত্থান খ্রিস্টীয় জীবনের বিশ্বাসের ভিত্তি। যা ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তাঁর প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য বেঁচে থাকার আশার উৎস। পুনরুত্থান ছাড়া খ্রিস্ট ধর্ম অসম্পূর্ণ, কারণ এর সাথে খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা অনন্ত জীবনের আশায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়। ব্যক্তি হিসেবে আমরা যখন পুনরুত্থানের চিন্তা করি তখন আমাদের খ্রিস্টের কথাগুলি মনে করিয়ে দেয়, "আমিই পুনরুত্থান এবং জীবন। যে আমাকে বিশ্বাস করে সে মরে গেলেও বেঁচে থাকবে: এবং যে আমার উপর বিশ্বাস করে বেঁচে থাকে সে কখনো মরবে না" *(যোহন ১১:২৫-২৬)*। এই সত্য আমাদের সকলের জীবনে আশার আলো হয়ে প্রজ্বলিত হোক এবং আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হোক।

জয় মৃত্যুঞ্জয়। ❑

ঐশধামে যাত্রা

স্বর্গীয়া মার্গারেট পেরেরা
জন্ম: ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া

স্বর্গীয় যোসেফ গমেজ
জন্ম: ১৬ মার্চ, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া

মা ও বাবা/দাদু ও বড়মা,

তোমরা ছিলে, তোমরা আছ, তোমরা থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে তোমরা হারিয়ে যাওনি আর যাবেও না কোনদিন। তোমাদের শিক্ষা, আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমাদের অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন চলার মাঝে। একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা তোমাদের ভুলিনি, ভুলবোনা কোনদিন। তোমাদের স্মৃতি চির ভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। তোমাদের হারিয়ে আমরা বড় নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছি। তবে সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে তোমরা পরম পিতার ভালোবাসার আশ্রয়ে রয়েছ।

দেখতে দেখতে কতটি বছর পার হয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। ইতোমধ্যে কত কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তোমাদের সংসারে নতুন নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। নাতি-নাতনিদের দেখে গেলেও তোমরা পুতি ও পুতিনদের দেখে যেতে পারনি। তোমাদের এখন ৫জন পুতিন ও ৪ জন পুতি হয়েছে। তোমাদের আদর, ভালোবাসা থেকে ওরা বঞ্চিত। অন্যদিকে বড়ছেলে খ্রীষ্টফার সমীর ও মেয়ের জামাই মন্টু বেঞ্জামিন তোমাদের মত পরম পিতার আশ্রয়ে স্থান নিয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে যোসেফ ও মার্গারেট খুবই সহজ, সরল, বিনয়ী, কষ্ট সহিষ্ণু, ঈশ্বর নির্ভরশীল ও উদার মনের মানুষ ছিলেন। দু'জনেই সেনা সংঘের সদস্য/সদস্যা ছিলেন। উভয়েই নিয়মিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও একাধিকবার রোজারী মালা প্রার্থনা এবং পরিবার পরিদর্শন করতেন। যদিও নিজেরা তেমন লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, তথাপি সন্তানদের সর্বদাই লেখাপড়ায় অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখে যেতেও পেরেছেন। আমরা আনন্দিত ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ যে তোমাদের মেঝো ছেলে, **ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ গত বছর মে মাসে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছেন।**

স্বর্গধাম থেকে তোমরা আমাদের আশীর্বাদ করো যেন শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমাদের দেখানো পথে আমরা সর্বদা চলতে পারি। প্রেমময় পিতা ঈশ্বর তোমাদের আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি দান করুন।

তোমাদেরই আদরের

মেয়ে-মেয়ে জামাই: লিলি-প্রয়াত মন্টু
ছেলে-ছেলে বৌ: প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর-সবিতা, বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, অমল-অনিমা
নাতি-নাতনি: শংকর-নিপা, সাগর-রিবিকা, সজল-বীথি, সুজন-সিলভিয়া, শৈবাল-ফাল্গুনী, বৃষ্টি-মামুন, অনিক, অমিত, অর্ণব
পুতি-পুতিন: সুজানা, সায়ানা, সামারা, সৃজন, শুভ, দুরন্ত, দুর্জয়, আরিয়া, আয়ান

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

একাদশ তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত সিলভেস্টার গমেজ

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

গোপাল মাদ্বর বাড়ি
গ্রাম: নতুন তুইতাল
থানা: নবাবগঞ্জ
জেলা: ঢাকা।

প্রিয় পাপা/দাদা/নানু,

ব্যস্ত পৃথিবীতে সময়টা খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ১১ বছর পেরিয়ে গেল, তুমি আমাদের মাঝে নেই। কোথায় যেন একটা শূন্যতা সব সময়ই অনুভব করি। তুমি কাছে থাকলে জীবন চলার পথটা হয়তো আরো সহজ হতো। তোমার কথা সময় সময় শুনিনি বলে তুমি কখনো কখনো রাগও করতে। তারপরও মনে হয় মাঝে মাঝে কিছু বিষয়, কিছু সিদ্ধান্ত তোমায় জানানোর খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের সর্বদা আশীর্বাদ করছো, যেন আমরা সঠিক পথে চলতে পারি। আমরা তোমার জন্য প্রার্থনা করি তুমি যেন চির শান্তিতে থাকতে পার। তোমার পাওয়ার বা দেওয়ার কিছু না থাকলেও আমাদের চোখে চোখে রেখ, এই কামনা করি।

"You were like sunrays,
every morning I wished
to have your rays to start my every day!
They say..........
I was the son of my dad,
I was so because of my dad
who corrected, guided, protected me
every second, every moment, every day- like sunrays!
Now, I take your memories
your attitude and
your selflessness to walk my way!
I'm sad that you're no more here,
but deep down I know
you're still protecting, guiding
and cheering my every step,
every second, every moment, everyday- like sunrays"

শোকাহত -

স্ত্রী: মনিকা গমেজ
বড় মেয়ে ও পরিবার: লিলি, প্রভাত, গ্লেস
ছোট মেয়ে ও পরিবার: বেবী, জন, গ্রেস, তীর্থ ও অর্ঘ্য
বড় ছেলে ও পরিবার: ডঃ জেম্‌স, উপাসনা, ফ্র্যাঙ্কলিন
ছোট ছেলে ও পরিবার: রিচার্ড, সন্ধ্যা, ধ্রুব, সৃষ্টি

৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

জন্ম : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫ (পুণ্য শনিবার)
পিতা : প্রয়াত জেরোম সরকার
মাতা : প্রয়াত মারীয়া সরকার
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী, ঢাকা।

The Prayer I say the Every Other day

By Hubert Francis Sarkar

Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong
Where in deep silence I may make my deep-breathed utterances
Where my feelings grow evermore strong
Whilst my alter-ego's disparate gaze, forage and embrace most
wistfully I long.
Yes, Sir I long for her opulent smile,
The smile without any trace of guile.
Yes, I cherish to be detained in her little prison,
The little prison where in cordial detainment
I can read my own profile.
Sir, you call us all to your own grotesque colosseum.
In great befuddlement, we rather are stuck in the marathon
business of a workaholic an idler.
We fail to aspire to obviate the thrust-on mandate, fairness and decorum.
Just bustling with trifle details, our time hums.
Sir, the prayer I say the every other day is simply this one
whereby I try to reach my un-spectacular world,
my divine arbiter, my own Joan.
Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong.
Here, with a thousand others I try to touch your sampan.

(প্রকাশনা: ম্যাগাজিন সেকশন, দ্য ডেইলী ষ্টার, নভেম্বর ২৭, ১৯৯২)

সকল কল্যাণকামী মানুষের কাছে আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মার মঙ্গল ও চির শান্তি কামনা করে প্রার্থনার অনুরোধ জানাচ্ছি। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।
জন (বড়ভাই) + বেবী (বৌদি) : মারীয়া, হিউবার্ট ও টিমথি
ফিলিপ (মেঝভাই) + জয়া (বৌদি) : এলেন ও এঞ্জেলা
মালা (বোন) + মিঠু (ভগ্নিপতি) : আর্থার।

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

Wishing you all a very

Happy Easter

Martin Gonsalves, RCIC-IRB
Founder & CEO, MG Immigration

MG Immigration is led by Registered Canadian Immigration Lawyer-Martin Gonsalves. We provide expert guidance on all immigration streams including Visit Visa, Student Visa, Work Permit, Sponsorship, Business Migration in Canada, USA, Uk, Australia, New Zealand and Schengen countries.

Please contact us for all your immigration needs:
WhatsApp: +16475516424, +8801762107005
Email: Martin@mg-immigration.com, mgimm.ca@gmail.com

MG Immigration

Office address- MK Center,
House # 27, Road # 14,
Block- G, Niketan, Gulshan 1,
Dhaka-1212

RCIC-IRB
Regulated Canadian Immigration Consultant

শতবর্ষের জুবিলী উৎসব : বাইবেলীয় ও মাণ্ডলিক অনুধ্যান

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

বর্তমান জগতে জুবিলী একটি অতি পরিচিত ও সমাদৃত উৎসব। যদিও এটি একটি বাইবেলীয় উৎসব, এর ব্যপ্তি, পরিধি ও পদচারণা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্রভৃতি সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। এর মাহাত্ম্য এতো গভীর যে এর উদ্‌যাপন-আয়োজন সর্বসাধারণকে একই ছাতার নিচে জড়ো করতে সক্ষম।

যাই-হোক, খ্রিস্টমণ্ডলী ইতিহাস পরিক্রমায় জুবিলীর উৎসব আয়োজনে অনেক বেশী মানবীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনা ধারণ করে থাকে। খ্রিস্টের অনুসারীদের আত্মমূল্যায়ন, মন-পরিবর্তন, ক্ষমা নেয়া-দেয়া, ঈশ্বর ও একে অন্যকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এক মোক্ষম মুহূর্ত হিসাবে এই সময়টি বিবেচিত হয়। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই খ্রিস্টমণ্ডলী মূলত ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষকে জুবিলী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে- যার মূলভাব হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে: 'আশার তীর্থযাত্রী'। এই লেখার উদ্দেশ্য মূলভাব বিষয়ে আলোচনা নয়, বরং এর দীর্ঘ ইতিহাস, বাইবেলীয় ও মাণ্ডলিক ঐতিহাসিক ভিত্তি তুলে ধরার প্রয়াস।

জুবিলী কি? পবিত্র বাইবেলের প্রাক্তনসন্ধির লেবীয় পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে বাইবেলীয় জুবিলীর সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা দেয়া হয়েছে। জুবিলী শব্দটি এসেছে মূলত হিব্রু 'ইয়বেল' (yobel)- যার অর্থ হচ্ছে 'পুরুষ ভেড়া'। এটি এখানে সাংকেতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভেড়ার শিঙের বাঁশি ব্যবহার করে কোন আনন্দ উৎসবের ঘোষণা দেয়া হতো, "ভেড়ার শিঙ দিয়ে তৈরী সাতটি তুরি বইতে বইতে সেই সাতজন যাজক প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলছিল, চলতে চলতে তারা তুরি বাজাচ্ছিল; ইতোমধ্যে পুরোভাগের সেনাদল প্রভুর মঞ্জুষার পিছু পিছু চলছিল; তুরিধ্বনির সাথে সাথে সকলে এগিয়ে চলছিল" *(যোশুয়া ৬:১৩)*। সুতরাং বুৎপত্তিগতভাবে জুবিলী শব্দটির অর্থ হচ্ছে হর্ষধ্বনি বা উৎসব করা। সত্তরী বাইবেলে 'ইয়বেল' (yobel) শব্দটি গ্রীকভাষায় অনুবাদ করেছে 'আফেসিস'- যার অর্থ হচ্ছে 'প্রত্যাবর্তন বা গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে ফিরিয়ে দেয়া'। মূলত এই 'ইয়বেল' (yobel)- শব্দ থেকেই এসেছে ল্যাটিন Jubilare এবং ইংরেজী Jubilation.

লক্ষ্যণীয় যে, পবিত্র বাইবেল ছাড়াও জুবিলীর ধারনাটি মিশরীয়, আক্কাডিয়ান, ফিনোসিয়ানদের মধ্যেও বর্তমান ছিল। প্রাচীন সভ্যতার এই সমাজগুলোতেও জুবিলীর মূল বিষয় ছিল 'মুক্তি'।

প্রাক্তনসন্ধিতে জুবিলী: পুরাতন নিয়মে 'জুবিলী বছর'-এর সাথে সাব্বাথ বা বিশ্রামবার ও সপ্তম বছর বা সাব্বাটিক্যাল বছরটিও যুক্ত। মোশীর বিধান অনুসারে সপ্তম দিনকে সাব্বাথ বা বিশ্রামবার হিসাবে গণ্য করা হয়, "তুমি ছ'দিন তোমার কর্ম করে যাবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করবে, যেন তোমার বলদ ও গাধা বিশ্রাম পায়, এবং তোমার দাসীর সন্তানেরা ও প্রবাসী মানুষও প্রাণ জুড়ায়" *(যাত্রা ২৩:১৩)*। একইভাবে, সপ্তম বছর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তুমি তোমার জমিতে ছ'বছর ধরে বীজ বুনবে ও তার উৎপন্ন ফসল সংগ্রহ করবে। কিন্তু সপ্তম বছরে জমিকে বিশ্রাম দেবে, এমনি ফেলে রাখবে; এভাবে তোমার স্বজাতীয় নিঃস্ব মানুষেরা খেতে পারবে, আর তারা যা বাকি রাখবে, তা বন্যজন্তু খাবে। তোমার আঙুর খেত ও জলপাই বাগানের বেলায়ও তেমনি করবে" *(যাত্রা ২৩:১০-১১)*। অন্যদিকে, ২য় বিবরণ ১৫:১-১৮ পদে বলা হয়েছে যে, সপ্তম বছরটি হবে 'মুক্তির বছর'- উভয়ই যারা তোমার কাছে ঋণী ও দাস-দাসী।

জুবিলী বছর মূলত সপ্তম বছর বা সাব্বাটিক্যাল বছরের ধারাই অনুসরণ করা হয়েছে। সে অনুসারে দেখা যায় যে, লেবীয় ২৫:২-৭ পদে সপ্তম বছর বা সাব্বাটিক্যাল বছর সম্পর্কে পুনরায় বলা হয়েছে এবং *লেবীয় ২৫:৮-৫৫* পদে জুবিলী বছর বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। জুবিলী বছরটিকে পবিত্র ও মুক্তির বছর হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমরা পঞ্চাশত্তম বছরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করবে, এবং সারা দেশ জুড়ে দেশের সমস্ত অধিবাসীর জন্য মুক্তি ঘোষণা করবে; তোমার পক্ষে সেই বছর জুবিলী বলে গণ্য হবে; তোমরা প্রত্যেকে যে যার অধিকারে ফিরে যাবে, ও প্রত্যেকে যে যার গোত্রের কাছে ফিরে যাবে। তোমাদের জন্য পঞ্চাশত্তম বছর জুবিলী হবে; তোমরা বীজ বুনবে না, স্বতঃউৎপন্ন ফলস কাটবে না, ছেঁটে না দেওয়া আঙুরলতার ফল সংগ্রহ করবে না" (লেবীয় ২৫:১০-১১)। তাহলে, দেখা যাচ্ছে যে, জুবিলী বছর পালন সংক্রান্ত কতগুলো নির্দেশনা এখানে উঠে এসেছে: ১. এটি হচ্ছে দায়মুক্তির সময়, সকল অধিবাসী প্রত্যেকে নিজ নিজ পৈতৃক ভূমিতে ফিরে যাবে; দাসত্ব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে; ২. সেই বছর জমিতে কোন বীজ বুনবে না, কোন ফসলও তুলবে না; ৩. ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও সম্ভ্রম নবায়ন করবে; ৪. ন্যায়সঙ্গভাবে প্রতিবেশিকে জমি ফিরিয়ে দেবে; ৫. একে অন্যের পাশে দাঁড়াবে এবং অভাবীদের সাহায্য করবে; ৬. এটি হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত দিবস- নিজ ও সমাজের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে; ৭. সর্বোপরি, এটি হবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার বছর; ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানাবে।

আসলে, পুরাতন নিয়মে বর্ণিত জুবিলী বছর প্রধানত তৎকালীন ইহুদীজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্দোবস্তকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা হয় যে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এর স্বার্থ রক্ষাই ছিল জুবিলীর প্রাণ। এর প্রধান বিষয় দুটি: ১. পরিবার ও ২. ভূমি। অর্থাৎ ইহুদীদের জ্ঞাতিত্ব বা আত্মীয়তা সমাজ ব্যবস্থা ও ভূমির স্বত্ব বা অধিকার- এই দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি গড়ে উঠেছে প্রাক্তনসন্ধির জুবিলীর বিধি ব্যবস্থা।

১. ইহুদীজাতির জ্ঞাতিত্ব বা আত্মীয়তার সমাজব্যবস্থা: ইহুদীদের জ্ঞাতিত্ব সমাজ ব্যবস্থায় তিনটি পর্যায় রয়েছে- যা গিদিয়োনের এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, "দেখ, মানাসের মধ্যে আমার গোত্রই তো সবচেয়ে দুর্বল, আর আমার পিতার বাড়িতে আমি সবচেয়ে নগণ্য" *(বিচারক ৬:১৫; দ্র. ২১:২৪)*। এখানে মানাসে হলো পুরো গোষ্ঠী ও তাদের জন্য বিভক্ত ভূমি (tribe); সেই গোষ্ঠীর একটি জ্ঞাতি-সমাজ বা গোত্র থেকে গিদিয়োন এসেছে (clan) এবং তার আপন পরিবারের কথা বলা হয়েছে। জুবিলীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই তিনটির মধ্যে ক্ষুদ্রতম সত্তা অর্থাৎ পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা।

২. ইহুদীদের ভূমির স্বত্ব: ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সহায়তায় যখন ইহুদীজাতি প্রতিশ্রুত ভূমি লাভ করেন, তখন তা গোত্রসমূহের সংখ্যানুপাতে তা ভাগ করে হয় *(গণনা ৩৩:৫৪)*। অন্যদিকে, ভূমি কোনভাবে একটি বানিজ্যিক সম্পদ হিসাবে হস্তান্তর বা বিক্রি করা যাবে না (*দ্র. ১রাজা ২১-* আহাব ও নাবোদের কাহিনী)। ভূমির প্রকৃত মালিক হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর, "ভূমি চিরকালের জন্য বিক্রি করা যাবে না, কেননা ভূমি আমারই; আর তোমরা

আমার কাছে বিদেশী ও কিছুদিনের বাসিন্দার মতো” *(লেবীয় ২৫:২৩)*। ঈশ্বরের এই নির্দেশই মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে জুবিলী ধারণাকে যুক্ত করেছে।

প্রাক্তনসন্ধির প্রাবক্তিকগ্রন্থে জুবিলী: জুবিলীর প্রধান উপাদ্য বিষয়- ‘স্বাধীনতা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা’- পরবর্তী গ্রন্থসমূহে বিশেষভাবে প্রাবক্তিকগ্রন্থে এগুলোকে আরো জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়। প্রবক্তা ইসাইয়ার দ্বিতীয় গ্রন্থ ৪২:১-৭ পদে নির্বাসিত ইহুদীজাতির জন্য ঈশ্বরের পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা এবং দুর্বল ও নির্যাতিতের মুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়, “অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য, এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের ও যারা অন্ধকারে বাস করে, কারাকুয়ো থেকে তাদের বের করে আনার জন্য ” *(ইসা ৪২:৭)*। জুবিলীর প্রতিচ্ছবি আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে ইসাইয়ার ৬১ অধ্যায়ে। এখানে একজন অভিষিক্তজনের কথা বলা হয়েছে যিনি ঈশ্বরের হয়ে দরিদ্র মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করবেন,

“প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত

কেননা প্রভুই আমাকে অভিষিক্ত করেছেন।...

প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ,

আমাদের পরমেশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করতে,

শোকার্ত সকল মানুষকে সান্ত্বনা দিতে, *(ইসা ৬১:১-২)*।

অন্যদিকে, প্রবক্তা দানিয়েল তার প্রত্যাদেশ দর্শনে শেষ সময়ের মসীহের দেখা পান। প্রভু পরমেশ্বরের মসীহের যুগের কথা বলেন যা মাত্র সত্তর সপ্তাহ পরে উদ্বোধন করা হবে,

তোমরা জাতির ও তোমার পবিত্র নগরীর পক্ষে

অধর্মের শেষ দশা ঘটাবার জন্য,

পাপ মুছে দেবার জন্য,

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য,

চিরস্থায়ী ধর্মময়তা আনবার জন্য,

দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে সপ্রমাণ করার জন্য,

ও মহাপবিত্রজনকে অভিষিক্ত করার জন্য,

সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হয়েছে *(দানি ৯:২৪)*।

এভাবে তুর্যধ্বনির মাধ্যমে জুবিলী বছর ঘোষণার সাথে শেষ সময়ের মসীহ যুগের বিষয়টি খুবই চমৎকারভাবে যুক্ত হয়েছে *(ইসা ২৭:১৩; জাখা ৯:৯-১৭)*।

নবসন্ধিতে জুবিলী: যিশু যখন সমাজগৃহে প্রবক্তা ইসাইয়ার ৬১:১-৩ অংশটুকু পাঠ করেন, তখন নিজেকে খুবই জোরালোভাবে প্রতিশ্রুত প্রবক্তা হিসাবে চিহ্নিত করেন, “তখন তিনি তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন, ‘আজই, তোমরা একথা শুনতে শুনতেই, শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করেছে’” *(লুক ৪:২১)*। অন্যদিকে যোহন যীশুর সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য দু’জন শিষ্যকে যিশুর কাছে পাঠিয়েছিলেন, আর যিশু তখন তাদের বলেছিলেন, “তোমরা যা কিছু শুনেছ ও দেখেছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও; অন্ধ দেখতে পায়, খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষ শুচীকৃত হয়, বধির শুনতে পায়, মৃত পুনরুত্থিত হয়, দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়” *(লুক ৭:২২; দ্র. মথি ১১:৫)*। এভাবে যিশু মসীহ হিসাবে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ও তার কাজকে জুবিলী বর্ষের মূলভাবের সাথে যুক্ত করেন। এক কথায় বলা যায় যে, সিনোপটিক মঙ্গলসমাচারের লেখকগণ জুবিলী বর্ষের (মুক্তি) আলোকে যিশুখ্রিস্ট অর্থাৎ মসীহের কর্ম ও সেবাকাজের সারসংক্ষেপে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে, শিষ্যচরিত ১:৬; ৩:২১ পদে, যিশু কর্তৃক ইস্রায়েলজাতি ও জগতের সমস্ত কিছু পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। এভাবে প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তন সন্ধির জুবিলী বর্ষের উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ যিশুর মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে জুবিলী: পবিত্র বাইবেলের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে খ্রিস্টমণ্ডলীতেও জুবিলী বর্ষের রীতি প্রচলন হয়েছে। ইতোমধ্যে এটা আলোচনা করা হলো যে, ইহুদীজাতি ব্যাবিলনে নির্বাসনে যাবার পূর্বে প্রতি পঞ্চাশত্তম বছরটি ছিল জুবিলী বছর বা ঋণ মকুবের বছর *(লেবীয় ২৫:২৫-৫৪)*। ব্যাবিলনের নির্বাসনের অবসান সময় থেকে রোমানদের দ্বারা ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুশালেম ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত ইহুদীরা সপ্তম বছর বা সাবাটিক্যাল বছরে ঋণ মকুবের ঐতিহ্যটি চালু ছিল। পরবর্তীতে খ্রিস্টমণ্ডলীর পোপগণ এই রীতিটি আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণ করে কোন বিশেষ সময়কে জুবিলী বর্ষ বা পুণ্য বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করত। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও পাপের দণ্ডমোচন লক্ষ্যে এই পুণ্য বর্ষের শুরুতে ও শেষে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করত।

পোপ ৮ম বনিফাস প্রথম খ্রিস্টমণ্ডলীতে আনুষ্ঠানিকভাবে জুবিলী বা পবিত্র বর্ষের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসেন। ‘১৩০০ খ্রিস্টাব্দ’কে বিশেষভাবে গুরুত্ব ও অর্থপূর্ণ করার লক্ষ্যে সেই বছরের সাধু পিতরের ধর্মাসনের পর্ব দিন ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি পুণ্য বর্ষ বা জুবিলী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেন। *Antiquorum fida relatio* নামক অনুশাসন পত্রে প্রতি শতবছরকে পবিত্র বা জুবিলী বছর হিসাবে ঘোষণার নির্দেশ দেন। পরবর্তী অন্যান্য পোপগণ জুবিলীর ব্যপ্তি বিভিন্নভাবে নির্ধারণ করেন। যেমন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ২য় পল ২৫ বছরের জুবিলীর প্রবর্তন করেন। আবার বিশেষ উপলক্ষেও খ্রিস্টমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ জুবিলী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন। যেমন, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দকে ‘মুক্তির বার্ষিকী’ হিসাবে উদ্‌যাপন করা হয়। দু’হাজার খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টমণ্ডলীতে মোট ২৮টি সার্বজনীন জুবিলী বর্ষ ঘোষণা ও উদ্‌যাপন করা হয়।

বর্তমান বাস্তবতায় জুবিলী বর্ষ: জুবিলী বা পুণ্য বর্ষ ধারণার মধ্যে সম্মিলিত একটি চেতনা ফুটে উঠেছে। এটি একদিকে যেমন সামাজিক ন্যায্যতা ও মানবীয় অধিকারকে নিশ্চিত করে, অন্যদিকে ঐশসত্তা তথা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয়। এক কথায়, জুবিলী মানবজীবনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র- যেমন: অর্থনীতি, সমাজ ও ধর্ম প্রভৃতি- একই রাখিবন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে: পবিত্র বাইবেলীয় জুবিলী বর্ষের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জমি যাতে সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হয়। অল্প কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে সম্পদ যাতে পুঞ্জিভূত না হয়। এটি ঈশ্বরের জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টির পর ঈশ্বর মানুষকে জগতের সহ-তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োজিত করেছিলেন, মালিক হিসাবে নয় *(আদি ১:২৬; ২:৮)*। কিন্তু বর্তমান জগতে এর উল্টো চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষ নিজেকে জগতের মালিক মনে করে এর সাথে যথেচ্ছা আচরণ করছে। অন্যদিকে কিছু মানুষের হাতে জগতের অধিকাংশ সম্পদ চলে আসায় মানুষে মানুষে বিশাল বৈষম্য বিরাজ করছে। এক্ষেত্রে জুবিলী বছরের আবেদন কোনভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই।

২. সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে: পারিবারিক একক বা গোত্রকে টিকিয়ে রাখার এক অন্যান্য প্রয়াস জুবিলী বর্ষের চেতনা ফুটে উঠেছে। সপ্তম বছরে বা পঞ্চাশত্তম বছরে আপন জাতির মানুষকে মুক্তির দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে যাতে তারা পরিবারে ফিরে যেতে পারে, “তখন সে তার ছেলেদের সঙ্গে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার আপন গোত্রে ফিরে যাবে ও তার আপন পিতৃ-অধিকারে আবার প্রবেশ করবে” *(লেবীয় ২৫:৪১)*। সমাজ জীবনের ক্ষুদ্রতম সত্তাকে

বাকি অংশ ২৭ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

জুবিলীবর্ষঃ পরিবারে আশার তীর্থোৎসব

ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা

এখানে ৪টা শব্দ রয়েছে 'পরিবার' 'আশা' 'জুবিলী' 'তীর্থ'। এই ৪টা শব্দই খুব গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ওজন বিশিষ্ট। পরিবার আছে বলেই জন্ম আছে, জীবন আছে, পরিজন আছে, জনসমাজ আছে। পরিবারই আদি, মৌলিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারকে বলা হয় 'জীবনের কোষ', 'সমাজের কোষ'। এদিকে আশা আছে বলেই বিশ্বাস আছে, ভালোবাসা আছে; আশা আছে বলেই ভরসা আছে- ভবিষ্যৎ আছে, আশা আছে বলেই এগিয়ে চলার প্রেরণা আছে, নতুন শুরু আছে। আশা হলো শক্তি, আশায় মুক্তি, আশা-ই নতুন সৃষ্টি, আশা-ই বেঁচে থাকা। বলা হয় আশাই একমাত্র ভেলা। কবির ভাষায় 'মনে রেখো এই ছোট তিনটি কথা, আশা-প্রেম-বিশ্বাস; আঁধারে জ্যোতির দরশন পাবে; পাবে বল যাবে ত্রাস'। 'জয়ন্তী' আছে তাই জয় আছে, সাফল্য আছে, উৎসব আছে, কৃতজ্ঞতা আছে, মিলন-সহভাগিতা আছে; জয়ন্তী হলো ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা ও দায়মুক্তির সময়। তীর্থ আছে বলেই ভক্ত আছে, বিশ্বাসী আছে, পূজারী আছে, পুণ্যকর্ম আছে, মিলন ও শুদ্ধি আছে; কারণ তীর্থ করা হলো জীবনের নবায়নের প্রতিশ্রুতি। তীর্থ আছে বলেই যাত্রা আছে, গন্তব্য আছে। তীর্থ করা হলো পুণ্যলাভের উত্তম সময়। পোপ ফ্রান্সিস বলেন 'আমরা সবাই আশার তীর্থযাত্রী'। এগুলোর সবকিছুকে একসাথে গুছিয়ে নীচের কথাগুলোর মধ্যে রেখে বলতে চাই:

'আমাদের জন্ম নীড়ে পরিজন পরিসরে,
চলি সবে বিশ্বাসকে ঘিরে, আশাকে ধিরে শিরে;
পুণ্য-শুদ্ধির তীর্থ হউক, এই অন্তপুরে
মোদের হৃদ-মাঝারে, জয় জয়ন্তীর চেতনায় ফিরে'।

মোক্ষম সময়েই হচ্ছে এই জুবিলীবর্ষ, এই তীর্থোৎসব। ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ তীর্থোৎসব উদ্‌যাপন এমন একটা কালের আহ্বান, চেতনার আহ্বান যখন এই কালটায় অনেক চেতনাই মরে গেছে, অনেক কিছুরই চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কারণ বর্তমান কালটা, যুগটা, জগতটা কেমন যেন এক জীর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। তাই জীবনকে জাগাতে হবে, জগতকে জাগাতে হবে, জীর্ণতাকে জ্বালাতে হবে, নিরাশাকে জয় করতে হবে। যা বলছি, বর্তমান যুগটা কেমন যেন এলোমেলো মনে হয়। এই মনে হওয়াটার মধ্যে কারণ হলো, কেন যেন মনেরই মধ্যে বরাবরই একটা অস্বস্তি, অশান্তি, হতাশা নিরাশা কাজ করে। বর্তমানে খুব কম মানুষই পাওয়া যায় যাদের কাছ থেকে আশা আনন্দের এবং সুখ-শান্তির কথা শোনা যায়। কিসের জন্য যেন একটা ক্ষুধা! কোথায় যেন একটা হাহাকার! কিসের যেন একটা অভাব! আমরা যেখানে আছি, যেখানে থাকি, যাদের সাথে আছি, হোক সে একান্ত স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্কে, পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, এর বাইরে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে, মূলত সার্বিক বিচরণ ক্ষেত্রে, সম্পর্ক ও আচরণ সূত্রে রয়েছে এই অতৃপ্তি, অসন্তুষ্টি, ক্ষুধা, ক্ষুব্ধতা, বিরক্তি, বিবর্ণ বিষাদময়, দুশ্চিন্তা ও দুষণময় অবস্থা। রয়েছে একটা হতাশার সুর, নিরাশার সুর।

আমি যেহেতু পরিবার নিয়ে কাজ করি তাই এই জুবিলীবর্ষে পরিবারকে নিয়ে পরিবারকে ঘিরেই পরিবারের মধ্যেই এই তীর্থোৎসবের প্রেক্ষিতটা, প্রয়োজনটা, প্রত্যাশাটা যতদূর সম্ভব আলোচনায় আনতে চেষ্টা করবো। মানুষের জীবনটা সংগ্রামের, এমনি এমনি নয়। কথায় আছে তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশু-পাখী সহজেই পশু-পাখী কিন্তু মানুষ অনেক চেষ্টার ও সংগ্রামের ফলে সে মানুষ। বাস্তবতাকে এড়িয়ে চিন্তা চেতনায় সারা জগত ঘুরে-ফিরে আসলেও দিন শেষে কিন্তু সেই পরিবারেই ঢুকতে হয়। কারণ মূলে যে রয়েছে বন্ধন-বিবাহিত জীবন, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন এবং এরসাথে রয়েছে কর্মজীবন ও ধর্মজীবন। এ জীবনটায় রয়েছে একক ব্যক্তিস্বত্তা, রয়েছে অন্যের সাথে সম্পর্ক, রয়েছে দায়িত্ববোধ, রয়েছে দায়বদ্ধতা, রয়েছে সহজীবন, সহ-যাত্রা। এখানেও রয়েছে কত রকমের চ্যালেঞ্জ, কতকিছুর মোকাবেলা, কত কিছুর জটিলতা, কত কিছুর পরিবর্তনের হাওয়া, যাওয়া-আসা। পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেছেন, 'বিবাহ একটি জটিল বাস্তবতা'। তিনি এটাও বলেছেন, 'পরিবার হলো একটি পরিবর্তনশীল বাস্তবতা'।

দিনে দিনে বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনটা অনেক জটিল আকার ধারণ করছে, জড় হয়ে যাচ্ছে। এর আলোকেই বলছি যুগটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান যুগধারায় কয়েকটা আগন্তুক ব্যাধিস্বরূপ যা বিবাহে, পরিবারে, ঘরের মৌলিক পারিবারিকতায় ও পরস্পর নির্ভরশীল বাস্তবতায় অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে গেড়ে বসেছে, তা যেমন একাকিত্বতা, নির্লিপ্ততা, নিষ্ক্রিয়তা, অসহিষ্ণুতা, নির্দয়তা, অস্থিরতা এবং হতাশা। পারিবারিক বন্ধনে সুস্থ প্রাণ প্রবাহ যেন নানান কিছু দিয়ে বাধাগ্রস্ত। হেমন্ত মুখোপধ্যায়ের সেই গানটি মনে পরে, 'শুন বন্ধু শোন, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা ইটের পাজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্ম ব্যথা"। বর্তমানে শহরের জীবনের চেয়ে প্রযুক্তির জীবন আরো সাংঘাতিকভাবে নির্মম। কারণ এটা যে শহর-বন্দর ছাপিয়ে কুঁড়ে ঘরেও ঢুকে গেছে। এই নির্মম আঘাতটা কিন্তু সরাসরি সম্পর্কের বন্ধনে এবং পরিবারের মর্মে মর্মে বেশী। মানুষের জন্য আজ মানুষের প্রাণ কাঁদে না, মনের টান বুঝে না, মানুষ আজ তেমন নির্মল হাসি দেয় না, মানুষ আজ মানুষের মান রাখে না, মানুষ আজ মানুষে আস্থা রাখে না, মানুষ আজ যেন আশায় বুক বাধতে ভরসা পায় না। মানুষ আজ মানুষে মিষ্টি-মধুর বন্ধনে দীর্ঘকাল বেঁধে রাখতে চায় না। কারণ প্রকৃত প্রত্যাশাপূর্ণ ভালোবাসা বলতে যা বুঝায় তার ন্যূনতম নির্যাসটুকুও হৃদয়ে ধারণ করার ভরসাটা পায় না। মূল কারণ হলো তীর্থাবাস নাই। পূণ্য ও শান্তি-মোক্ষ লাভের প্রত্যাশার স্থানই তীর্থাবাস। আর এই তীর্থাবাস পরিবারেই! এখানেই এর পূণ্য-প্রাণ-প্রেরণা প্রবাহের মুল আশার সঞ্চারী ভূমি।

চিরন্তন, সনাতন সত্য ও মানবিক মূলমন্ত্র ও সার্বজনীন জীবনব্রত সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসার সাথে রয়েছে এই আশা। তা না থাকলে তো মানুষ বাঁচতে পারতো না, মানুষে মানুষে চলতে পারতো না, মানুষ সামনে এগিয়ে চলতে পারতো না। প্রতিদিনের নতুন সূর্যের অপেক্ষায় থাকতো না। আশাই একমাত্র ভেলা, এটা একটা শক্তি, এটা একটা প্রেরণা, এটা একটা সান্ত্বনাও বটে। এটাই পারিবারিক চেতনা। পরিবার চেতনাবোধ কিন্তু সাংঘাতিক একটা শক্তি। পরিবার শুধু স্বামী-স্ত্রী, সন্তান পিতামাতা ঘিরেই নয়। পরিবার একটা স্বত্তা, একটা সমষ্টি, একটা জীবনকোষ। পরিবার একটা পরস্পর অবলম্বন, একাত্ববোধ ও মিলন, একটা সহভাগিতা, সহমর্ম ও সহযাত্রার বন্ধন। বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসায় আপনজনদের

হৃদয়ে ও চেতনায় ধারণ ও বহন।

মানুষের মধ্যে পরিবার চেতনাবোধ অনেক দুর্বল হয়ে পরেছে। প্রথমত সবচেয়ে বড় হতাশার দিক হলো পরিবারে নতুন সৃষ্টিতে নিরাশা। জন্ম ও সৃষ্টির প্রতি অনীহা। পরিবার তো জীবনকোষ। সেই লক্ষ্যের প্রতিই সবচেয়ে নির্লিপ্ততা। একদিকে এটা কিন্তু দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী-স্বামীর স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতার মানসিকতার প্রকাশ কারণ তার জীবনটা কাদের ভালোবাসায় এলো তার মাহাত্ম্য হারিয়ে ফেলা এবং নিজের জীবনের প্রতি এমন অন্ধ ভালোবাসা ও নিতান্ত নিছক অজুহাত দেখিয়ে কিন্তু সন্তান জন্ম দানে প্রকৃত অর্থে জীবনেরই প্রতি নিরাশা প্রকাশ করা। কিন্তু একটা পর্যায়ে নিজের এই অলীক আশাই পরে গিয়ে পরিবারে যে কত দুরাশার সৃষ্টি করে তা তো আমরা জানি। আমি সবসময় বলে থাকি সন্তান পরিবারেরর আনন্দ, সন্তান পরিবারের সম্পদ, সন্তান পরিবারের সৌন্দর্য, সন্তান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার সেতুবন্ধন, সন্তান ভবিষ্যতে পিতামাতার আশা-ভরসা। সুখ-সমৃদ্ধির জীবন এবং জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আশা অপরিহার্য। আশা শুধু জীবন নির্বাহে নয় বরং বংশ পরম্পরা প্রবাহে অপরিহার্য।

তারপর দ্বিতীয়ত সবচেয়ে হতাশার দিক হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় নির্লিপ্ততা। ভালোবাসার এই অবিচ্ছেদ্য বন্ধনকে ব্যক্তিক স্বাধীনতায় বাঁধা মনে করে। বিবাহে পরস্পরকে বহন করাকে বোঝা মনে করে। বৈবাহিক বন্ধনের, প্রতিশ্রুতির মর্মার্থ না বোঝা এবং হালকাভাবে নেওয়ার কারণে দাম্পত্য জীবনে প্রচুর অনাস্থা ও হতাশায় ভুগে। পরিণামে অবিশ্বস্থতা, পরকীয়া, আচরণে বেপরোয়া ও বাছবিচারহীন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারী, সংসার হয় ছাড়াছাড়ি, ক্ষণিক সুখের জন্য যতই করুক বাড়াবাড়ি পরিণামে কিন্তু জমা হতে থাকে হতাশারই পাল্লাভারী। আসলে দুটা মানুষের দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি, অনেক আশা-স্বপ্ন ও প্রত্যাশার পরিণয়েই দুজনের এই বিবাহ। আর এখানে আসলে, তাদের ভালোবাসার বন্ধনে থেকে পূর্ণ আশার ভেলায় ভেসে সামনে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হয়। "যে তরনীখানি ভাসালে দু'জনে আজি, হে নবীন সংসারী ... শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন প্রসাদপবন সঞ্চারি"।

তৃতীয়তঃ রয়েছে সঙ্গহীন সঙ্গীহীন জীবন। জীবনে চলতে গেলে সুস্থভাবে বড় হতে গেলে লাগে সঙ্গ, সঙ্গী। সবচেয়ে বড় সঙ্গ সঙ্গী হলো পরিবারে সন্তানের জন্য পিতামাতা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, দাদা দীদা এবং সন্তানদেরও মধ্যে আগে পরে ভাই-বোন। বিশেষ করে বর্তমানে মানবিক অনেক অভাব নিয়ে পরিবারে সন্তান বেড়ে উঠছে। সবচেয়ে বড় অভাব হলো সুস্থ-সম-সৎ-সজ্জনসঙ্গ। পরিবারে এক-দুজন সন্তান। তা-ও আবার বয়সের ব্যবধানে সমসাথী না হওয়ার কারনে নিঃসঙ্গ করে। এদিকে বর্তমানে বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রী'র পেশাগত কাজ, পিতামাতা হিসাবে কাজ, সন্তানের পড়াশুনার অতিরিক্ত চাপ রয়েছে। আবার অন্যদিকে সেই চাপ ও গুরুত্ব না থাকারও নির্লিপ্ততা। এর সাথে আঠার মত আটকে থাকা মোবাইল, যা একজনকে, পরস্পর থেকে পারিবারিক বন্ধন শিথীল করতে, সঙ্গহীন করতে বড় ভূমিকা রাখে। আর যদি পরিবারে সন্তান একজন/দুজন হয় তাহলে একা খাওয়ার, বেশী পাওয়ার, পুরোটা পাওয়ার ফলে পরার্থ চেতনাবোধ গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে না। ফলে এই পুরো স্বার্থচিন্তাবোধ সুস্থ সঙ্গ-সাথী গড়তেও বিরোধ সৃষ্টি করে। এইগুলো ভবিষ্যতে তার/ব্যক্তির জন্য চরম নিরাশার কারণ হতে পারে। এই নিরাশা হতে পারে এক পর্যায়ে নিজের জীবনে ভালোবাসার সম্পর্কের ব্যর্থতায়, হতে পারে অনেক প্রত্যাশা ভঙ্গের বেদনায়, হতে পারে আত্মকেন্দ্রিক অন্ধ যাতনায়। সুস্থ-সম-সৎ-সজন সঙ্গ প্রকৃত আশা- ভরসার শক্তি।

চতুর্থতঃ হতাশার কারণ হিসাবে পরিবারে আর একটা গুরুতর বিষয় হলো পরস্পরের জন্য সময় না থাকা। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে, পিতামাতা-সন্তানের মধ্যে, পরস্পর পরিজনের মধ্যে কথা বলার, মন খুলে আলাপ করার, একসাথে খাওয়ার, এক সাথে হালকা মেজাজে সহভাগিতা করার সময় না থাকা। এর কারণ নানা কর্ম ব্যস্ততা, পড়াশুনার চাপ, সর্বোপরি যার যার হাতের মোবাইল। এটা সাংঘাতিক রকম প্রলুব্ধকর একটা টেক-ডিভাইস। এটাকে ট্রেপ-ডিভাইস বলা যেতে পারে। যেমন এটা অতি আকর্ষণের বস্তু তেমনি এটা অতি নিরাশারও ফাঁদ। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে পৃথক করার, দূরত্ব বাড়ার, পিতা-মাতা থেকে সন্তানের দূরত্ব বাড়ার, এড়িয়ে চলার, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার, চাতুরতা করার, ঘরে থেকে পরস্পর সঙ্গ বাদ দিয়ে মোবাইলকে সঙ্গী করে নিঃসঙ্গ হওয়ার নির্মম নির্লিপ্ত নিরাশার কালচার তৈরি হয়েছে। দেখা যায় পরিবারে পরস্পরের জন্য সময় নাই। প্রশ্ন উঠে নিতান্ত প্রয়োজনের/কাজের পর তা হলে দিনের এত সময় কোথায় যায়! নাকি মোবাইল তাকে হাওয়ায় ভাসায়?

পঞ্চমতঃ তারপর যেটা গোটা পরিবারকে আক্রান্ত করছে, হতাশার সাগরে ভাসিয়ে নিচ্ছে তা হলো দাম্পত্য ও পরিবার জীবনে বিচ্ছেদ ভাঙ্গন। একটা পরিবার ভাঙ্গন, মনে আশার ভাঙ্গন, বিচ্ছেদ মানে মন ভাঙ্গা, সম্পর্ক ভাঙ্গা, সন্তান ভাঙ্গা, সন্তানের মন ভাঙ্গা। সন্তানের জীবনে সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ হয় পিতামাতার বিচ্ছেদ। তাদের জীবন হয় একাকিত্ব। একপাক্ষিক এবং প্রকট অসম্পূর্ণ মনস্তাত্বিক গঠনের কারণ। পরিবারে অসুস্থ পরিবেশ সন্তানদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়, বিষন্নতায় নিয়ে যায়। কারণ ভরসার স্থানটাই যে দুর্বল। কারণ বিশ্বাস ও ভালোবাসার মানটাই যে অচল। কারণ প্রেরণা লাভের উৎসটাই যে বিকল। বিবাহ বিচ্ছেদ, পরিবার ভাঙ্গন কিন্তু পরিনামে এর সাথে সম্পৃক্ত সবার মধ্যেই হতাশারই জন্ম দেয়।

ষষ্ঠতঃ এর সাথে ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার এক পর্যায়ে কিশোর-কিশোরী ধাপে, নব যুবক-যুবতী কালে আর একটা ক্রান্তিকাল; যখন বর্তমানে সমসাময়িক অনেক অভাব-অপূর্ণতা তাদের অনেকভাবেই হতাশ ও বিষন্ন করে। পারিবারিক সমস্যাতো থাকেই তারপর তাদের মধ্যে অতিরিক্ত পড়াশুনার চাপ, অকাল ও অপরিপক্ক প্রেম ও সম্পর্ক এবং এর ভাঙ্গন ও ব্যর্থতা, অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক সংকট, বেপরোয়া আচরণ, জীবন সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব, স্বপ্নভঙ্গ ও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা বা কিছু পাওয়ার জেদ বা না পাওয়ার হতাশা, পাশাপাশি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তুলনায় নিজের অপারগতা ও অতুষ্টি বা অপ্রাপ্তি, বুলিং এবং মানসিক ও যৌন নির্যাতন, জীবনের মূল্য ও গুরুত্বের নেতিবাচক চিন্তা, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব পরিবারে-সমাজে এই শ্রেণীকে অনেক বিষন্নতায় নিয়ে যাচ্ছে। ফলে স্মরণকালে সবচেয়ে বেশী আত্মহত্যা ঘটনার খবর পাওয়া যায়।

মন ও মনস্তত্ব এক নয়। মন অনেক কিছু চাবে, মনে অনেক কিছু ঘোরাঘুরি করবে, মনে অনেক কিছু বাসা বাঁধবে। কিন্তু এখানে হৃদয়ের সংযোগ থাকতে হয়। এই হৃদয়ের সংযোগটা হলো মনস্তত্ব। এখানে গাইটপোষ্ট বা লাইটপোষ্ট হলো বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা। তাই যা উল্লেখ করা হলো, 'মনে রেখো এই ছোট তিনটি কথা-আশা-প্রেম-বিশ্বাস; আধারে জ্যোতির দরশণ পাবে; পাবে বল যাবে ত্রাস'। মনের জগতে এই তিনটা গাইটপোষ্ট লালিত না হলে, মনের বিশাল নিয়ন্ত্রণহীন প্রত্যাশায় বিষন্ন মনস্তত্ব তৈরি হয়। তখন অনেক কিছু অর্থহীন, অন্ধকার মনে হয়। তা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকার জন্য আশাই আলোকবর্তিকা।

বর্তমান যুগটা আপাত মনে হয় অতিরিক্ত প্রাণপূর্ণ। আসলে তা কিন্তু নয়। যুগটা আসলে অস্থিরতার। অতিরিক্ত ব্যস্ততার; অতিরিক্ত ছোটাছুটি; অতিরিক্ত উত্তেজনা; অতিরিক্ত দলাদলি; অতিরিক্ত প্রতিপক্ষ; অতিরিক্ত অসহিষ্ণুতা; অতিরিক্ত গতি; অতিরিক্ত বাহ্যিকতার যুগ। আসলে এগুলো প্রাণচাঞ্চল্য নয়। এইগুলো আসলে ভ্রমবাহুল্য। বর্তমানে অনেক ফাপা-শব্দচিৎকার আছে কিন্তু চিত্তরঞ্জন-চিত্তশুদ্ধি নেই। বর্তমান যুগটা অতিরিক্ত শব্দময়। শব্দে কান স্তব্ধ হয়ে গেলেও কিছু মনে করে না। কারণ মন হৃদয় ইতোমধ্যেই অস্থিরতা দ্বারা যে স্তব্ধ হয়েই গেছে। চিত্ত আজ অস্থির, হৃদয় আজ অসহায়। বর্তমানে অশ্লীল শব্দের অবাধ ব্যবহারও কথাবার্তার শোভনতা-নান্দনিকতা নষ্ট করে দিচ্ছে। এগুলো ছোট-বড় সবার মধ্যে দৃশ্যমান।

আসলে অন্তর-আত্মার কিছু না থাকলে, প্রশান্তি-শান্তি, আস্থা-আন্তরিকতার কিছু না থাকলে জীবন যাত্রায় আশার কোন শুভবার্তা পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগটা যেন শুধু 'আমার' 'আমার' ভাবনায় চলছে। অতিরিক্ত 'আমি' 'আমি', অতিরিক্ত স্বাধীনতা, অতিরিক্ত অধিকার প্রবণতা, অতিরিক্ত জবাবহীনতা। এই চিন্তা আমিত্বের বাইরে গিয়ে উদারতার ব্যাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটায়, মনকে সংকীর্ণ করে রাখে। পারিবারিকতা ও সামাজিকতা হলো সুষ্থ মানবিক গঠনের মানদণ্ড। তাই পারিবারিকতায় সামাজিকতায় 'আমাদের' চেতনায় চলতে হয়। আমাদের চেতনা হলো পরস্পর গ্রহণীয়তা ও নির্ভরতা। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তিক অধিকার-অধিকার করতে করতে একটা মানবিক, সামাজিক, নৈতিক বন্ধন ও দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতার ও শ্রদ্ধা-সম্মানের জায়গাটা ফাঁকা করে ফেলেছে। এটা পাশ্চাত্যের (কু) প্রভাব। সন্তানকে কিছু বলা যাবে না, স্কুলে ছাত্র/ছাত্রীদের কিছু বলা যাবে না, শাসন করা যাবে না। এই লক্ষণগুলো কিন্তু পরিনামে স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্বতার চরিত্র গড়ে উঠতে নিরাশারই যুগ দর্শন।

আশা-নিরাশার এই যুগপদে জুবিলী ও তীর্থ চেতনা পরিবার মূল্যায়নে ও নবায়নে একটা বড় সম্ভাবনা। জুবিলী হলো পিছনকে সন্মান করে সামনের মান রক্ষা করার কারণ। আশা পিছনকে মূল্যায়ন করে সামনে চলার নবায়নের প্রতিশ্রুতি। তাই পরিবারে মূল্যায়ন করা দরকার যে, আমরা পরিবারে কি হারিয়েছি, কি নিয়ে আমি ব্যস্ত। এখানে বিশৃস্ততা হারাতে পারি, দায়িত্ববোধ হারাতে পারি, সম্মান-শ্রদ্ধা ভালোবাসা হারাতে পারি, সততা হারাতে পারি, বিশ্বাস-আস্থা হারাতে পারি, নিয়ম-শৃংখলা হারাতে পারি, সময় জ্ঞান হারাতে পারি, শান্তি হারাতে পারি, ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতাবোধ হারাতে পারি, সহভাগিতা হারাতে পারি, ইচ্ছা আগ্রহ হারাতে পারি, আদর যত্ন হারাতে পারি, উদারতা হারাতে পারি, আদর্শ ও নৈতিকতা হারাতে পারি, সুনাম হারাতে পারি, সুআদর্শ হারাতে পারি, সম্পদ হারাতে পারি, সময়-সুযোগ হারাতে পারি, উৎসাহ-উদ্দীপনা হারাতে পারি, কর্মস্পৃহা হারাতে পারি, আশা হারাতে পারি।

এই জুবিলী তীর্থ বর্ষে আসুন দেখি, কি জাগাতে পারি, শুভ কিছু কি বাড়াতে পারি- কারণ জুবিলী হলো জাগরণের সময়, জয় করার সময়, সমৃদ্ধির সুযোগ, সুন্দরের জয়গান করার সময়, জীর্ণতাকে জলাঞ্জলি দেওয়ার সময় অর্থাৎ মন্দতাকে বিসর্জন দেওয়ার সময়, ঋণমুক্ত হওয়ার সময় যেখানে প্রয়োজন তীর্থমন। এই হারানোর হাহাকার থেকে চেতনার জাগরণ হলো তীর্থায়ন করা। তীর্থায়ন হলো নবায়ন। তীর্থ শুধু কোন স্থান পরিদর্শন নয়, কোন স্থানে পরিভ্রমণও নয়, মূলত এটা হলো শুদ্ধায়ন। বর্তমান এই প্রযুক্তির যুগে আমরা তো পরিবারে থেকেও পরিবার চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে গেছি, একা একা মনোজগতে যার যার মত ভ্রমণ করছি, নিজে নিজেই আমার মত করে আমার মনকে ভ্রমণ করাচ্ছি। এই জুবিলী তীর্থ বর্ষে পরিবারকেই ভূমি করে নেই, তীর্থ ভ্রমণ পরিবারেই হোক। তীর্থ মিলন পরিবারেই হোক। তীর্থ উৎসব পরিবারেই হোক।

সারা বছর পরিবারে কয়েকটি পারিবারিক বন্ধন-বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন করা যেতে পারে। যেখানে পারিবারিক মূল্যবোধ ও গুণগুলোকে উদ্‌যাপন করা। এখানে থাকবে মিলন, সহভাগিতা, পুনর্মিলন, ক্ষমা, দায়িত্ববোধ, সম্মান-শ্রদ্ধা, স্নেহ-ভালোবাসা, মর্যাদা অধিকার, প্রতিশ্রুতি, প্রার্থনা, বিশ্বাস চর্চা। বিবাহের উৎসব: সবাই মিলে তা উদ্‌যাপন করা; পরিবারের উৎসব: পিতামাতা সন্তানদের মধ্যে উৎসব; জন্মের উৎসব: সবার জন্মদিনকে একদিনে উদ্‌যাপন করা; এই বছর একবার অন্তত সবাই মিলে দেশের কোথাও গিয়ে পরিবার নবায়ন উৎসব করা।

---

২৪ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ

রক্ষা ও যত্নের তাগিদ এই জুবিলী বা পুণ্য বর্ষ খুবই বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করে চলছে।

৩. মানব মর্যাদা: লেবীয় পুস্তকে জুবিলী সম্পর্কিত নির্দেশনায় মানব মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখেছে। মানুষ হিসাবে সবাই ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং প্রতিটি মানুষ একই মযার্দার অধিকারী। ঈশ্বর নিজেই তা ব্যক্ত করেন, "কেননা তারা আমারই দাস, যাদের আমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি; ক্রীতদাসদের যেভাবে বিক্রি করা হয়, তাদের সেভাবে বিক্রি করা চলবে না" *(লেবীয় ২৫:৪২)*। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা, ও ব্যক্তি-অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও জুবিলীর অন্যতম আবেদন।

৪. ঐশতাত্ত্বিক শিক্ষা: বিশ্ব প্রকৃতি ও সময়ের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য জুবিলীর অনুশাসনে স্পষ্ট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইহুদীজাতির কাছে দাবী করা হয় যে, তারা যেন ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার ক'রে তাঁর প্রতি বাধ্য থাকে ও আত্মসমর্পণ করে। আরেকটি ঐশতাত্ত্বিক দিক হলো শেষ বিচার ও মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা। তার মানে হচ্ছে, প্রথম মানুষের পাপের কারণে মানবজাতির যে আদিরূপ ও উত্তমতা হারিয়েছিল, সেই শেষ দিনে যখন তুর্যধ্বনি বাজিয়ে মসীহ (খ্রিস্ট) আসবেন তখন তিনি সব কিছু নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন (দ্র. শিষ্য ৩:২১)। তাই বিশ্বাসের জীবনকে নবায়ন ও সুদৃঢ় করার আহ্বানও জুবিলী বর্ষে প্রতিধ্বনিত হয়।

উপসংহার: বর্তমান বাস্তবতায় জুবিলীর মৌলিক আবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জুবিলীর বাহ্যিক একটি দিক রয়েছে; আনন্দ, উৎসব, উদ্‌যাপন এই মাহেন্দ্রক্ষণকে কেন্দ্র করে অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে জুবিলীর যে মহত্ব ও তাৎপর্য তা যেন ম্লান হয়ে না যায়। সব আয়োজনের মূল লক্ষ্য যেন হয় জুবিলীর চেতনাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। তবেই এই উৎসব হয়ে উঠবে নবায়নের সময় ও নতুনভাবে পথ চলার প্রেরণা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

1. DIM, E.U., "The Biblical Background of 'Jubilee' Celebrations", in DOI (2022) 1-9.

2. WRIGHT, C.J.H., "Jubilee, Year of", The Anchor Bible, III, 1025-1029.

3. KAPLAN, J., "The Credibility of Liberty: The Plausibility of the Jubilee Legislation of Leviticus 25 in Ancient Israel and Judah", in CBQ 81 (2019) 183-203.

4. BATTAGLIA, O., Celebrating the Jubilee in the Church. Biblical Origin, History and Celebration, Nimo, 2009.

ওয়ারিশান সম্পত্তি অশান্তির উত্তরাধিকার

ড. ইসিদোর গমেজ

অত্যন্ত জটিল স্পর্শকাতর এই বিষয়টি নিয়ে লেখার ইচ্ছা অনেক দিনের। আমাদের সমাজের প্রতিটি পরিবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা খুবই কম হয়। অথচ প্রায় প্রতিটি বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারে, বাংলাদেশে- এমন কি ভারতে, জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন না কোন সমস্যা বা জটিলতা বিদ্যমান। বিশেষভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য/প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তির সুষ্ঠু বন্টন না হওয়ার কারণে একটা সময় ভাই-বোন, কাকা-জ্যাঠা, পিসি, মামা-মাসীদের মধ্যে পারিবারিক বিচ্ছেদ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মুসলিম, হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বাংলাদেশের খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন অনেক সহজ, সরল ও আধুনিক। তথাপি আমাদের খ্রিস্টান সমাজে বেশিরভাগ পরিবারে সময়মত জমি-জমার বন্টন সম্পন্ন না হওয়ায় নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি, বিচার-সালিশ, এমনকি মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর মূলে যেসব কারণ আছে, তা হলো- জমি-জমা সংক্রান্ত সাধারণ আইন-কানুন তথা জমি জমার কাগজ পত্রবিষয়ে অজ্ঞতা, নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা, দায়িত্বহীনতা, পরিবারের সদস্যদের অভ্যন্তরীণ আবেগ বা সেন্টিমেন্ট এবং সমাজ ও মণ্ডলীর দিক থেকে সঠিক কোন দিক নির্দেশনা না থাকা।

আমাদের বেশ কয়েকজন খ্রিস্টান লেখক জমি-জমা রক্ষণাবেক্ষণ ও উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন। যেমন; অমৃত বাড়ৈ, এডভোকেট পল ডি' কস্তা, ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও এবং সুভাষ জেংচাম (সাংমা)।

জানি না সমাজের কতজন শিক্ষিত সচেতন মানুষ, চার্চ নেতা, মাতব্বর ও সমাজ কর্মীরা সেগুলো পড়েছেন কি না এবং লব্ধ জ্ঞান বাস্তবে সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করেছেন বা নিজে ব্যবহার করেছেন কি না। বরং অনেক সময় এক শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন ভাবে ভুয়া কাগজ পত্র বের করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদের ইতিহাসই বদলিয়ে ভোগ দখল করছে ও বিক্রয় করছে।

আমরা খ্রিস্টানরা যদি উত্তরাধিকার আইন মেনে সঠিক সময়ে ওয়ারিশ সম্পত্তি বন্টনের যথাযথ পদক্ষেপ নিতাম, তবে শতকরা ৯৫ ভাগ পরিবারের স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন বিরোধ বা সমস্যা থাকতো না। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ খ্রিস্টান পরিবারে কোন না কোন ভাবে জমি জমার বিষয়গুলো যথাসময়ে ভাগ-বন্টন-দান-গ্রহণ না করার কারণে সেই সম্পত্তি ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রথমে সুপ্ত এবং পরে প্রকাশ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে। একসময় বিচার সালিশে গড়ায়। তখন ভাই-বোন, মাসি-পিসি, মামা-কাকা, এমন কি বাবা-মায়ে'র সাথেও সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। এসব কিছুই প্রায় সকলেরই জ্ঞাত। আমার এই প্রবন্ধে আমি আঠারগ্রামের বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো।

জমি-জমা ও বাড়ি সংক্রান্ত যে সকল তথ্যগুলো সাধারণের জানা আবশ্যক আমার মূল প্রবন্ধের আগে সে বিষয়ে প্রথমে কিছু আলোকপাত করছি। আমাদের মানুষ বাড়ি/জমি মালিকানার আলোচনায় মূল যে সকল কাগজ পত্র তার মধ্যে আর.এস. (রিভিশনাল সারভে), এস.এ. (স্টেট এ্যাকুইজিশন সার্ভে ১৯৫০- থেকে ১৯৫৬), সি.এস. (ক্যাডেস্ট্রাল সারভে ১৮৮৮ থেকে ১৯৪০)। এছাড়া পি. এস. (পাকিস্তান সার্ভে), বি. এস (বাংলাদেশ সার্ভে ১৯৯০), সিটি জরিপ, দিয়ারা জরিপ ইত্যাদি। তারপর মৌজা ভিত্তিক পর্চা ও খতিয়ান শব্দগুলোর সাথে পরিচিত। কিন্তু তাদের পরিষ্কার ধারনা নেই এই সকল টেকনিক্যাল টার্মের অর্থ কি। তাই আমি প্রাথমিক কিছু ধারনা দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছি, তাহলে আমরা অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করতে পারবো।

১. আমাদের আঠারগ্রামে বেশিরভাগ পুরাতন বাড়িগুলোর কোন হস্তান্তর বা রেজিষ্ট্রি দলিল নেই, কারণ এসব স্থাবর সম্পত্তির মালিক ছিলেন জমিদারগণ। উল্লেখ্য, হাসনাবাদে আমাদের জমিদার ছিলেন স্বয়ং পুরোহিত, তাদেরকে বলা হতো জমিদার ফাদার। গোল্লা এলাকার পূর্বের নাম ছিলো রসুলপুর এবং এই পরগনার জমিদার ছিলেন কলাকোপা অবস্থানরত জমিদার ও তার বোন জমিদার চৌধুরানী। যার কাছ থেকে কেউ কেউ পত্তন বা ইজারা নিয়ে অথবা সাবকলা ক্রয় করে ব্যবহার ও ভোগদখল করেছেন। একই অবস্থা ছিল নাগরী/ভাওয়াল এলাকায়; সেসময় জমিদারগণ সরকার পক্ষে জমির মালিক ছিলেন এবং রায়তগণ প্রজা হিসেবে শুধুমাত্র ভোগ দখলকার ছিলেন।

ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় জমিদারীপ্রথা বাতিল করে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর অধীনে। তার আগে বৃটিশ সরকারের আমলে সি.এস. জরিপ/রেকর্ড (ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে) করা হয়েছিল সমগ্র ভারত জুড়ে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সি.এ. জরিপ কাজ চলেছে। সি.এস. জরিপের সময় প্রস্তুতকৃত খতিয়ানে জমিদারগণের নাম খতিয়ানের উপরিভাগে এবং দখলকার রায়তের (মালিক দখলকার) নাম খতিয়ানের নিচে লেখা হত। এদেশে সি.এস. জরিপ এবং প্রস্তুতকৃত নকশা (মৌজা ম্যাপ) খুব নিখুঁত ও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে সঙ্গত কারণে আমাদের পুরাতন নথি-পত্রে/পর্চায় দেখা যাবে পিতৃ পুরুষগণ বেশির ভাগ পাট্টা/ মিরাশি পাট্টা/ সূত্রে জমি বা বাড়ির মালিক হয়েছেন;

২. আমাদের আঠারগ্রাম এলাকায় দোহার-নবাবগঞ্জ এলাকায় সি.এস. নকশা, মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত হয়েছিল ১৯০৮-১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে। এই প্রথম জরিপ বলে জমি ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানার যে রেকর্ড হয় তাকে বলা হয় সি.এস. রেকর্ড, পর্চা ও খতিয়ান।

৩. এস.এ. জরিপ (স্টেট এ্যাকুইজিশন সার্ভে) : ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ার পর সরকার (পাকিস্তান সরকার) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে) জমিদারী অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২/৪/১৯৫৬ তারিখে এই আইনের ৩ ধারার আওতাধীন বিজ্ঞপ্তির মূলে সরকার কর্তৃক সকল জমিদারি দখল নেয়ার পর উক্ত এ্যাক্টের ১৭ ধারা মোতাবেক যে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয় তা এস.এ. খতিয়ান বলে পরিচিত। ১৯৫৬ হতে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপে ভূমি মালিকের নাম ও জমির বিবরণাদি সম্বলিত হাতে লেখা রেকর্ড/খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়। সে সময় এই রেকর্ড মোট তিন কপি প্রস্তুত করা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি জেলা রেকর্ড রুমে, এক কপি

তহশিল (ইউনিয়ন ভূমি অফিস) এবং অন্যটি সার্কেল পরিদর্শক (সি.ও./উপজেলা রাজস্ব) অফিসে প্রদান করা হয়। জরুরী তাগিদে জমিদারগণ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই জরিপ বা খতিয়ান প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল।

৪. আর.এস. জরিপ (রিভিশিয়নাল সার্ভে): সি.এস. জরিপ সম্পন্ন হওয়ার সুদীর্ঘ ৫০ বছর পর এই জরিপ পরিচালিত হয়। জমির অবস্থা, প্রকৃতি, মালিক, দখলদার ইত্যাদি হালনাগাদ করার লক্ষ্যে এ জরিপ সম্পন্ন করা হয়। এস.এ. জরিপের সময় সরেজমিনে তদন্ত বা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা হয়নি। জমিদারদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এস.এ. জরিপ বা খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়েছিল যার কারণে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। এই ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরেজমিনে ভূমি জরিপ করার সিদ্ধান্ত নেয় যা আর.এস. বা রিভিশিয়িনাল সার্ভে জরিপ হিসেবে পরিচিত। এই জরিপে প্রস্তুতকৃত নকশা (ম্যাপ) এবং খতিয়ান নির্ভুল হিসেবে গ্রহণীয়। এখানে গর্বের সাথে উল্লেখ করছি যে, ভাওয়াল এলাকার শিক্ষক ফিলিপ ডি' রোজারিও যিনি পি.ডি. রোজারিও নামে অধিক পরিচিত (সিস্টার মেরী প্রীতি এসএমআরএ) এর বাবা আর.এস. জরিপ প্রকল্পে সরকারের একজন ফিল্ড সার্ভেয়ার হিসেবে দক্ষতার সাথে কাজ করে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

৫. বি.এস. জরিপ (বাংলাদেশ সার্ভে): বিএস জরিপ হলো মূলত বাংলাদেশ সার্ভে এর সংক্ষিপ্ত রুপ। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী এই জরিপ কার্য পরিচালিত হয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ হতে বর্তমানে চলমান জরিপকে বিএস খতিয়ান বা সিটি জরিপ বলা হয়। যা এখনও সারা দেশে চলমান। শুধুমাত্র মহানগরীতে বি এস খতিয়ানকে সিটি জরিপ বলা হয়। এই সিটি জরিপের আরেক নাম ঢাকা মহানগর জরিপ। আর এস জরিপের পর বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ জরিপের উদ্যোগ নেয়। এ যাবৎকালে এটিই হলো আধুনিক জরিপ।

৬. সিটি জরিপ: সিটি জরিপের আর এক নাম ঢাকা মহানগর জরিপ। আর. এস. জরিপ এর পর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমতিক্রমে এ জরিপ ১৯৯৯ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। এ যাবৎ কালে সর্বশেষ ও আধুনিক জরিপ এটি। এ জরিপের পর্চা কম্পিউটার প্রিন্ট এ প্রকাশিত হয়েছে।

৭. দিয়ারা জরিপ: দিয়ারা জরিপ হলো দরিয়া সম্পর্কিত জরিপ। জেগে উঠা নতুন ভূখণ্ড (চর) জেলা প্রশাসকের চাহিদার ভিত্তিতে সিকস্তি পয়স্তির কারণে ভৌগলিক সীমারেখা ও স্বত্বের পরিবর্তন হলেও নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় নতুন জরিপ করা হয়। এ সমস্ত জরিপে নকশা ও রেকর্ড প্রস্তুত করা হয়। এটি অতি পুরাতন জরিপ। ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ আরম্ভ হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে, পক্ষান্তরে দিয়ারা জরিপ আরম্ভ হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। দিয়ারা জরিপে সাধারণ জরিপের জন্য প্রযোজ্য সকল স্তর অনুসরণ করে পয়স্তি ভূমির (চর) নকশা ও রেকর্ড প্রস্তুত করা হয়। দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে ৪টি (রাজশাহী, নরসিংদী, চট্টগ্রাম ও বরিশাল) বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক অফিস ও ক্যাম্পের মাধ্যমে সারাদেশের সুনির্দিষ্ট কিছু মৌজায় এ জরিপ কাজ পরিচালিত হয়।

জমির জরিপ ও রেকর্ড পরবর্তী আসল ডকুমেন্ট হলো খারিজা পর্চা।

আঠারগ্রাম অঞ্চলের জমি-জমা, বাড়ি-ঘর, স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কিছু বাস্তবতা উল্লেখ করছি।

(ক) ভাবতে অবাক লাগে এখনও আঠারগ্রামের অনেকে মৃত বাবা মায়ের নামে খাজনা দেয়ার চেষ্টা করে। অনেকে ভুল নামেও জমি ভোগদখল ও খাজনা দিয়ে আসছে।

(খ) এমন বাড়ি আছে যেখানে ৬/৭ টি পরিবার আছে যারা সবাই ওয়ারিশ সূত্রে মালিক, কিন্তু তাদের অংশের সীমানা নির্ধারণ করতে আলাদা কোন বন্টননামা খতিয়ানভুক্ত করা হয় নি;

(গ) জমি রেজিষ্ট্রি করার ১০/১২ বছর পরেও নাম-খারিজ ও জমা-ভাগ করে প্রকৃত মালিক হন নি;

মনে রাখতে হবে সম্পত্তি ক্রয়ের বা হেবার দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন হলেও মালিকানার শর্ত হলো রেকর্ড ও পর্চা। ওয়ারিশসূত্রে মালিক হলেও সম্পত্তি নিজের নামে নাম-জারী ও জমাভাগ করে খাজনা দেয়ার পর সত্যিকার অর্থে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিষয়টি জানলেও আমাদের পিতা-মাতাদের অনেকেই তা জানতেন না। সাবরেজিষ্ট্রার অফিসে সাব-কাওলা বা হেবা দলিল করার পর মনে করতো তারা মালিক হয়ে গেছে। কারণ রেজিষ্ট্রির পর তারা নির্বিঘ্নে জমি ভোগ দখল করতে থাকে। নাম খারিজ (মিউটেশন) রেজিষ্ট্রির পর পর না করলে পরবর্তীতে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে।

আঠারগ্রামের মানুষের জমি জমার রেকর্ড পর্চায় সবচেয়ে বেশী ভুল দেখা যায় নামের বানানে। প্রকৃত পক্ষে আঠারগ্রামের এসব নথিপত্র পর্যালোচনা করলে নামের মধ্যে, ঠিকানার মধ্যে অনেক গরমিল ও ভুল তথ্য ধরা পরে। ওয়ারিশানের ধারাবাহিকতায় গণ্ডগোল। ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে মেয়েদের নাম বাদ দেয়া হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে মেয়েদেরকে পালক হিসেবে ওয়ারিশানে রেকর্ড করা হয়ে থাকে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের পরে তহসিল অফিসে আঠারগ্রামের জমি ও বাড়ির মালিকানা রেকর্ড ও পর্চায় সবচেয়ে মারাত্মক একটি বিষয় হলো মালিকের নামের পাশে, "হাল সাং ভারত, বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত" লেখা। অর্থাৎ অংশটিকে অর্পিত সম্পত্তি (ভেস্টেট প্রপারটি) হিসেবে চিহ্নিত করা। শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। এ বিষয়ে আমাদের বিজ্ঞ সমাজপতি, চার্চ লিডার/বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর কোন মাথা ব্যথা নেই। যার সমস্যা সেই ভুক্তভোগী জানে কি ধরনের বিড়ম্বনা পোহাতে হয় তাদের।

আজ পর্যন্ত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আইনগতভাবে জানতে চাওয়া হয়নি, খ্রিস্টান মানুষের সম্পত্তি কিভাবে শত্রু সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ড হয়? অর্পিত সম্পত্তিই বা কিভাবে হয়? আমাদের খ্রিস্টানগণ ভারতে থাকলে তার সম্পত্তি অর্পিত হয়ে যায়, আর বিলাত, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এমনকি পাকিস্তানে থাকলেও তাদের সম্পত্তির ওয়ারিশ ঠিক থাকে।

একটি বিষয় আমরা কখনো সঠিকভাবে বুঝি না, সেটি হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ যেভাবে পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে গেছে বা মাইগ্রেট করেছে, খ্রিস্টানদের বেলায় তো তা ঘটেনি! আঠারগ্রাম বা ভাওয়াল অঞ্চলের মানুষ ও পরিবারের সত্যিকার অর্থে মাইগ্রেশন বা দেশত্যাগ হয়নি। বৃটিশ ভারতের রাজত্বকালে আমাদের ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান পরিবারের অনেকে উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের কোলকাতাসহ বিভিন্ন শহরের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেত। ডিগ্রী লাভের পর সেখানে সরকারী বা বেসরকারী চাকুরী করতো। তাদের পরিবারও সেখানে থাকতো, আবার যখন তখন পালা পার্বণে, বিয়ে-সাদি করার জন্য, নিমন্ত্রণ খাওয়ার

জন্য তাদের পৈত্রিক বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো। এটি যে শুধু খ্রিস্টানদের বেলায় ছিল তা নয়। আমার জানা অনেক খানদানি মুসলিম ও হিন্দুরাও কোলকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে সেখানে আই.পি.এস. অফিসার, শিক্ষক, অধ্যাপক ও কমার্শিয়াল পদে এবং বড় বড় হোটেল রেঁস্তোরায় চাকুরী করেছেন। আমাদের আঠারগ্রামে এরকম অনেক উদাহরণ আছে। এদের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেগরী গমেজ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বাড়ি গোল্লা মিশনের পুরান বান্দুরা গ্রামে। বান্দুরা হলিক্রশ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কোলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও কোলকাতা বিশ্বদ্যিালয় থেকে ডিগ্রী নেয়ার পর তিনি বেঙ্গল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে প্রশাসনিক ক্যাডারে চাকুরী লাভ করেন। ঐ একই গ্রাম পুরান বান্দুরার আরেক সন্তান ডানিয়েল গমেজ কোলকাতায় আইন পড়াশোনা করে হয়েছিলেন কোলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী, ব্যারিষ্টার।

সুতরাং আমি চেষ্টা করেছি একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝতে, যে আমাদের খ্রিস্টানদের সম্পত্তি কোনভাবেই (কোন আইনেই) অর্পিত বা শত্রু সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না। তাই বলতে চাই যে, সময় শেষ হয়ে যায় নি। এখন বাংলাদেশে আমাদের অনেক খ্রিস্টান উকিল, ব্যারিষ্টার ও সরকারী কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন এর নেতৃবৃন্দ আছেন। আশা করি তাদের ও চার্চের পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে রিট বা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখার চেষ্টা করি। তিন শতাধিক বছরের পুরানো কাথলিক খ্রিস্টান সমাজ, আঠারগ্রাম। শিক্ষিতের হার প্রায় শতভাগ। একই অবস্থা ভাওয়াল এলাকার নাগরীসহ পার্শ্ববর্তী মিশনগুলোতেও। আমার বিবেচনায়, আমাদের খ্রিস্টান সমাজের বিদ্যমান সমস্যার সবচেয়ে বড়টি হলো জমি-জমা, বাড়ী-ঘরসহ যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি।

২০০৩ খ্রিস্টাব্দে আমি পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি ধর্মপল্লী- কাউরাপুকুর, ঠাকুরপুকুর, হরিবপুর, তাহেরপুর, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, কোলকাতার তালতলা, এন্টালী এবং দিল্লীস্থ লাজ্পীনগর ধর্মপল্লীর অনেকগুলো পরিবার (৫৫টি) পরিবার পরিদর্শন করেছিলাম বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তাঁদের সাথে কথা বলেছি, পারিবারিক বিষয়ে সহভাগীতা করেছি। এদের অনেক পরিবারের বড় অংশ এখনও বাংলাদেশে আছে। দু'চার জন ছাড়া বেশীর ভাগ পরিবারের স্থাবর সম্পত্তি জমি জমা, বাড়ির মালিকানা রয়ে গেছে তাদের নামে বা আর.এস রেকর্ডে যা অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আর অনেকের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে থাকায় নিকট আত্মীয় বা অন-আত্মীয় কেউ-বা সরকার থেকে লীজ নিয়ে ভোগ দখল করছে। অনেক সম্পত্তি আবার বেহাত হয়ে গেছে, অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বে-আইনিভাবে দখল করে নিয়েছে। এব্যাপারে আমাদের সমাজ নেতা বা মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সঠিক কোন দিক্ নির্দেশনা না থাকায় সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। ফলে বাপ-দাদার সম্পত্তির দায় ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতিদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

আমার কাছে এমন এমন পরিবারের জমি জমা সংক্রান্ত তথ্য আছে তার তালিকা প্রকাশ করলে আতকে উঠতে হবে। এখানে আমি উচ্চ শিক্ষিত ২/৪ টা পরিবারের কথা উল্লেখ করছি। হাসনাবাদ অঞ্চলের একটি পরিবার। পিতার রেখে যাওয়া লিখিত উইল যথাসময়ে ব্যবহার (প্রবেট) করতে না পারার কারণে ২৫/৩০ বছর যাবৎ ভাই-বোনদের মধ্যে মামলা চলছে। বর্তমানে ঐ সম্পত্তির মূল্য কয়েক কোটি টাকা। যতদূর জানি এখনও সমস্যার সমাধান হয় নি।

গোল্লা গ্রামের এক ভদ্রলোক বাড়ি করেছেন দক্ষিণ কোলকাতা। আমার সাথে কথা বলতে বলতে কেঁদেই ফেলেন। বিয়ে করেছেন নিজ এলাকার মেয়ে। চাকুরী করতেন ঢাকার শাহবাগ হোটেলে। পরে ভারত হয়ে চলে যান মধ্যপ্রাচ্যে। একদিন সংবাদ পান বড় ভাই বাড়িতে নতুন ঘর তৈরী করছে। আমাদের এলাকায় একটি প্রচলিত সামাজিক প্রথা ছিল, ছোট ছেলে বাবার (বড়) ঘর পায়। ভদ্রলোকের দুঃখ, ভাই তাঁকে না বলেই বাবার পুরানো ঘর বিক্রি করে দেয় এবং সীমানা নির্ধারণ না করেই নতুন ঘর নির্মাণ করে। সেই যে অভিমান হলো, ভদ্রলোক স্ত্রীকে কোলকাতা নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। পরে জমি কিনে বাড়ী করে সেখানেই স্থায়ী হয়েছেন।

এমন ঘটনা শুলপুরেও আছে। এই মিশনের অনেক পরিবার এখন কোলকাতা, বোম্বে, দিল্লীতে বাড়ীঘর করে সেখানেই স্থায়ী হয়েছেন। এদের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই একটা অন্যরকম চাপা দুঃখ আছে।

আমাদের পারিবারিক সমস্যার খুব সাধারণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মার্টিন কস্তা দুই বিঘা (৪০ কাঠা) জমি ক্রয় করে ১০ কাঠার উপর বাড়ী করেছে। তার স্ত্রী, ১ ছেলে ও ২ জন মেয়ে। মার্টিন ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করল। তার দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে, থাকে অন্যত্র। ছেলে বিয়ে করেছে, বাড়ীতে মাকে নিয়ে থাকে। স্থাবর সম্পত্তিটি মার্টিনের নিজের একক নামে ক্রয়কৃত বিধায় খ্রিস্টান আইন অনুযায়ী মার্টিনের সম্পূর্ণ সম্পত্তির (এমনকি অস্থাবর সম্পত্তি) ওয়ারিশসূত্রে এক-তৃতীয়াংশের মালিক স্ত্রী, বাকী দুই-তৃতীয়াংশের মালিক সমানভাবে পাবে ১ ছেলে ও ২ মেয়ে। সম্পত্তি আইন অনুযায়ী কোন মৃত মানুষের নামে জমির খাজনা দেয়া যায় না। সাধারনত আমাদের সমাজে দেখা যায়, মৃতের স্ত্রী ও তাদের ৩ সন্তান নির্লিপ্তভাবে থাকছে। মাকে নিয়ে ছেলে বাবার বাড়ী ভোগ-দখল করছে। মেয়েরা আসে যায়, ভাই ও মায়ের সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক। একসময় সাংসারিক প্রয়োজনে ১০ কাঠা জমি বিক্রয়ের প্রয়োজন পড়ে। মা ও ছেলে মেয়েদের না জানিয়ে ঐ ১০ কাঠা বিক্রয় করতে যায়। তখন মেয়েরা বলে, আমরা বাবার বাড়ীর অংশ ধরবো না, লিখেও দিব না। মা সঙ্গত কারণে ছেলেকে তার সোয়া পাঁচআনি লিখে দেয় না বা মেয়েদেরও দেয় না। এভাবেই চলতে থাকে এবং অশান্তির বীজ ধীরে ধীরে অংকুরিত হতে থাকে। বছর দশেক পরে মার্টিনের স্ত্রীও মারা গেল, কিন্তু সম্পত্তির মালিকানার তখনও তার নামে রয়ে গেছে। এখনতো ঐ ৪০ কাঠা জমির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হবে, ১ ছেলে ও ২ মেয়ে, একেবারে সমান সমান। বলতে গেলে এরকম কাহিনী প্রায় প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারে। মেয়েরা সম্পত্তি নেয়ও না, দেয়ও না। কি এক অদ্ভুত মানসিকতা!

দাদা-দাদী, নানা-নানীর সম্পত্তির ওয়ারিশ নিয়ে তো আরও জটিলতা। একসময় দেখা যেত, এস.এ. বা আর.এস. রেকর্ড চলাকালীন সময়ে ভাইয়েরা বোনদের নাম বাদ দিয়েই রেকর্ড করে নিয়েছে। কিন্তু জানা নেই যে, উত্তরাধিকার কখনও তামাদি বা বাতিল হয় না। বোনেরা সব কিছু মেনে নিয়ে জীবন পার করেছে, কিন্তু ভাগ্নেরাতো আইন কানুন জেনে ফেলেছে। এক কাঠা জমি এখন পাঁচ লাখ টাকা। নানার বাড়ীর ৩ কাঠা জমি পেলে ১৫ লাখ টাকা পাওয়া যাবে। এতে যদি বিচার-আচার, মামলা-মোকদ্দমা করার জন্য ২/৪ লাখ টাকা খরচ করতে হয় তবে ক্ষতি কি? কিসের আবার আত্মীয়তা! খ্রিস্টান ভাইয়েরা যদি এগিয়ে না আসে, তবে বাধ্য হয়েই অন্য সম্প্রদায়ের সহায়তা নিতে হবে। এটাই কি আমাদের সমাজের বাস্তবতা নয়? অথচ মার্টিন কস্তা মারা যাওয়ার পর স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে আপোসে সম্পত্তি বন্টন করে নাম খারিজ করলে এতদূর যাওয়া লাগে না।

আমাদের খ্রিস্টান সমাজে, বিশেষভাবে

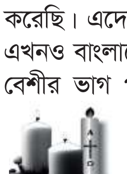

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

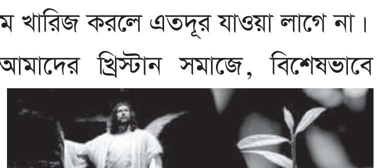

আঠারগ্রাম অঞ্চলের মানুষের স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা/সমস্যা অনেক পুরানো। আঠারগ্রামের দেশে এবং বিদেশে (বিশেষভাবে ভারতের বিভিন্ন এলাকায়) অবস্থানকারী পরিবারগুলোর আত্মীয়তার বন্ধন কেমন আছে সেটি কখনও কাগজে কলমে (প্রকাশ্যে) কেউ লিখেছেন বলে আমি দেখি নি। আঠারগ্রামের কিছু সংখ্যক মানুষ এখন পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ভারত-পাকিস্তান ভাগাভাগির পর কোলকাতা আর্চ ডায়োসিসের উদ্যোগে (বিশেষভাবে সেন্ট ট্রিজা প্যারিশের) কলকাতা শহরের নিকটবর্তী কয়েকটি এলাকায় পরিকল্পিতভাবে পূর্ব বাঙলার খ্রিস্টানদের আবাসনের/ পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা শুরু করে। এ এলাকাগুলো এখন স্বতন্ত্র ধর্মপল্লী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে দমদম, কাউরাপুকুর, ঠাকুরপুকুর, তাহেরপুর, হবিবপুর, কল্যাণপুর, সোনারপুর, বারইপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসাত, কল্যাণী, ব্যারাকপুর, ব্যান্ডেল প্যারিশ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দিল্লীর উপকণ্ঠে (এখন শহরের ভিতরে) লাজ্পীনগর ও সি.আর.পার্কে আমাদের আঠারগ্রাম ও ভাওয়াল অঞ্চলের অনেক পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এমন কি বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ শহরেও আনেক পরিবার বাস করে।

আমার দুঃখ হয়, যখন দেখি অত্যন্ত শিক্ষিত পরিবারের সদস্যরা পৈত্রিক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকেন এবং সমস্যা লালন করেন। আমার খুব কাছের একটি পরিবার। সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের বাবার ভিটায় কিছুই করছে না। আবার বাবার বোন পিশিরা দায়িত্ব নিয়ে বাবার ভিটা ও জমি যথেষ্ট পরিশ্রম করে ওয়ারিশগণের নামে নাম-খারিজ ও জমাভাগ/মিউটেশন করে বুঝে নিচ্ছেন, তখন তিনি নানারকম মন্তব্য করতে থাকলেন। তারপর যখন প্রবাসী পিশি গ্রামে এসে তার প্রাপ্য অংশ বিক্রয় করতে গেল, প্রথমে ভাই-এর ছেলেকে অফার দিল তাতে তিনি কোনরকম আগ্রহ দেখালেন না এবং কোন ভূমিকা রেখে সহযোগীতা করলেন না। আরেক পিশি তার বাবার ওয়ারিশ মোতাবেক তার অংশ আলাদা করে ছেলের সাহায্যে শূণ্য ভিটায় পাকা ঘর তুলে ফেলল। আর প্রবাসী পিশি তার অংশ একজন হিন্দু লোক, যে একসময় তাদের ঐতিহ্যবাহী পৈত্রিক বাড়ির পুরাতন ঘরে কেয়ার টেকার হিসেবে ২৫/৩০ বছর সপরিবারে বসবাস করে ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছে। অবশেষে দূর থেকে আসা সেই হিন্দু লোকের কাছে তার অংশ বিক্রি করে টাকা নিয়ে চলে গেল। তারপর সেই হিন্দু লোক তার ক্রয়কৃত অংশে মাটি তুলে ভিটা বেঁধে সুন্দর ঘর তুলে বাড়ি বানিয়েছে। তারা খ্রিস্টান পাড়ায় পরিবার পরিজন নিয়ে স্থায়ী হয়েছে। এখন সেই বিখ্যাত বাড়ির নাম বদলে কি নমঃ বাড়ি হবে না!এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে!!

আমার বলতে লজ্জা নেই, আমার ঘনিষ্ট উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সদস্যদের তাদের পৈত্রিক ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত বাড়ির অংশের সুষ্ঠু বন্টন ও ঘর নির্মাণের স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েও সফল হতে পারিনি। বৃটিশ আমলে জন্ম নেয়া পরিবারের ৬ পুত্র সন্তানের পাঁচ জনই ভারতের নাগরিক হয়ে যায় এবং আর এস পর্চায় তাদের নামের পাশে হাল সাং ভারত, বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত দেখানো হয়। ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে থেকে যাওয়া এক পুত্র ও তাঁর সন্তানেরা ঐ সম্পত্তিটি লীজ না নেয়ার কারণে "খ" তফসিল খতিয়ান ভুক্ত হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। ফলে তেমন কোন বড় ঝামেলা ছাড়াই সেই সম্পত্তিটি উক্ত ব্যক্তির তিন মেয়ে ও দুই ছেলের নামে সমান ভাগে রেকর্ড করিয়ে, নাম-খারিজ ও খাজনা পরিশোধ করে শুদ্ধ করা হয়েছে। এক কন্যা অবিবাহিত, বাকী দুই ছেলে ও দুই মেয়ে বিবাহিত। তাদের ঘরে মোট আটজন ছেলে-মেয়ে। একছেলে আমেরিকা প্রবাসী, তার স্ত্রী ও দুইটি মেয়ে। বাড়ির ভাই-বোন ও তাদের সন্তানদের মধ্যে খুবই ভাল সম্পর্ক। অবিবাহিত বড় বোন মা-বাবার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ভাইয়ের সংসার সামলিয়েছেন। পৈত্রিক জোড়া সেমি-পাকা ঘরে থেকেছে। একসময় প্রয়োজন হলো একটি আলাদা ঘরের। বড় দিদি তার নিজস্ব অর্থে একটি ছোট পাকা দালান/ঘর তৈরীর উদ্যোগ নিলেন এবং গ্রামের একজন ভাইতুল্য লোকের সাথে পরামর্শ করে নিজেরাই তাদের প্ল্যান মাফিক বিল্ডিং নির্মাণ শুরু করলেন। পৈত্রিক ঘরের সামনে বড় উঠান এর দক্ষিণে। ভাইবোন এবং আমার পরামর্শ আমলে নিলেন না। বিল্ডিং হলো উত্তরমুখী, বিল্ডিং এর পশ্চিম ও দক্ষিণে যেটুকু জায়গা ফাঁকা থাকলো তা কোন ভাল কাজে আসবে না এবং ভাই-বোনরা যদি সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে কিছু করতে চায় তবে সমস্যা হবে। এভাবে উঠান ছোট হয়ে গেল, বাড়িতে ওঠার সিঁড়িও মাঝখানে পড়ল।

বড় ছেলে ভাবল তাকেও আলাদা ঘর নির্মাণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত হলো পিতার বানানো লম্বা জোড়া ঘর ভেঙ্গে সেখানেই বড় করে বিল্ডিং করবে। সেও ভাই-বোনদের সাথে আলোচনা না করে পুরাতন ঘর বিক্রি করে দিল। তারপর তিন তলার ফাউন্ডেশন দিয়ে গ্রামের মধ্যে বেশ বড়সড় করে বিল্ডিং নির্মাণ করল। আমেরিকা প্রবাসী ভাই এর কোন ভূমিকা নেই, বোনদেরও মাথা ব্যথা নেই। তবে মনে মনে দুঃখ ও ক্ষোভ জন্ম নিল। শুরু হতে থাকলো দূরত্ব। আমার কোন সুযোগ থাকলো না- ভবিষ্যৎ বাস্তবতা বুঝানোর। ষাট শতাংশের বাড়ি, নাম-খারিজ মোতাবেক পাঁচ ভাইবোনে প্রত্যেকে ১২ শতাংশের মালিক। দুই বোন, এক ভাই নির্লিপ্ত! আরো কিছু বিষয় নিয়ে ভাই- বোনদের মাঝে সম্পর্ক শিথিল হতে থাকলো। আমার পরিবারকেও আমি বোঝাতে চেয়েছি, পৈত্রিক সম্পত্তির সুষ্ঠু বন্টন করতে, কেউ চাইলে নিজেদের মধ্যে দান করে দিতে। কিন্তু তাদেরকে আমি বোঝাতে পারিনি। আজ থেকে ৯/১০ বছর আগে একদিন হঠাৎ করে সংবাদ পেলাম হার্ট এ্যাটাকে বড় ছেলে মৃত্যুবরণ করেছে, স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে। আর রেখে গেল অনেক প্রশ্ন এবং পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন লাখ টাকার একটি আলিশান বিল্ডিং। এরপর বড় দিদিও নানা কারণে অসুস্থ হতে থাকলো, মাঝে মাঝেই লম্বা সময়ের জন্য ঢাকায় থাকেন। গ্রামের বাড়ি বিল্ডিং খালি। সময় সময় বাড়িতে কেউ থাকে না।

অবশেষে বড় দিদিও পৃথিবীর মায়া ছেড়ে বছর খানেক আগে পরমেশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন। এখন জটিলতা আরো বাড়লো। তিনি অবিবাহিত থাকায় তার সম্পত্তির মালিক হবে বড় ভাইয়ের তিন সন্তান এবং জীবিত দুই বোন ও আমেরিকা প্রবাসী ভাই। বড় ভাইয়ের বড় ছেলে আবার কাউকে না বলেই বাড়ির দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাউন্ডারী দেয়াল করে বাইরে গেইট লাগিয়েছে।

আপাতত সর্বশেষ আরেকটি বাস্তব ঘটনা সহভাগিতা করছি তা হলো বাড়ীর জেঠাতো বোন তার ১০ শতাংশ অংশ বিক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করলে বিদেশে বসবাসরত কাকাতো বোন সেই অংশ ক্রয় করার জন্য ছোট ভাইয়ের কাছে টাকা পাঠিয়েছে এবং জেঠাতো বোনের অংশ রেজিস্ট্রি হয়েছে কিন্তু ছোট ভাইয়ের নামে। এখন জমির বর্তমান দাম প্রায় এক শতাংশ তিন লক্ষ টাকা। এখন ছোট ভাই পুরোপুরী অস্বীকার করে যে তার বড় বোনের টাকা দিয়ে এই জমি ক্রয় করা হয় নাই এবং জমিটি ছোট ভাই নিজেই তার নামে খারিজ করে বহাল তবিয়তে দখলে আছে। আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক এখন ভয়ংকর রকম শিথিল। এটাই হলো বর্তমান বাস্তবতা। সম্ভবতঃ ওয়ারিশনে সম্পর্কের কারণেই আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক/বন্ধন অনেকাংশে শিথিল। ❑

কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

চয়ন হিউবার্ট রিবেরু

মণ্ডলী মানুষ ও জগত সম্বন্ধে নানা বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকে। সামাজিক বিষয় তার মধ্যে একটি। তবে মনে রাখতে হবে যে, এটি মানব জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ ও জগত সম্বন্ধে মণ্ডলীর শিক্ষা 'মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা' বলে অভিহিত।

কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার মূল নীতি

১. মানবিক মর্যাদা - প্রতিটি ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি এবং এর অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। এই নীতিটি সমস্ত CST-এর ভিত্তি।

২. সাধারণ কল্যাণ - সমাজকে এমনভাবে সংগঠিত করা উচিত যাতে সমস্ত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে।

৩. সংহতি - আমরা সকলেই একটি মানব পরিবারের অংশ, এবং আমাদের অবশ্যই একে অপরের সাথে দাঁড়াতে হবে এবং সমর্থন করতে হবে, বিশেষ করে দরিদ্র এবং প্রান্তিকদের।

৪. সহায়কতা - সিদ্ধান্তগুলো যতটা সম্ভব স্থানীয় পর্যায়ে নেওয়া উচিত, নিশ্চিত করা উচিত যে কোনও সমস্যার সবচেয়ে কাছের ব্যক্তিরা এটি মোকাবেলায় তাদের বক্তব্য রাখতে পারে।

৫. দরিদ্রদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বিকল্প - সমাজকে দরিদ্র এবং দুর্বলদের চাহিদাগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬. কাজের মর্যাদা এবং শ্রমিকদের অধিকার - কাজ হল ঈশ্বরের সৃষ্টিতে অংশগ্রহণের এক রূপ, এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ পরিবেশ এবং সম্মিলিত দর কষাকষির অধিকার রয়েছে।

৭. সৃষ্টির তত্ত্বাবধান - ঈশ্বরের সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পরিবেশের যত্ন নেওয়ার জন্য আমাদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

৮. শান্তি ও ন্যায়বিচার - একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ সংঘাতের মূল কারণগুলো মোকাবেলা করে এবং পুনর্মিলনবোধ জাগ্রত করে শান্তিকে উৎসাহিত করে।

উৎপত্তি এবং উন্নয়ন

কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা সময়ের সাথে সাথে পোপ এনসাইক্লিক্যাল, গির্জা কাউন্সিল এবং বিশপদের বিবৃতির মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলোর মধ্যে একটি হল পোপ লিও দ্বাদশের রেরোম নোভারাম (১৮৯১), (Rerum Novarum) যেখানে শ্রম অধিকার এবং শিল্প পুঁজিবাদের উত্থানকে সম্বোধন করা হয়েছে।

পোপের এনসাইক্লিক্যাল চিঠির নাম

এনসাইক্লিক্যাল চিঠিগুলো হল পোপের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা, যা সাধারণত নৈতিক, সামাজিক বা মতবাদ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সম্বোধন করে। এখানে কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ এনসাইক্লিক্যাল উল্লেখ করা হ'ল:

মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার উপর প্রধান এনসাইক্লিক্যাল

১. রেরোম নোভারাম (১৮৯১) Rerum Novarum - পোপ লিও দ্বাদশ: শ্রমিকদের অধিকার, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং শ্রমের মর্যাদাকে সম্বোধন করে প্রথম প্রধান সামাজিক এনসাইক্লিক্যাল। পোপ এয়োদশ লিও কর্তৃক প্রকাশিত Rerum Novarum নামক সার্বজনীন পত্রটিকে সূচনা হিসাবে ধরে নিয়ে মণ্ডলীর শিক্ষায় সামাজিক প্রশ্নটি বারবার আলোচিত হয়েছে, আর বিভিন্ন সময়ে সেই প্রথম দলিলটির বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক দলিল প্রকাশ পেয়েছে।

২. কোয়াড্রেজিমিও অ্যান্নো (১৯৩১) Quadragesimo Anno - পোপ পিউস একাদশ: রেরোম নোভারামের ৪০ বছর পর লেখা, এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করে এবং সহায়কতার নীতি প্রবর্তন করে।

৩. মাতের এদ ম্যাজিস্ট্রা (১৯৬১)- Mater et Magistra - পোপ জন XXIII: সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দরিদ্রদের যত্ন নেওয়ার জন্য সরকারের দায়িত্বের উপর আলোকপাত করে।

৪. পাচেম ইন টেরিস (১৯৬৩) Pacem in Terris - পোপ জন XXIII: শান্তি, মানবাধিকার এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর সম্বোধন করে।

৫. Gaudium et Spes (Church in the Modern World-১৯৬৫): পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন ভাতিকান মহাসভায় মণ্ডলীর জানালা উন্মুক্ত করে মণ্ডলীর মধ্যে নব প্রাণবায়ু প্রবেশ করিয়েছেন। তিনি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে "বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী" নামক পালকীয় সংবিধান যার লাতিন নাম Gaudium et Spes (Church in the Modern World) প্রকাশ করেন। এই দলিলটিই হচ্ছে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার- পরম্পরার দলিল। এই দলিলের কেন্দ্রিয় বিষয় ছিল মানবব্যক্তি। মানবিক মর্যাদা, মানব সমাজ, জগতের কর্মীসমাজ, জগতের মাঝে মণ্ডলী, ইত্যাদি বিষয়গুলো এই দলিলের আলোচনায় বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে যুগলক্ষণ ও সময়ের দাবী বিচার বিবেচনায় রেখে মণ্ডলী সামাজিক শিক্ষার উপর বিভিন্ন পালকীয় পত্র রচনা করে চলেছেন।

৬. পপুলোরাম প্রোগ্রেসিও (১৯৬৭) Populorum Progressio- পোপ পল ষষ্ঠ: অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, আন্তর্জাতিক সংহতি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকারের উপর জোর দেন।

৭. ল্যাবোরেম এক্সরসেন্স (১৯৮১) Laborem Exercens- পোপ জন পল দ্বিতীয়: কাজের মর্যাদা এবং শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেন।

৮. সেন্টেসিমাস অ্যান্নুস (১৯৯১) Centesimus Annus- পোপ জন পল দ্বিতীয়: রেরোম নোভারামের ১০০ বছরের প্রতিফলন এবং আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন করেন।

৯. কারিতাস ইন ভেরিটেট (২০০৯) Deus Caritas Est- পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শ: প্রেম, সত্য এবং নীতিগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

১০. লাউদাতো সি (২০১৫) Laudato Si' - পোপ ফ্রান্সিস: পরিবেশগত সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সৃষ্টির প্রতি যত্নশীলতার উপর আলোকপাত করেন।

১১. ফ্রাতেল্লী তুত্তি (২০২০) Fratelli Tutti- পোপ ফ্রান্সিস: ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক বন্ধুত্ব এবং আরও ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করেন।

তাই বলা যায়, একদিকে ব্যক্তি এবং অন্যদিকে সমাজ এই দুটো বিষয় নিয়ে মাণ্ডলিক চিন্তা-

ধ্যান ও শিক্ষাই মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার মূল কথা। মানবব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার হচ্ছে কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম নীতি। মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষায় খ্রিস্ট-ভক্তজনগণকেই শিক্ষিত হবে হবে বেশী। কারণ সামাজিক বিষয়সমূহের সঙ্গে ভক্তজনগণ সরাসরি জড়িত, সামাজিক বিষয়গুলোই তাদের আপন কর্মক্ষেত্র, যেখানে তারা যিশুকে অনুসরণ করেন 'সত্য, পথ ও জীবন' হিসাবে।

AI সম্পর্কে CST কী বলে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সংক্রান্ত কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা (CST) চার্চের মধ্যে একটি উদীয়মান আলোচনা, যা মানব মর্যাদা, সাধারণ কল্যাণ, সংহতি এবং নৈতিক দায়িত্বের মতো মূল CST নীতিগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরি। যদিও কোনও নির্দিষ্ট পোপের এনসাইক্লিকাল কেবল AI-এর জন্য নিবেদিত হয়নি, "রোম কল ফর AI এথিক্স" (২০২০) সহ ভ্যাটিকান সাম্প্রতিক বিবৃতিগুলো AI-এর নৈতিক বিকাশ এবং ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করে।

AI-তে প্রয়োগযোগ্য CST নীতি

১. মানব মর্যাদা: AI-কে সর্বদা মানব মর্যাদাকে সম্মান করতে হবে এবং কখনও মানব জীবনের মূল্য প্রতিস্থাপন বা হ্রাস করতে হবে না। মানুষকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত (যেমন, নিয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা, ন্যায়বিচার) কেবল AI-এর উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

২. সাধারণ কল্যাণ: AI-কে শুধুমাত্র সুবিধাপ্রাপ্ত কয়েকজনের জন্য নয়, সকল মানুষের সেবা করার জন্য তৈরি করা উচিত। অটোমেশন এবং চিকিৎসা অগ্রগতির মতো এর সুবিধাগুলো সকলের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য হতে হবে।

৩. সংহতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার: AI-এর মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করা উচিত নয় বা কর্মীদের অর্থনৈতিক সহায়তা ছাড়াই চাকরি হারানো উচিত নয়। AI-কে অবশ্যই দরিদ্রদের বৈষম্য, পক্ষপাত এবং শোষণ রোধ করতে হবে।

৪. সহায়ক সংস্থা: AI-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া উচিত, যাতে স্থানীয় সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করতে পারেন। AI-এর শাসনব্যবস্থা তত্ত্বাবধান ছাড়াই কয়েকটি কর্পোরেশন বা সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

৫. দরিদ্রদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বিকল্প: AI-এর উচিত প্রান্তিক সম্প্রদায়ের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, তাদের অধিকার এবং সুযোগ নিশ্চিত করা। চার্চ ডিজিটাল বিভাজন বা অর্থনৈতিক অবিচারকে শক্তিশালী করে এমন AI সিস্টেমের বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

৬. লাভের চেয়ে নীতিশাস্ত্র: AI-কে নৈতিক দায়িত্ব দিয়ে ডিজাইন করা উচিত, অর্থনৈতিক লাভের চেয়ে নীতিশাস্ত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। পোপ ফ্রান্সিস AI-চালিত নজরদারি, গোপনীয়তার ক্ষতি এবং মানব তথ্যের পণ্যকরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন।

৭. সৃষ্টির তত্ত্বাবধান: পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সৃষ্টির ক্ষতি হ্রাস করার মতো ক্ষেত্রে AI-কে দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

AI-এর উপর চার্চের নথি

"ROME Call for AI Ethics" (২০২০): AI-তে স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তি এবং জবাবদিহিতার উপর জোর দিয়ে একটি ভ্যাটিকান নথি।

"ফ্রাতেল্লী তুত্তি" (২০২০): পোপ ফ্রান্সিস AI-তে ডিজিটাল কারসাজি, ভুল তথ্য এবং নীতিগত উদ্বেগের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

AI নীতিশাস্ত্রের উপর ভ্যাটিকান সম্মেলন: AI-এর নৈতিক প্রভাব নিয়ে গির্জা নেতা, বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে আলোচনা চলমান রাখা।

পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে, তারা যেন নিশ্চিত করেন যে AI বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য এবং অন্যায্যতা তৈরী না করে। পোপ ফ্রান্সিস AI-এর বিকাশকে নির্দেশিত করার জন্য বিচক্ষণতা এবং সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন যাতে এটি প্রতিটি জাতি, ভাষা এবং জাতির মানুষের জন্য স্বাধীনতা এবং পরিপূর্ণতা প্রচার করে। *(২৯ জানুয়ারি, ২০২৪)*

কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সর্বপ্রধান নীতি হল মানব মর্যাদা ও অধিকার এ বিষয়ে থেকে যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ, ব্যবহার ব্যয় না হয় বরং তা যেন মানব মর্যাদা, অধিকার, কল্যাণে এবং অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কাজ করে এবং মণ্ডলীর শিক্ষার আলোকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হউক- এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

সূত্র:

- মণ্ডলীর সামাজিক ধর্মশিক্ষার সারসংক্ষেপ (পোপীয় ন্যায় ও শান্তি পরিষদ)
- পোপীয় সর্বজনীন পত্রসমূহ
- সিডিআই- ডিপ্লোমা কোর্সের হ্যান্ড আউট
- ইন্টারনেট

যিশু বাউলের কবিতা
আশার তীর্থযাত্রী

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা

আশার তীর্থযাত্রী আমরা
যিশু ধ্যাণের আনন্দ লয়ে
পথ চলি সাহসী মনে
শ্রীযিশুর প্রশংসা গানে।

আশা-আনন্দ ত্যাগ তিতীক্ষার
সাধন ব্রতে, আমাদের এগিয়ে চলে
শ্রীযিশুর আদর্শ অনুকরণে
প্রেম সেবার মহান কাজে অংশগ্রহণে।

প্রদীপ্ত জ্যোর্তিময় আলোতে
আমাদের পথ চলা স্রষ্টার গুণকীর্তনে
দেয়া- নেওয়া সহভাগিতার জীবনে
আমাদের প্রচেষ্টা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে।

সাহস আর উৎফুল্ল চিত্তে
আমরা গাঁথি প্রেমের মালা
যিশু প্রেমের অনুসরণে
পথ চলার আনন্দ সহভাগিতার জীবনে।

প্রেম প্রীতির আনন্দ সংকীর্তনে
আশার তরী ভাসাই জীবন সেবাময় জীবনে
যিশু নামের গৌরব কীর্তন
যাপিত জীবনের যাত্রা আশার তীর্থযাত্রী বেয়ে।।

যাত্রী

উইলিয়াম রনি গমেজ

অনেকটা পথ চলে এসেছি
হয়তো বাকিটুকু পথও চলে যাবো
তবুও শঙ্কিত মনে প্রশ্ন জাগে
কোথা থেকে এসেছি
আর কত দূর যাবো .....।।
আমি তো অহর্নিশ ঘুরে বেড়াই
নিজস্ব স্বাধীনতায়
এ পথ থেকে ও পথে
কখনো কখনো অচেনার ওপারে
তেপান্তরের মাঠে।।
কত বন্ধুর পথ
অবলীলায় একলা চলে যাই
বীরত্বের সাথে পাড়ি দেই
ভয়ংকর কোন নদীর উত্তাল মোহনা
মহাকালের এ যাত্রায়
আমি তো ক্ষুদ্র এক পথযাত্রী
পুনরুত্থিত খ্রিস্টরাজের
অপার মহিমা হৃদয়ে
তাই তো মৃত্যুকে উপেক্ষা করে
ক্রমশ নির্ভয়ে এগিয়ে যাই সম্মুখে ....।।

দক্ষতার ঘাটতি পূরণে প্রযুক্তিনির্ভর কারিগরি শিক্ষার নব দিগন্ত

জেমস্ গোমেজ

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রযুক্তি একটুও থেমে নেই; যে কাজ করতে এক সময় পুরো দিন লেগে যেত এখন তা শেষ হচ্ছে মিনিটে। দৈনন্দিন জীবনে শিল্প বাণিজ্য থেকে শুরু করে কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমন এক সময় আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে, যেখানে দক্ষতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আর তাই দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তারপরও অনেক উন্নয়নশীল দেশ বিশেষত আমাদের দেশে এখনো দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে পুরনো কাঠামোয় আবদ্ধ। তাত্ত্বিক জ্ঞানে পূর্ণ কিন্তু ব্যবহারিক দক্ষতায় অপূর্ণ এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার পরও বাস্তব কর্মজীবনে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে কারিগরি শিক্ষা যেন নব দিগন্তের উন্মোষ। এটি শুধু শিক্ষার একটি বিকল্প পথ নয় বরং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য এক চালিকা শক্তি।

তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ তরুণ কর্মবাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতে, এদের একটি বড় অংশ চাকরির জন্য যোগ্য নয়; শুধুমাত্র দক্ষতার অভাবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনের পরও যখন তরুণরা হাতে কলমে কিছু জানেন না, তখন সে ডিগ্রির মূল্য অনেকাংশেই কমে যায়। শুধুমাত্র সার্টিফিকেট নয়, প্রয়োজন দক্ষতা- যা কর্মজীবনে বাস্তব চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে।

দক্ষতার ঘাটতি পূরণে কারিগরি শিক্ষা সম্ভাবনার আলো হিসেবে কাজ করে। কারণ কারিগরি শিক্ষা হলো জ্ঞান আর প্রয়োগের সেতুবন্ধন। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শিখে এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান করতে পারে; আর এটিই হলো কারিগরি শিক্ষার মুখ্য পাঠ্য বিষয়। উন্নয়নের সংকট কাটিয়ে ওঠার অন্যতম উপায় হলো কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও আধুনিকায়ন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পেশায় বা কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং দ্রুত কর্মসংস্থানের উপযোগী হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাপী যেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হয়েছে তারা প্রত্যেকেই কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশেও গুরুত্বের সাথে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেই এ শিক্ষাকে মূল শিক্ষার ধারায় রূপ দেওয়া হয়েছে। জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া কিংবা চীন প্রত্যেকেই তাদের টেকনিক্যাল ম্যানপাওয়ারের জোরেই আজ ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশেও রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। প্রয়োজন শুধু সময়োপযোগী রূপান্তরের।

কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে সমাজে এক ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত আছে; অনেকে মনে করেন এটি মূলধারার শিক্ষার থেকে নিচু মানের। অথচ বাস্তবতা হলো একজন দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই অন্যদের তুলনায় আয় করতে পারেন। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে প্রচার কিংবা ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এবং বিভিন্ন সফল ব্যক্তিদের জীবনের গল্প তুলে ধরা যেতে পারে। আমাদের মানসিকতা বদলাতে হবে। সরকার, গণমাধ্যম ও পরিবার সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে এমন এক সমাজ যেখানে দক্ষতা এবং মেধাকে সমানভাবে সম্মান করা হয়।

প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের পথে এগোতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। দক্ষতার ঘাটতি পূরণে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা হলো অন্যতম প্রধান মাধ্যম। তবে এই ব্যবস্থাকে কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক করতে হলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রযুক্তি সংহতকরণ এবং শিল্পের সঙ্গে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি সমাজে কারিগরি শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজন। সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই গড়ে উঠতে পারে দক্ষ, প্রযুক্তি সক্ষম ও আত্মনির্ভর একটি দেশ।

বর্তমান বাস্তবতায় শুধু কারিগরি শিক্ষা দিলেই হবে না, তাকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। পৃথিবী এখন অটোমেশন, রোবোটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের যুগে প্রবেশ করেছে। অথচ আমাদের অধিকাংশ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনও সেসব আধুনিক সরঞ্জামের ছোঁয়া লাগেনি। এই খাতে প্রয়োজন ডিজিটাল ল্যাব, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ও ইন্টারেক্টিভ টুলস এবং ইন্ডাস্ট্রি বেইজড স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা শুধু চাকরি খোঁজার মানুষ নয় বরং সৃষ্টিশীল উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে পারে। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে দক্ষতা তৈরি সম্ভব নয় যদি না তার সাথে শিল্পখাতের যোগাযোগ থাকে। প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কাজ শেখার সুযোগ। এ জন্য ইন্ডাস্ট্রি ও ইনস্টিটিউটের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

এখন সময় এসেছে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডিজিটাল সরঞ্জামের সংহতকরণ যেমন- স্মার্ট ল্যাব, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, ইন্ডাস্ট্রি ভিত্তিক প্রযুক্তি (অটোমেশন, মেশিন লার্নিং) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের। এছাড়াও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে শিক্ষার্থীরা আরও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। তবে শুধুমাত্র ক্লাসরুমের শিক্ষা যথেষ্ট নয়। শিল্প খাতের বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের শেখার জগতকে আরও প্রসারিত করে, ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাই প্রয়োজন শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে সেতুবন্ধন। এক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রির সাথে যৌথ কারিকুলাম তৈরি, ইন্টার্নশিপ ও অ্যাপ্রেনটিশিপ প্রোগ্রাম

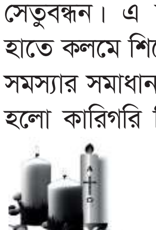

বাধ্যতামূলক করা এবং শিল্পখাতের বিশেষজ্ঞদের পাঠদানে অন্তর্ভুক্ত করা। শিক্ষা যেন শিল্পের প্রতিফলন হয় আর শিল্প যেন শিক্ষার সহচর হয়। আর এভাবেই শিল্প ও শিক্ষার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে আমরা দক্ষতার ঘাটতি দূর করতে পারব।

মটস্ কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাতে কলমে শিক্ষারত শিক্ষার্থীরা

অগ্রযাত্রার আশার আলো হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ভূমিকা রাখছে। কারণ সরকার ইতোমধ্যেই কারিগরি শিক্ষা বিস্তারে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে যেমন- National Skills Development Authority (NSDA) গঠন ও Skills for Employment Investment Program (SEIP) এর মতো প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া বেসরকারি খাতেও অনেক প্রতিষ্ঠান দক্ষতা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে আসছে। তবে এগুলো যেন শহরভিত্তিক না হয়ে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌঁছায় সেটিই আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ। তাই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নতুন নতুন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করতে হবে।

কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শুধু শিক্ষার্থী নয় শিক্ষকদেরও হতে হবে পরিবর্তনের অংশীদার। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রশিক্ষকরা আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নন। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তি যুক্ত হলেও তার কার্যকারিতা পুরোপুরি আসছে না। এখানে প্রয়োজন নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম, যেন শিক্ষকরা নিজেরাও প্রযুক্তিসম্পৃক্ত হয়ে উঠতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশে প্রতি বছর লাখো তরুণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। কিন্তু এই শিক্ষা কতটা জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ভেবে দেখা দরকার। অনেক সময় দেখা যায়, একজন স্নাতক ডিগ্রিধারী জীবিকার প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত- হাতে কোনো বাস্তব দক্ষতা নেই, কাজের অভিজ্ঞতা নেই, আছে শুধু সার্টিফিকেট। বাংলাদেশের যুবশক্তি বিশাল এক সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে আমাদের প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা, প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ। আমাদের একসাথে কাজ করে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে এমন এক প্রজন্ম, যারা কেবল কর্মজীবী নয় বরং সৃষ্টিশীল, নৈতিক এবং ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা বিকাশে সক্ষম এক জাতি। নিজেদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্ম স্থায়িত্বশীল, টেকসই, নির্ভরযোগ্য কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে পারে।

স্বপ্ন দেখার সময় এখনই। দক্ষতার ঘাটতি শুধু একটি শিক্ষাগত সমস্যা নয়; এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু এই ঘাটতিকে শক্তিতে রূপান্তর করার সুযোগও আমাদের হাতেই। যদি আমরা এখনই শিক্ষার রূপ বদলে দেই, কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেই, প্রযুক্তিকে হাতিয়ার বানাই এবং সমাজে দক্ষতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করি, তাহলে এই দেশ একদিন হয়ে উঠবে দক্ষ জনশক্তির কেন্দ্রবিন্দু। এখনই সময় সার্টিফিকেট শিক্ষা থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষায় পা রাখার। কারণ ভবিষ্যতের লড়াই হবে জ্ঞান নয় দক্ষতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি ব্যক্তিদেরকে নিয়ে।

কাজের মাধ্যমে সম্মান অর্জনের পথ কারিগরি শিক্ষা। কারিগরি শিক্ষার সৌন্দর্য হলো এটি মানুষকে কাজের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা শেখায়। একজন দক্ষ প্লাম্বার, বৈদ্যুতিক কারিগর কিংবা প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত একজন ব্যক্তি নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, পরিবারকে সহায়তা করতে পারে এবং সমাজের বোঝা নয় বরং ভরসা হয়ে উঠতে পারে। প্রভু যিশু নিজেই ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রির পুত্র, তাঁর শৈশব কেটেছে কারিগরি কাজের ঘ্রাণে। সুতরাং, আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসেও ‘হাতের কাজ’ কখনো ছোট বা গৌণ নয়। বরং এটি ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের একটি উপায়।

প্রতিভা ঈশ্বরের দেওয়া উপহার আর দক্ষতা মানুষের দায়িত্ব- এই কথাটি বর্তমান সময়ের জন্য চরম প্রাসঙ্গিক। একদিকে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের হাহাকার- এই দ্বৈরথের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা একটি জাতি হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি। বিশেষ করে তরুণদের ভবিষ্যৎ, যাদের কাঁধে সমাজ, পরিবার এমনকি ঈশ্বরের পক্ষ থেকেও দায়িত্ব অর্পিত, তাদের জন্য সময় এসেছে নতুন করে ভাববার। শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান নয়, প্রয়োজন জীবনমুখী ও ব্যবহারিক দক্ষতা। আর এই প্রয়োজন পূরণে যে পথটি আমাদের সামনে খোলা তা হলো কারিগরি ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা।

পবিত্র বাইবেল আমাদের শেখায়, “যে হাতের কাজ জানে, সে রাজাদের সেবায় নিযুক্ত হবে” *(নীতি বাক্য ২২:২৯)*। কাজেই দক্ষতা কেবল জীবিকার প্রয়োজন নয়, বরং এটি খ্রিস্টীয় দায়িত্বের অংশ। যিশু আমাদের শিখিয়েছেন, সেবাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। একজন দক্ষ পেশাজীবী যখন সৎভাবে কাজ করেন তখন তিনি সমাজে আলোর মতো বিচ্ছুরিত হন। কারিগরি শিক্ষা সেই সেবার পথ প্রশস্ত করে। আমাদের নতুন প্রজন্ম যেন নিজের কর্মজীবনে খ্রিস্টেও মতো নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ও সেবাপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে, সেদিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ❑

প্রভু যিশুর নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা.....

হেলেন রোজারিও

"যেরুশালেমের কন্যাগণ
তোমরা আমার জন্য রোদন করিও না-
বরং নিজেদের ও নিজ নিজ সন্তানদের জন্য রোদন কর।"

প্রভু যিশুর এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা দেখিয়েছেন। পবিত্র ক্রুশের পথে অষ্টম স্থানে এসে দেখতে পাই, যিশুর দুঃখভোগের যন্ত্রণা দেখে যেরুশালেমের কয়েকজন নারীর বিলাপ ও ক্রন্দন। মানব মুক্তির জন্য যিশুর যে দুঃখ বেদনা এখানে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। যিশু মানব জাতিকে পাপ হ'তে উদ্ধার করার জন্যই তো এই ক্রুশের যাতনা। প্রতিবার ক্রুশের পথে চলার সাথে সাথে এই দৃশ্যগুলো অন্তর দিয়ে গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

তারপর প্রভু যিশু নারীদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ভালবাসা দেখিয়েছেন তার জ্বলন্ত নিদর্শন এই অষ্টম স্থানটিতে। প্রভু যিশু নারীকে মাতৃরূপে, ভগ্নিরূপে দেখেছেন। নারী মা, নারী বোন, নারী স্ত্রী তাদের সম্মান মর্যাদা যুগে যুগে। নারীর প্রতি ভালবাসা, মর্যাদা স্বর্গীয় ও ঐশ-আশীর্বাদের। আমরা চতুর্থ স্থানে দেখি পুত্রের মুখ শেষবার দেখার আশায় স্নেহময়ী জননী রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে। পুত্রের কষ্টে তিনি ক্রন্দনরতা, ব্যথিতা- তাঁর কষ্ট আমরা মায়েরা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারি। মা ও সন্তান যিশু এই দুই হৃদয়ের ব্যথার কথা কেউই বর্ণনা করতে পারি না। শুধু 'মা' ই হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে। এই চতুর্থ স্থানে।

সমাজে নারীর মর্যাদা কতটুকু? নারী জাতি পথে ঘাটে, ঘরে সংসারে অবহেলিত। নির্যাতন নিপীড়ন তাদের প্রতিটি পদে পদে। মাতা হয়ে, বধু হয়ে, কন্যা হয়ে তাদের অমর্যাদা অসম্মান পদে পদে। অথচ নারী সংসারের, পরিবারের মস্তক-স্বরূপা। নারীর দু'টি হাত পরিবারে, সংসারে, কর্মক্ষেত্রে দশভূজার কাজ করে। ঘরের লক্ষ্মী নারী। মাতা হয়ে, বধু হয়ে দু'হাতে সংসার পরিবার রক্ষা করে। শতকষ্টেও নিজেকে সমুন্নত রাখে। মা বাবাকে নিয়েই নাজারেথে ছিল যিশুর পবিত্র পরিবার। মায়ের আদর, স্নেহ ও যত্নে বড় হয়েছিল। তাইতো তিনি মাকে তথা সমস্ত নারী জাতিকে ভালবাসা ও সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। অষ্টম স্থানে আমরা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসার সেই নিদর্শনই দেখতে পাই। যিশুতো নিজেই ভালবাসা-তাই তাঁর ভালবাসার আদি-অন্ত নাই। ক্রুশে প্রাণ দিয়ে তিনি মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও প্রেমের নিদর্শন রেখে গেছেন। মুক্তিদাতা প্রভু যিশু যেমন তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রেম ভালবাসার নিদর্শন রেখে গেছেন-আমরাও যেন সেইভাবে পরস্পর-পরস্পরকে প্রেম, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদায় জীবন-যাপন করতে পারি। আর যেখানে ক্ষমা, ভালবাসা সেখানেই শান্তি। প্রায়শ্চিত্তকালে ক্ষমা ও ভালবাসার চর্চা করে হিংসা, বিদ্বেষ, নির্যাতন, নিপীড়ন কমানোর চেষ্টা করেছি। যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে এখন মর্যাদা ও শ্রদ্ধার অনুশীলন করি। ৯

সাদা-কালো জীবন-১২

মালা রিবেরু

আজ সকালে কবিতা যখন শাশুড়ীর মলমূত্র পরিষ্কার করে শোয়ার ঘরে এসে শাশুড়ীর মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলো, তখন হঠাৎ করেই ১৫ বছর পূর্বের বিয়ের পরের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। কবিতার শাশুড়ীই তাকে পছন্দ করে ছেলের জন্য নিয়ে এসেছিলো। কবিতার স্বামী ছিলো ছয় ভাইয়ের মধ্য সবার ছোট, কবিতার বিয়ের পরে সবাই আলাদা হয়ে যায়। কবিতার স্বামী মাকে নিয়ে তাদের সংসার আলাদাভাবে শুরু করে। অন্যভাইয়ের স্ত্রীরা শাশুড়ীর যত্ন বা খোঁজ খবর না নিলেও কবিতা তার সর্বস্ব দিয়ে স্বামী ও শাশুড়ীকে যত্ন করে।

কিন্তু দুইটা মানুষ ছিলো দুই প্রকৃতির, স্বামী কাজের পরে পরোপকার ও মদ নিয়ে ব্যস্ত, বউয়ের যে কোন শখ, আহ্লাদ বা কাছে পাওয়ার চাহিদা তা কখনও চিন্তায় ছিলোনা। আর শাশুড়ীকে যতই আদর, ভালোবাসা দেওয়া হউক না কেন সে যে আপন মায়ের মতো হবেনা তা কবিতা তার জ্বলন্ত প্রমাণ হিসেবে পেয়েছে।

কবিতা খুবই ছোটবেলায় তার মাকে হারিয়েছে, পাঁচ ভাইবোনকে অনেক আদর দিয়ে বড় করেছে। ভেবেছিল তার যে মায়ের ভালোবাসার অভাবটা ছিলো তা শাশুড়ীর কাছ থেকে পুষিয়ে নিবে। কিন্তু কিছু মানুষের কপালে মনে হয় কোনদিন সুখ জোটেনা, তার মধ্য সে নিজেকে একজন ভাবে।

কৃষকবাড়ীর বউ হওয়াতে ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ঢেঁকিতে ধান ভাঙা, রান্না, অন্যের বাড়ী থেকে খাবার পানি আনা সহ অন্যান্য কাজ করতে হতো। এরমধ্যে যদি কোন কাজে একটু ভুল থাকতো তার জন্য শাশুড়ী মৃত মাকে তুলে গালি দিতো। তাতেও যদি তার মন না ভরতো, তাহলে ছেলে আসলে ছেলেকে দিয়ে মার না খাওয়ানো পর্যন্ত তার শান্তি ছিলোনা।

কবিতা এখন তার শারীরিক অবস্থা দেখে মনে মনে ভাবে একসময় তার কি দাপট ছিলো। একবার কবিতা তার ঘরে পরার শাড়ীটা ধুয়ে দিয়েছিলো, শাড়ীটা নাকি কবিতা ঠিকমতো পরিষ্কার করতে পারেনি বলে সে শাড়ীটা সাতবার ধুয়ে ছিলো, আর এখন তার সমস্ত কাপড় কবিতাই পরিষ্কার করে দেয়। কবিতার হাতের

রান্না নাকি সবচেয়ে জঘণ্য রান্না ছিলো, আর এখন কবিতার হাতের রান্না নাকি তার অনেক ভালো লাগে।

কবিতার সহ্যের সীমা একদিন ভেঙ্গেই গিয়েছিলো। সে ফসলের ক্ষেতের কীটনাশক বিষ খেয়ে ফেলে রাগের মাথায়, কিন্তু তার এত কষ্টের মাঝে ভালোবাসার মানুষ কাজলা (ননদ) বাড়ীতে থাকাতে সেই সময় সে বেঁচে যায়। সেইদিন হলো কি, কাজলা ঢাকা থেকে অনেকদিন পরে বড়দিনের আগে মা, বৌদি ও ভাইয়ের জন্য বড়দিনের কাপড় ও খাবার নিয়ে যায়। কবিতার এইবছর কোন শাড়ী না লাগায় বড়জাকে তার জন্য আনা শাড়ীটা দিয়েছিল, যে কিনা একবারের জন্যও শাশুড়ীর কোন খবর নেয় না। আর খাবারগুলো সব অন্য ভাইদের ছেলেমেয়েদের দিয়েছিল। তার এক বছরের মেয়ে সে দিকে তাকিয়ে ছিলো, তাই দেখে শাশুড়ী বলে, জুঁইয়ের এখনো খাবারের বয়স হয়নি, যখন হবে দেখা যাবে। পরপর প্রতিটি ঘটনা তাকে খুব কষ্ট দিয়েছিলো। সবশেষে খাবারের সময় সে ও তার ননদ মাছের টুকরো নেওয়ার পরে কবিতা মাছের টুকরোটা প্লেটে নিতে যাচ্ছিল, তখন ননদ বলে, এই মাছটা তুমি নিবেনা, তুমি ওই ছোটটা নাও, এটা আমার ছেলে রাতে খাবে।

সেইদিন ঘরে দরজা বন্ধ করে কবিতা অনেক কেঁদেছিলো, এত পরিশ্রমের পরেও সবসময় এত কথা শুনতে আর ইচ্ছে করেনা। গতকাল রাতে তার স্বামী মরিচের ক্ষেতে পোকা মারার ঔষুধটা দিয়েছিল, রাগের মাথায় তার কিছুটা খেয়ে ফেলে সে। যাহোক, সব ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে ননদ তাকে অনেক বুঝিয়ে বলে, বৌদি আমি জানি তুমি এই সংসারের জন্য অনেক কষ্ট করো। আজ মার সাথে অনেক রাগ করেছি, আমি জানিনা সে তোমার মতো ভালো একজন মানুষের সাথে কেন এত খারাপ ব্যবহার করে। বৌদি তুমি অনেক ধৈর্যশীলা, ঈশ্বর সময়মতো তার বিচার করবে। আমি সবসময় তোমার পাশে আছি, তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে পাবে।

প্রতিটি কথার প্রমাণ কবিতা গত ২০ বছরে পেয়েছে। তার চার মেয়ে সরকারি চাকরিতে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত। একমেয়ে আমেরিকা ও আরেক মেয়ে ইউরোপে স্বামী নিয়ে থাকে। কবিতা তার স্বামী ও ৯০ বছরের শাশুড়ীকে নিয়ে ঢাকায় থাকে।

বৌমা আমাকে নাস্তা খেতে নিয়ে চলো, শাশুড়ীর কথায় কবিতা কল্পনা থেকে বাস্তবে আসে। আসলে প্রাকৃতি কি রূপ পাল্টায়! একসময় তার কত ক্ষমতা আর এখন তার কি নম্রতা। তাই আসুন আমরা অন্যের প্রতি ভাল আচরণ করি। একদিন আমাদের সবাইকেই অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। তাই আমরা অপরের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার আশা করি তার প্রতিও যেন তেমন ব্যবহার করি।

ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পার্বণ

শ্রদ্ধাভাজন খ্রিস্টভক্তগণ,

পাস্কা পর্বের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি

আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আসছে ১ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর প্রতি পালক শ্রমিক সাধু যোসেফের মহাপর্ব আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। প্রতিপালকের পার্বণের খ্রিস্টযাগে আপনাদের অংশগ্রহণ একান্তভাবে কামনা করছি।

পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান = **৫০০ টাকা**

পর্বীয় খ্রিস্টযাগের সময়সূচী
১ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৬:০০ ঘটিকা
২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ৯:০০ ঘটিকা

ধন্যবাদান্তে,
ফা: অমল ডি. ক্রুজ
পালকীয় পরিষদ
ধরেন্ডা, ঢাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা নাকি দক্ষতাঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনটি বেশি জরুরি !

ড. স্যান্ডি ফ্রান্সিস পিরিস

বর্তমান বিশ্বে কর্মসংস্থানের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রশ্ন ওঠে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নাকি দক্ষতা কোনটি বেশি জরুরি?

শিক্ষাগত যোগ্যতার গুরুত্ব

শিক্ষাগত যোগ্যতা বা একাডেমিক ডিগ্রি ব্যক্তির জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতিফলন। এটি প্রমাণ করে যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং সেই বিষয়ে মৌলিক ধারণা ও তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উচ্চশিক্ষা অর্জনকে সামাজিক মর্যাদা ও পেশাগত সাফল্যের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। অনেক নিয়োগকর্তা এখনও প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতাকে প্রাথমিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেন।

দক্ষতার গুরুত্ব

অপরদিকে, দক্ষতা হলো বাস্তব জ্ঞান ও প্রয়োগ ক্ষমতা, যা কর্মক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব ফেলে। বর্তমান চাকরির বাজারে সফট স্কিল যেমন যোগাযোগ দক্ষতা, দলগত কাজের ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ইত্যাদি অত্যন্ত মূল্যবান। নূহা সাবান্তা মাওলা, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, উল্লেখ করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনায় দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে বা ভবিষ্যতের পেশায় সফল হতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের চাকরির বাজারে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রভাব

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশের বেকারত্বের হার বেড়ে ৪.৪৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে যা এক বছর আগের ৪.০৭ শতাংশ ছিল, সরকারী তথ্য অনুসারে, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তার উদ্বেগ শ্রমবাজারে প্রভাব ফেলেছিল বলে, সরকারী তথ্য অনুসারে, নারীরা মন্দার প্রভাব বহন করে (ডেইলি স্টার, জানুয়ারী ২০২৫)।

এই পরিস্থিতির পেছনে একটি প্রধান কারণ হলো শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মক্ষেত্রের চাহিদার মধ্যে অসঙ্গতি। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী ডিগ্রি অর্জন করলেও প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে চাকরি পাচ্ছেন না। শ্রমবাজারে যে ধরনের দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী কর্মীর চাহিদা পূরণ করতে পারছে না শিক্ষাব্যবস্থা (প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন

দক্ষতার অভাবই বেকারত্ব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে অনেক নিয়োগকর্তা যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছেন না, কারণ বাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। তাই, শিক্ষার্থীদের উচিত শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি বাস্তবমুখী দক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হওয়া। এক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে (প্রথম আলো, নভেম্বর ২০১৯)।

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা জরুরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এছাড়াও, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবন শেষে সরাসরি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা, দক্ষতা এবং চাকরিতে খ্রিস্টান যুবদের অবস্থান এবং আমাদের ভূমিকা -

বাংলাদেশে খ্রিস্টান যুবদের উচ্চশিক্ষা, দক্ষতা এবং চাকরিতে খ্রিস্টান যুবদের অবস্থান সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান বা গবেষণা তথ্য পাওয়া কঠিন। তবে, সাধারণভাবে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। চাকরি বাজারে তাদের অবস্থান নির্ধারিত হয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত গুণাবলির ভিত্তিতে। তবে বিশেষ করে কিছু চাকরির বাজারে খ্রিস্টান যুবদের অবস্থান ভালো যেমন এনজিও প্রতিষ্ঠান, নার্সিং এবং বাবুর্চি। আর এর বাইরে শিক্ষকতা পেশায় অনেককেই দেখা যায় তবে তাও খ্রিস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই। এ সকল চাকরির বাজারে আমাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে আমার মতামত অনেকটা মন্দের ভালোর মতো, মানে হলো আমরা খুবই গতানুগতিকভাবেই এ চাকরির বাজারগুলোতে যাচ্ছি বেশিরভাগ সময় অন্য উপায় না পেয়ে। যেমন আমি নিজে আঠারোগ্রামের সন্তান হিসেবে দেখেছি ছেলেরা এসএসসি বা এইচএসসি পাশ করার পর বছরের পর বছর বসে থাকে যে, কবে পরিচিত মহলের মাধ্যমে দেশে বা বিদেশে বাবুর্চি চাকরির খবর হবে। তারা কিন্তু নতুন কিছু করার সাহসও করে না এবং তাদের জীবনের একটা বড় সময় এভাবে নষ্ট হয়।

অনেকেই আবার এখন বিভিন্ন ক্রেডিটগুলোতে কাজ করছেন এবং সেটাও আমার কাছে মনে হয়েছে আর কোনো উপায় নাই তাই সেখানে চাকরি করে যাচ্ছি বছরের পর বছর। আমাদের বেশিরভাগই কোনো একটা চাকরিতে প্রবেশ করলে সেখান থেকে উন্নতির তেমন পরিকল্পনা দেখি না। ক্যারিয়ারের বিষয়ে আসলে খুব

বেশি পরিকল্পনা তেমন কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। তবে মাঝে মাঝে দেখি বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলো কিছু সেমিনার করে কিন্তু সেগুলোর উদ্দেশ্য অনেকটা নিজেদের ঢোল পেটানোর মতো। তেমন কোনো ভালো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দেখা যায় না। এমন কি সেখানে শুধু তাদেরই অংশগ্রহণ দেখি যাদের তাদের নিজেদের দলীয় মতামতকে সমর্থন করে।

এখন পর্যন্ত খ্রিস্টান সমাজে তেমন কোনো গ্রুপ বা প্ল্যাটফর্ম তেমন দেখা যায়নি যারা ক্যারিয়ার নিয়ে কাজ করছেন। এর অবশ্য একটা অন্য রকম তথ্য আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি (ভুলও হতে পারি), যারা ক্যারিয়ারে নিজ গুণে এগিয়ে গেছেন তারা আসলে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে চান না কারণ অন্যের ভালো করতে গেলে দেখা যায় নিজের বদনাম হয়ে যায়। তাই কি দরকার এসব ঝামেলায় যাবার তার থেকে নিজের গন্ডিতে নিজে ভালো থাকি।

কিন্তু আমরা যদি এ সকল সফল ব্যক্তিদের (বিভিন্ন পেশায়) যুক্ত করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়বো। পৃথিবী এখন অনেক পরিবর্তিত এবং এই পরিবর্তন হচ্ছে এতোই দ্রুত যা আমাদের অনুমানের থেকেও দ্রুত। আমরা খ্রিস্টান সমাজ কি সেই পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে প্রস্তুত? বিশেষ করে যখন আমাদের খ্রিস্টানদের একটি বড় অংশ বিদেশে অভিবাসনের জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

আসুন ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুত হই

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা উভয়ই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনও সমানভাবে জরুরি। শিক্ষার্থীদের উচিত শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তবমুখী দক্ষতা উন্নয়নে মনোযোগী হওয়া, যাতে তারা প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তাই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রস্তুতি খুবই দরকার।

তবে শিক্ষার্থীদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ থেকেই যায় যে অনেক সময় পরামর্শের জন্য কার কাছে যাবে তেমন তথ্য তাদের কাছে থাকে না। তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো প্রস্তুত হতে হবে। আমরা ২০ বছর আগেও যা করতাম আর এখনো যদি তাই করি আমরা এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় পিছিয়ে পড়বো আর যখন তা উপলব্ধি করবো তখন হয়তো খুব বেশি সময় থাকবে না। ❑

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যুবদের আদর্শ ও শক্তি

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

"দেখো, তোমার বয়স কম ব'লে কেউ যেন তোমাকে উপেক্ষা না করে, তবে তুমিও যেন তোমার কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে, প্রীতি-ভালোবাসায়, ধর্মবিশ্বাসে, শুচিতায় সকল খ্রিস্ট-বিশ্বাসীর সামনে একটি দৃষ্টান্তই হয়ে ওঠো" *(১ তিমথি ৪:১২ পদ)*।

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের সবার আদর্শ, জীবনের শক্তি। যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে তারা নতুন জীবন লাভ করে ও পুনরুত্থিত হয়। খ্রিস্ট মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে এ পৃথিবীতে এসেছেন। যুবক খ্রিস্ট, যখন তার বয়স ত্রিশ তখন তিনি প্রচার কাজ বা তাঁর কর্ম জীবন শুরু হয়। তিনি মাত্র তিন বছর সময় পেয়েছেন প্রকাশ্যে পিতার ইচ্ছা পালন করতে। এই অল্প সময়ই যিশু যে সকল মহান কাজ করেছেন তা আমরা যুগ যুগ ধরে স্বীকার করে চলেছি। বিশেষ করে যুবক-যুবতীরা নিজেদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান করে যুবক যিশুর জীবন ও কাজ নিয়ে অনেক শিক্ষা, প্রেরণা, কর্মজীবনে শক্তি ও উৎসাহ পেতে পারে। তারা যিশুকে জীবনের আদর্শ বা গুরু হিসেবে গ্রহণ করে ফলবান হতে পারে।

যুবকেরা জ্ঞান সন্ধানী: পুনরুত্থিত খ্রিস্ট হলেন প্রকৃত জ্ঞানের উৎস। তিনি সঠিক জ্ঞান, পরামর্শ, সহযোগিতা করে থাকেন। খ্রিস্টের সংস্পর্শে এসে কেউ বিপদগামী, নিরাশা-হত্যাশা বা ভুল পথে পরিচালিত হয় না। কারণ পুনরুত্থিত খ্রিস্ট হলেন আধ্যাত্মিক গুরু বা পরিচালক। বর্তমানে যুব সমাজ অনেক সময়ই বিপদগামী হয়ে থাকে। সঠিক পরামর্শ ও নির্দেশনার অভাবে যুবসমাজ নিজেদের মেধা ও শক্তি দিয়ে সমাজের ভালো কাজ করা থেকে বঞ্চিত হয় ও অন্যদের দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে থাকে। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট কিন্তু যুবদের জন্য অপেক্ষায় আছেন। যুবকেরা যিশুর ভালোবাসা, যিশুকে নিয়ে ধ্যান প্রার্থনা করে নিজেদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারে ও সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যুবসমাজের জন্য মডেল বা গুরু।

"কনিষ্ঠজন যারা, তাদের বলি: তোমরা প্রবীণদের অনুগত হও! তোমরা সবাই বিনম্রতার বসন পরেই একে অন্যের সাথে মেশো" *(১ম পিতর ৫:১)*। যিশু ভালোবাসায় জীবনে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়।

খ্রিস্ট পুনরুত্থান ও জীবন: "খ্রিস্ট পুনরুত্থিত ও জীবন্ত"। যিশু নিজেই বলেছিলেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত থাকবে" *(যোহন ১১:২৫)*। খ্রিস্ট পুনরুত্থিত ও জীবিত, খ্রিস্ট সত্য ও বাস্তব, খ্রিস্ট আমাদের জীবনের উৎস ও প্রেরণা। যুব সমাজের জন্য খ্রিস্ট সত্যিই জীবিত, প্রেরণা ও চালিকা শক্তির উৎস। খ্রিস্ট মৃত্যুকে জয় করেছেন ও আমাদের জীবনের মন্দতাকে জয় করতে সাহায্য করেন। ড. লুৎফুর রহমান বলেছেন, "যুবদের গায়ের জোরে আস্থা খুব বেশি। বিচার বুদ্ধি বিবেকের দাবি তাদের কাছে নাই। উদ্ধত প্রকাশ তাদের স্বপ্রকৃতি"। যুবদের বিশ্বাস করা দরকার যে, পুনরুত্থিত খ্রিস্টই পারেন প্রকৃত জীবন দিতে। তাই যুবদের উচিৎ হবে নিজেদের শক্তিমত্তার উপর নির্ভর না করে, বরং যিশুর উপর নির্ভর করে জীবন পরিচালিত করা।

খ্রিস্ট জগতের আলো: যিশু নিজেই বলেছেন "আমি জগতের আলো"। খ্রিস্ট প্রভু সকলের অন্তরে আলো জ্বালিয়ে থাকেন। যারা খ্রিস্টের ভালোবাসা পেয়েছে, তারা কখনোই অন্ধকারে থাকতে পারে না। আমাদের যুবরা অনেক সময় অন্ধকারে জীবন যাপন করে থাকে। তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করার মানুষের অভাব বা তারা সঠিক পরিচালনা গ্রহণ করতে চায় না। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যুবদের জন্য একজন আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তি।

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ক্ষমা করেন: যিশু নিজে বলেছেন "তোমার ভাইকে সাত গুণ সত্তরবার ক্ষমা কর" *(যোহন ২০: ২২-২৩)*। যিশু ক্ষমার আদর্শ। তিনি যে ভাবে আমাদের ক্ষমা করেছেন ও ক্ষমা

করতে শিক্ষা দিয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশের অতীত। জীবনের বিভিন্ন ধাপে আমরা বিভিন্ন কর্ম করি বা বিভিন্ন ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়তে পারি। সকলের জন্য যুবক বয়স একটু ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। এই বয়সে ভালো-মন্দ বিচার করা একটু কঠিন হয়ে যায় বিধায় পাপে পতিত হয় বা পাপবোধ কম থাকে। তাই যুবক বয়সে যিশুর ভালোবাসার সংস্পর্শ পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "পিতা, ওদের ক্ষমা কর!" *(লুক ২৩: ৩৪ পদ)*। যিশুর এ কথা থেকেই বুঝতে পারি যে, সর্বদা আমাদের ক্ষমা করেন।

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের সাথে যাত্রা করেন: খ্রিস্ট পুনরুত্থানের পরে দুই জন শিষ্যদের সাথে এম্মাউস নামে একটি গ্রামে যাওয়ার পথে দীর্ঘ সময় ধরে একসাথে পথ চলেছেন ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আজও আমাদের সাথে পথ চলেন ও সঠিক নির্দেশনা প্রদান ও আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি আমাদের সঠিক পথে পরিচালনা করে ও বিপদের সময়ে সান্ত্বনা বা শক্তি যুগিয়ে থাকেন। যুবক বয়সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবন পথে চলা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত ও সঠিক পরামর্শদাতার অভাবে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যুবদের অনেক অনেক ভালোবাসেন এবং পরামর্শ, সহযোগিতা, নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। যুব সমাজ খ্রিস্টকে নিয়ে ধ্যান প্রার্থনা করে যে উপলব্ধি, মানসিক শক্তি, প্রকৃত জ্ঞান বা প্রেরণা লাভ করতে পারে, যা তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। খ্রিস্ট হলেন একজন পরামর্শদাতা ও গাইড। তিনি খুব ভালোভাবে জানেন যুব সামজের কি দরকার বা প্রয়োজন।

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেন: "এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে শোনা গেল প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো একটা শব্দ। যে-বাড়িতে তাঁরা বসেছিলেন, সে বাড়িটি সেই শব্দে ভরে উঠল। তারপর তাঁরা দেখতে পেলেন, অগ্নিজিহ্বার মতো দেখতে কী যেন ছড়িয়ে পড়ে তাদের প্রত্যেকের ওপর নেমে এসে অধিষ্ঠিত হল। তাদের সকলেরই সারা অন্তর জুড়ে তখন বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা" *(শিষ্যচরিত ২:২-৪)*। খ্রিস্ট আজও আমাদের উপর পবিত্র আত্মা প্রেরণ করে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করে থাকেন, বিশেষ করে যুবদের মাঝে খ্রিস্ট বিরাজমান, তাদের খুব ভালোবাসেন ও সবসময় পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেন। যুবদের সঠিক নির্দেশনার অভাবের ফলে অনেক সময় জীবনে ব্যর্থ হয় ও অন্যেরা তাদের ব্যবহার করে থাকে। তাই বলা যায় যে, খ্রিস্টই একমাত্র প্রকৃত বন্ধু ও পরিচালক। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যুবদের জন্য সঠিক ব্যক্তি,

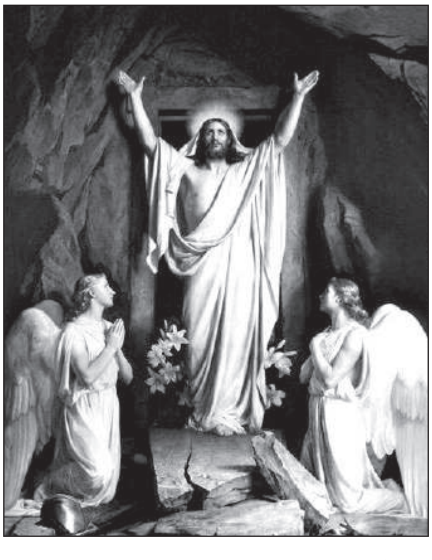

যিনি যুবদের সাহায্য করতে পারে ও সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন।

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট বিশ্বাস বৃদ্ধি করে তুলেন: তিনি পুনরুত্থিত। খ্রিস্ট টমাসকে বলেন, "তোমার আঙ্গুলটা এখানে বাড়িয়ে দাও, আমার হাত দু'টো ছুঁয়ে দেখ! এবার বাড়াও, আমার বুকের পাশটিতে হাত দাও। আর অবিশ্বাসী হয়ে থেকো না, বিশ্বাসী হও" *(যোহন ২০:২৭-২৮)*। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যুবদের আহ্বান করে, তারা যেন খ্রিস্টকে স্পর্শ করে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। যুবদের মনে অনেক প্রশ্ন, সন্দেহ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বাসা বেঁধে থাকে। তারই কারণে বেশিরভাগ সময় যুবসমাজ অন্যদের দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়। আজ খ্রিস্টপ্রভু যুবাদের অন্তরে, অনুভূতিতে ও ভালোবাসার বৃদ্ধি করতে চান যেন তারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে যিশুর প্রকৃত সেবক হয়ে সমাজে খ্রিস্টের মত ভালোবাসা ও সেবা দিয়ে মানুষের পাশে থাকতে পারে।

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট পাপ ক্ষমা করেন: "আমার যৌবনের পাপ ও আমার অধর্ম সকল স্মরণ করিও না, হে প্রভু, তোমার দয়া অনুসারে তোমার মঙ্গলের জন্য আমাকে স্মরণ কর" *(গীতসংহিতা ২৫:৭)*। এ্যানাফ্র্যাঙ্ক বলেছেন যে, "যুবকেরা সত্য বলতে ভয় পায় না"। তিনি তাদের লক্ষ্য ক'রে একবার ফুঁ দিলেন, তারপর বললেন "এবার তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর! তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তবে ক্ষমা করাই হবে, যদি কারও পাপ ক্ষমা না কর, তা ক্ষমা-না-করাই থাকবে" *(যোহন ২০:২২-২৩)*। খ্রিস্টই পারেন আমাদের পাপ ক্ষমা করতে। যুবসমাজ বিপদগামী হওয়াই স্বাভাবিক। যুবসমাজের খ্রিস্টের সান্নিধ্যে যাওয়া প্রয়োজন। খ্রিস্টই একমাত্র পারেন যুবদের ক্ষমা করে নিজের ভালোবাসায় নিয়ে আসতে।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান বাণী প্রচার করার জন্য সাহস যোগায়: যিশুর সময় থেকেই ঈশ্বরের শত্রুরা প্রচার কাজ বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন জঘন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে যেমন, ধর্মভ্রষ্টতা, উপহাস, দৌরাত্ম্য, নিষেধাজ্ঞা, অত্যাচার এবং মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু বাইবেলে প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছেন যে, "যে কোন অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত হয়, তাহা সার্থক হবে না" *(ইশা ৫৪:১৭)*। খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ কখনও শয়তান ভয় পায় না, যদিও তারা অনেক সময় শয়তান দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে। যিশু কিন্তু সবসময় আমাদের সাহায্য করে থাকেন ও তাঁর বাণী প্রচারে সাহায্য করে থাকেন। যিশু নিজেই বলেছেন যে, "তোমাদের যা-কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিম কাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি" *(মথি ২৮: ২০ পদ)*। খ্রিস্ট কখনই যুবদের ভুলে যান না। তিনি তাদের শক্তি, সাহস, উদ্দীপনা ও বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে প্রচার কাজ চালিয়ে যান। যুবসমাজ যিশুর প্রচারের শক্তি ও কর্মী। তারা পুনরুত্থানের স্বাক্ষী ও জনগণের মাঝে সাক্ষ্য বহন করতে পারে, যা অন্য কোন মানুষ করতে পারেনা। যিশুই সবার অন্তরে বাণী প্রচারের সাহস যুগিয়ে থাকেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে ঐশবাণী-ধ্যান, পুণ্য সপ্তাহ খ্রিস্টভক্তদের বাণী-প্রার্থনা বিতান ও নতুন সহস্রাব্দের জন্যে পবিত্র ক্রুশের আধ্যাত্মিকতা।

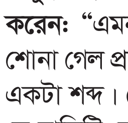

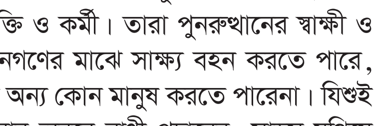

এসো হে প্রাণের বৈশাখ

ব্রাদার অংকন পিটার রিবেরু

এসো হে বৈশাখ, এসো এসো। বাঙালির ঘরে ঘরে, সকল হৃদয়ের মাঝারে এসো। নতুন ধানের গন্ধে, সুবাসিত গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চল। প্রতিটি পথঘাট যেন বলে দেয় আজ পহেলা বৈশাখ। বাঙালির একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। কোটি বাঙালি যেন অবাক তাকিয়ে রয় এই উৎসবের দিকে। শহুরের জীবন বিরতীহীন তবুও এই উৎসবটিকে কেন্দ্র করে মানুষ ছুঁটে যায় শিকড়ে। যে শিকড়ে তাদের বেড়ে উঠা। অর্থাৎ পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজন, সন্তান-সন্ততি, সমাজ-গ্রাম ও প্রকৃতিতে। এ যেন এক মিলন উৎসব। নবান্ন নব জীবনকে তাড়িত করে। বাঙালির ঐতিহ্যকে ধারণ করে। যখনই বাঙালিদের নিয়ে ভাবি তখনই শ্রদ্ধাভরে বাংলা ভাষাকে ও বাংলাদেশকে স্মরণ করি। কেননা বাঙালিদের জন্যে বাংলাদেশ আর তাদেরই জন্যে লাখো শহীদের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা। মোদের মায়ের ভাষা। বৈশাখের আমেজ এক দিনের জন্যে নয়। এই দিনে বাঙালি যুবতীরা হলুদ শাড়ি পরিধান করে এবং তাদের মাথায় দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের পুষ্পমাল্য। যুবকেরা পায়জামা-পাঞ্জাবীতে নিজেদের সাজিয়ে তোলেন। ঘরে ঘরে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের পিঠা-পুলি, বটগাছের তলায় বসে মেলা। জিলাপীওয়ালার তৈরি জিলাপী, নিমকি-ফুরলি, চড়ক গাছের দুল-দুলানি হৃদয় মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। এ যেন পরিপূর্ণ এক আনন্দের জলাধার।গ্রামের উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণীরা ছুটে চলে মেলায়। মেলা দেখে ফেরার পথে বাঁশি বাজিয়ে জানান দেয় আজ পহেলা বৈশাখ। ১৪ এপ্রিল যেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে গেঁথে আছে। প্রতিটি সত্তা জানান দেয় এসো বাঙালির ঐতিহ্যকে সম্মান করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আয়োজন করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রার যেখানে হাজারো বাঙালি অংশ নেয় তাদের এই ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে। হাতে হাতে প্রদীপ, ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, বাদ্যের তালে তালে, সুরেলা বাঁশির ধ্বনিতে হেঁটে চলে দুর্বার তারুণ্যের দিকে। রাস্তার দুধারে হাজারো দর্শনার্থী আবেগে আপ্লুত হয়ে পরে। তারা সবাই একই পথের পথিক হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই গানের তালে তালে বাংলার প্রতিটি পথ-ঘাট ভরে উঠে। পহেলা বৈশাখ দিবসটি শুরু হয় সবারই চেনা একটি গানে- এসো হে বৈশাখ এসো এসো। গানটি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সকল বাঙালি একই তালে গেয়ে উঠে এসো হে বৈশাখ এসো এসো। এই গানে যেন কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই, নেই কোন জাত, ধর্ম, বিভেদ। সবাই যেন এক আর সবার একটাই পরিচয়, আমরা বাঙালি ও বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা, লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত ভাষা, কোন ক্রমেই এই ভাষার অবমর্যাদা আমরা করবো না, কোন কালেই নয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যেই ভাবে শত্রুমুক্ত করেছি আজ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দেও যদি দেখি শত্রুর ছুটাছুটি তবে প্রত্যেকজন বাঙালি তাদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত। এই উৎসব আমাদের, আমাদের ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। এই উৎসবকে হারিয়ে ফেলা মানে বাঙালির ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলা যা কোন ক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। বাঙালিদের বাঁচতে হলে অবশ্যই তাদের এই ঐতিহ্যকে লালন করতে হবে। বাঙালি ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন উৎসব পালন করে। পহেলা বৈশাখ কারো একার উৎসব নহে। বরং এটি সকল বাঙালির প্রাণের উৎসব। এই উৎসব পালনে থাকবেনা কোন ভেদাভেদ। পহেলা বৈশাখ পালনে সবাই মোরা এক ও অভিন্ন। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, বাঙালি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন থাকবে পহেলা বৈশাখ। বাংলাদেশকে নিয়ে ভাবলেই ভেসে আসে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মানুষের গল্প। এখানে বাঙালি ছাড়াও রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন। যদিও বা তারা আদিবাসী তবুও তারা পহেলা বৈশাখ উৎসবটি শ্রদ্ধাভরে পালন করে থাকে। তারা এই উৎসব পালনের মাধ্যমে জানান দেয় তারাও বাঙালির ঐতিহ্যকে সম্মান করে ও ভালোবাসে। নিজস্ব সংস্কৃতিতে তারাও এই উৎসবটি পালন করে ও আনন্দ সহভাগিতা করে। এই থেকে বোঝা যায়, পহেলা বৈশাখ সবার জন্যে একটি অর্থপূর্ণ উৎসব। এই উৎসবটি উদযাপন করা মানেই হল বাঙালির ঐতিহ্যকে জীবিত রাখা। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ, বাঙালির ঐতিহ্য বেঁচে থাকুক যুগ যুগ ধরে।

---

৪২ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ

বসিয়েছিলেন; একদিন তারাই তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে না পেরে বিভিন্ন সময় নানা কুৎসা রটিয়ে তাঁর যোগ্য ও সৎ নেতৃত্বকে বারংবার প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। এ ষড়যন্ত্রের কারণে নির্লোভি সুবাসদা স্বেচ্ছায় একদিন পদত্যাগ করে নিজের সম্মান বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, চলমান জীবনের অভিযাত্রায়, মানুষের অভিজ্ঞতার শেষ নেই, চাওয়া-পাওয়ারও শেষ নেই, আশা আকাঙ্ক্ষারও কোন সীমা পরিসীমা নেই। জীবনে চলার পথে, লব্ধ অভিজ্ঞতা মানুষের স্মৃতির আঙ্গিনায় আনাগোনা করতে করতে, একসময় বিস্মৃতির সীমানায় হারিয়ে যায়।

কিন্তু সেক্ষেত্রে সুবাসদা একটু ব্যতিক্রম। তিনি আজও চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ। আজও অবলীলায় নানা লেখনির মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ইতিহাসের নানা দুর্লভ স্মৃতি, তাঁর কলমের খোঁচায় উঠে আসছে। যা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রকৃত ইতিহাস খুঁজে পাবে বলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পরিশেষে, এটুকু বলতে পারি, সুবাসদার মতো স্পষ্টবাদী, সৎ, আদর্শবান, তীক্ষ্ন বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন গুণী এ ব্যক্তিত্বটির সম্বন্ধে বলতে গেলে, স্বল্প কথায় লেখা সম্ভব নয়, সে স্পর্ধাও আমার নেই। ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনে তিনি একজন জীবন্ত কিংবদন্তী। সুবাসদার জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ❑

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার ৮৫ বছর

পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৩ এপ্রিল - ১৯ এপ্রিল, ৩০ চৈত্র ১৪৩১ - ৬ বৈশাখ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ

স্মৃতিচারণ

সুবাসদাকে যেমনটি দেখেছি

ডেভিড স্বপন রোজারিও (কানেকটিকাট আমেরিকা)

দাদাকে প্রথমে একটি নাটকে অভিনয় করতে দেখেছিলাম। সে অনেকদিন আগের কথা, তখন আমি হাই-স্কুলে পড়ি। বন্ধুরা বললো, দড়িপাড়ায় একটি নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে, চল দেখে আসি। আমাদের রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম দড়িপাড়া। বিল পার হয়ে, সদলবলে সেখানে পৌঁছে গেলাম।

আজ অবশ্য মনে নেই তিনি কি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তবে এতটুকু মনে আছে, খুব সাদামাটা একটি খোলা মঞ্চ। বিশাল উঠান জুড়ে মাটিতে মাদুর ও খড় বিছিয়ে, তাতে আবাল-বৃদ্ধ বনিতারা, মহানন্দে বসেছে। একটি একচালা ঘর থেকে অভিনেতারা রং চং মেখে মঞ্চে অভিনয় করে, আবার সেই একই পথে নেমে যাচ্ছে।

সুবাসদাও এলেন, পাঠ বলতে বলতে। তাঁর পড়নে সাদা প্যান্ট-সাদা স্মার্ট, মাথা ভর্তি ব্যাক-ব্রাশ করা ঘন কালো চুল, ছোট খাট গড়ন, মেক আপ করা সুন্দর মুখ যা দেখতে নায়ক রাজ রাজ্জাকের মতো। সাবলীলভাবে তার পাঠ বলে, বিদায় নিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সে অভিনয় দেখেছিলাম বলে, সেদিন থেকেই তাঁর একটি মুখচ্ছবি হৃদয়ে আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘদিন তাঁর সাথে আর দেখা হয়নি। সদ্য স্বাধীন দেশ, চারিদিকে হাহাকার, ধ্বংসস্তুপের মাঝ থেকে নতুন দেশকে ঘুরে দাঁড়াতে সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। নানান উত্থান-পতনের মাধ্যমে ভাগ্যক্রমে "বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সে" চাকরি পেলাম।

ঠিক এমনি এক মাহেন্দ্রক্ষণে, সুবাসদাকে দূর থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। সম্ভবত ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে "ঢাকা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের" ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে" রমনা বিশপ হাউজের মাঠে এক জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি তখন উক্ত ইউনিয়নের নব্য সদস্য হওয়ার সুবাদে বন্ধুদের সাথে দল বেঁধে সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

মাঠ ভর্তি লোক, অনেকে চেয়ারে বসে আছে, কেউ হাঁটছে, কেউবা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে, মহিলা সদস্য সংখ্যা অধিক বলে মনে হল। আমরা যুবকরা, ঘুরে ঘুরে পরিচিত জনদের সাথে আলাপ করছি। অনুষ্ঠান শুরু হয় হয় অবস্থা, এমন সময় একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, "সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি, দয়া করে আপনারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন।"

দারুণভাবে চমকে উঠলাম। সেই কণ্ঠস্বর, কথা বলার সেই একই ধরণ, যা উঠতি বয়সে আমার হৃদয়ে রেখাপাত করেছিল। ধীরে ধীরে ভীড় ঠেলে সুসজ্জিত মঞ্চের সামনে এগিয়ে গেলাম। তখন তিনি একটি চেয়ারে বসে, সামনে একটি মাইকে নানান

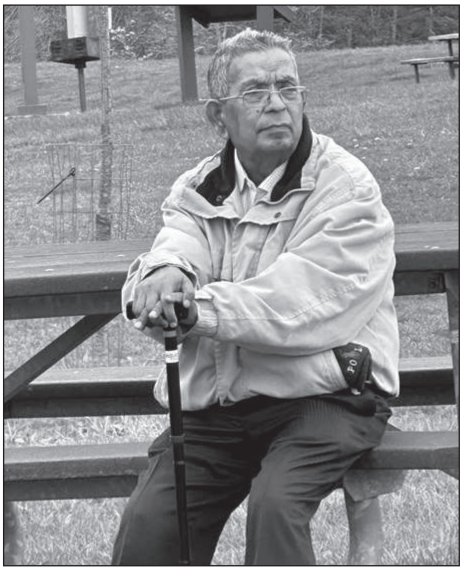

বিশেষণে বিভূষিত করে, নেতাদের আসন গ্রহণ করাচ্ছেন। আমি সত্যিই অভিভূত হয়ে গেলাম। চিত্তদাকে (চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু) প্রশ্ন করলাম, উনি কে?

-বললো, চেনো না! ক্রেডিট ইউনিয়নের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক, মিঃ সুবাস সেলেস্টিন রোজারিও।

সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে তিনিই মুখ্য ভূমিকা পালন করলেন। বলতে দ্বিধা নেই, পরবর্তীতে দক্ষ উপস্থাপক হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে, সেই অনুপ্রেরণা আমাকে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারপরও তাঁকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখেছি, কিন্তু দূর থেকে, কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়নি।

যখন তিনি "সেন্ট গ্রেগরীস্ স্কুলের" শিক্ষকতা ছেড়ে "কারিতাস বাংলাদেশে" যোগদান করেছিলেন, তখন বিভিন্ন কারণে একটু একটু করে কাছে ঘেঁষার সুযোগ হয়েছিল। যুব সমাজ ও স্থানীয় ক্রেডিট ইউনিয়নে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে, ইতিমধ্যে কিছুটা নাম ডাক হয়েছে। যুব সমিতির কার্যক্রম চালাতে গিয়ে, আর্থিক সাহায্যের আবেদন নিয়ে, কারিতাস অফিসে ছুঁটে যেতাম। তখন একদিন আচমকা, সুবাসদার রুমে ঢুকে পড়লাম। বিশাল একটি টেবিলের ওপাশে এক বড় চেয়ারে ছোট-খাট সুবাসদা বসে আছেন। পরিচালক হিসাবে সমস্ত ব্যস্ততার কথা ভুলে, সমাজ সংস্কার, আদর্শ ও সৎ নেতৃত্বের উপর অনেক পরামর্শ দিলেন। তাঁর জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা আমাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিলো।

পরবর্তীতে, ঢাকা ক্রেডিটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে আরও অনেক কিছু শিখেছি। ভাল সমাজ সেবক হওয়ার গুণাবলী মূলত, সুবাসদার কাছেই শিখেছিলাম। তিনি এক বর্ণাঢ্য সুশৃংখল জীবনের অধিকারী। তিল তিল করে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করেছিলেন। এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য পেয়েছেন অনেক সম্মাননা, ভূয়সী প্রশংসা, সর্বজনের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

এমনকি আমেরিকার প্রবাসজীবনের এ বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক সমাজে, নিজেদের লালিত সাংস্কৃতিক কৃষ্টি ও মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও, "ম্যারিল্যান্ডে খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন" আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যে মহলটি সুবাসদার সামাজিক নেতৃত্বের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সৎ ও আদর্শের বিবেচনা করে, দিনের পর দিন, নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে, ক্ষমতায়

বাকি অংশ ৪১ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...

অপরূপ শ্যামদেশ

রক রোনাল্ড রোজারিও

পৃথিবীটা হলো একটি বই। যারা বিদেশ ভ্রমণ করে না, তারা শুধুমাত্র একটি অধ্যায় পাঠ করে। মণীষীর এই উক্তি যে বাস্তবসম্মত তা সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন। কারণ, দেশ ভ্রমণ শুধুমাত্র বিনোদন নয় পাশাপাশি মূল্যবান শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের অপূর্ব সুযোগ। বলাই বাহুল্য দেশ ভ্রমণ করতে হলে পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াও পর্যাপ্ত অর্থ প্রয়োজন হয়। বিশ্বের উন্নত দেশের মানুষের কাছে বিদেশ ভ্রমণ ডালভাত হলেও অনুন্নত দেশের মানুষের কাছে অনেকটাই বিলাসিতাতুল্য। কখনো কখনো কাজের সুবাদে বা ভাগ্যক্রমে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কেউ কেউ বিদেশ গমনের সুযোগ পান। আমিও সেই দলের একজন। ২০০৯ থেকে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থাইল্যাণ্ডে দশবার এবং শ্রীলংকায় একবার (২০১২) অফিসের কাজে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে ২০১২ ও ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি। বলতে গেলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ থাইল্যাণ্ড আমার জন্য অনেকটা "সেকেন্ড হোম।" বিগত বছরগুলোতে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংকক ছাড়াও পর্যটন নগরী পাতায়া ও হুয়া হিন ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণ ছাড়াও কিছু ভ্রমণ ছিল বিনোদন ও শিক্ষামূলক।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থাইল্যাণ্ডের নাম ছিল সিয়াম রাজতন্ত্র (Kingdom of Siam), বাংলায় শ্যামদেশ। বর্তমান আনুষ্ঠানিক নাম থাই রাজতন্ত্র (Kingdom of Thailand)। শত শত বছর দেশটি "চাক্রি" রাজবংশের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে এবং দেশটির বর্তমান অবস্থানের পেছনে রাজাদের অনেক অবদান আছে। বর্তমানে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা না থাকলেও রাজ পরিবারকে থাইরা অনেক সম্মান এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখে। রাজ পরিবার সেদেশে সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। থাইল্যাণ্ড এশিয়ার কতিপয় দেশের মধ্যে অন্যতম যারা কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপনিবেশ হয় নি কখনো। থাইল্যাণ্ড উপসাগর বিধৌত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটি পর্যটকদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় জায়গা। থাইল্যাণ্ড তার দৃষ্টিনন্দন অগণিত সাগর-সৈকত, সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি, নজরকাড়া রাজপ্রাসাদ এবং মহামতি গৌতম বুদ্ধের বিশালাকার মূর্তি সম্বলিত অসামান্য সব বৌদ্ধ মন্দির প্রভৃতির জন্য জনপ্রিয়। এছাড়াও থাইল্যাণ্ড বিশ্বখ্যাত তার হাসপাতাল, হোটেল, রিসোর্ট, মার্কেট এবং বিনোদন সেক্টরের জন্য। যারা থাইল্যাণ্ড ভ্রমণ করেছেন তারা জানেন দেশটি পর্যটকদের জন্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে, কারণ পর্যটন এবং সংশ্লিষ্ট খাত হলো থাইল্যাণ্ডের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। কোভিড মহামারীকালে এ কারণে দেশটির অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, যা এখনো পরিপূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

আকাশপথে ঢাকা থেকে ব্যাংকক যেতে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা লাগে। থাই এয়ারওয়েজ, বাংলাদেশ বিমান এবং ইউএস বাংলাসহ বিভিন্ন বিমান কোম্পানি প্রতিদিন ঢাকা-ব্যাংকক রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করে থাকে। আসা-যাওয়ার ভাড়া কোম্পানি ও সময়ভেদে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো। যাত্রার দুই/একমাস আগে টিকিট ক্রয় করলে কিছু কম ভাড়া গুনতে হয়, দেরি হলে বেশি লাগে। থাই ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে এখনো ভিসা-ফ্রি চুক্তি হয় নি, তাই ভিসা ছাড়া থাইল্যাণ্ড ভ্রমণ অসম্ভব। ঢাকাস্থ থাই দূতাবাস টুরিস্ট, মেডিকেল, বিজনেসসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভিসা ইস্যু করে থাকে যথাযথ আবেদন, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস এবং নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে থাইল্যাণ্ড সরকার ই-ভিসা চালু করেছে যার জন্য অনলাইনে আবেদন, কাগজপত্র জমা এবং পেমেন্ট করতে হয়।

আমি প্রতিবার থাই এয়ারওয়েজে ব্যাংকক গিয়েছি এবং ঢাকা ফিরেছি। এটি রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন একটি প্রাইভেট বিমান কোম্পানি। ঢাকা থেকে ব্যাংককের প্রধান সুবর্ণভূমি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পৌঁছতে দুই ঘন্টার বেশি সময় লাগে। বর্তমানে সংস্থাটি ঢাকা-ব্যাংকক রুটে প্রতিদিন দুটি ফ্লাইট পরিচালনা করে - বাংলাদেশ সময় দুপুর ১:৩৫ মিনিট এবং রাত ২:৩৫ মিনিট। ব্যাংকক-ঢাকা ফ্লাইটের সময় - থাই সময় সকাল ১০:৩৫ মিনিট এবং রাত ১১:৫০ মিনিট। আমি বেশিরভাগ সময় দুপুরের ফ্লাইটে গিয়েছি ও সকালের ফ্লাইটে ফিরেছি নিজের সুবিধার্থে যেহেতু রাতে গেলে ঘুম ব্যাঘাতের ব্যাপার থাকে। থাই এয়ারওয়েজ সময় রক্ষা ও সেবা মানের দিক থেকে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান।

প্রথমবার ব্যাংকক যাই ২২ মার্চ, ২০০৯। সেটাই ছিল আমার প্রথম বিদেশ যাত্রা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেবারই তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। ঢাকা থেকে উড্ডয়নের আগ মুহূর্তে থাই এয়ারওয়েজ টিজে ৩২২ প্লেনের চাকায় কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। সেজন্য প্লেনে চেক-ইন করার পরও আমিসহ সব যাত্রীকে নামিয়ে দেয়া হয়। এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে প্রায় ছয় ঘন্টা অপেক্ষা শেষে সন্ধ্যা সাতটা পয়তাল্লিশ মিনিটে প্লেনটি যাত্রা শুরু করে। যেখানে থাই সময় বিকাল পাঁচটায় ল্যান্ড করার কথা, সেখানে বিমান পৌঁছায় রাত সাড়ে দশটায়। সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট ৮,০০০ একরের বিশাল এরিয়া জুড়ে অবস্থিত। কতো দেশের পতাকাবাহী বিমান উঠছে, নামছে এবং অপেক্ষমান। প্লেন থেকে নেমে ইমিগ্রেশন পর্যন্ত যেতে ৩০/৪০ মিনিট লেগে যায়। যেতে যেতে কতো দেশের কতো ধর্ম ও বর্ণের মানুষের আনাগোনা চোখে পড়ে। কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে, আবার কেউ অপেক্ষা করছে। সুবর্ণভূমি যেন বিশ্বেরই এক টুকরো চিত্র। অত্যন্ত আধুনিক, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্মার্ট সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে চালু হয়। আগে ব্যাংককের প্রধান এয়ারপোর্ট ছিল ডন মুয়েং। সে এয়ারপোর্টটি এখনো চালু আছে যদিও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট তুলনামূলক কম আসা যাওয়া করে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে পোপ ফ্রান্সিস যখন থাইল্যাণ্ড সফরে যান তখন তিনি ডন মুয়েং এয়ারপোর্ট ব্যবহার করেন।

যাই হোক রাত্রিবেলা শ্যামদেশ পৌঁছে কিছুতেই ঘোর কাটছিল না, যা দেখছি শুধু মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি আর ভাবছি কবে আমাদের এয়ারপোর্ট এমন সুন্দর ও স্মার্ট হতে পারবে। ইমিগ্রেশন পেরিয়ে ও লাগেজ সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে যাওয়া কিছু মার্কিন ডলার ভাঙ্গিয়ে থাই বাহত (স্থানীয় মুদ্রা) সংগ্রহ করলাম। কিন্তু কপাল খারাপ আমাকে নিয়ে যেতে অফিস থেকে যাকে পাঠানো হয়েছিল তাকে কোনভাবেই খুঁজে পেলাম না। শেষ পর্যন্ত প্রাইভেট ট্যাক্সি ভাড়া করে এয়ারপোর্ট থেকে নননথাবুড়িতে অবস্থিত অফিসের দিকে রওনা দিলাম। রাতের আলো ঝলমল ব্যাংকক নগরী দেখতে ভালোই লাগছিল। কিন্তু আমার কোন ধারণা ছিল না এয়ারপোর্ট

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

থেকে অফিসের দূরত্ব ৩০ কিলোমিটারেরও বেশি। আর তাই ভাড়া বাবদ অনেকগুলো অর্থ গচ্চা দিতে হলো। আমরা কাছে ঠিকানা ছিলো, তাই গন্তব্যে পৌঁছতে কোন সমস্যা হয় নি। এক সপ্তাহের ট্রেনিংয়ে আরো পাঁচজন বিদেশি বন্ধুর সাথে পরিচয় হলো - জুডিথ জেলেন্জ (মঙ্গোলিয়াবাসী হাঙ্গেরীয়), ডানিয়েল টে (সিঙ্গাপুর), আয়াজ গুলজার (পাকিস্তান), কাঙ্গনা কেও (কম্বোডিয়া) এবং প্রিয়াতনো আর্ডি (ইন্দোনেশিয়া)। বর্তমানে আমি ব্যতিত তাদের কেউ আমার প্রতিষ্ঠান ইউকানে কর্মরত নেই। তবে তাদের সবার সাথে বন্ধুত্বসুলভ যোগাযোগ অব্যাহত আছে। পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রতি সন্ধ্যায় আমরা তৎকালীন চিফ এডিটর ব্রিটিশ নাগরিক জুলিয়ান গিয়ারিং এর নেতৃত্বে বাইরে ঘুরতে ও ডিনার করতে যেতাম। জুলিয়ান আমাদেরকে ব্যাংককের অপূর্ব সুন্দর নদী চাও ফ্রায়া, তার তীরবর্তী সাংগ্রিলা হোটেল, নিকটবর্তী দি মল শপিং সেন্টার, বিখ্যাত সিয়াম প্যারাগন মল এবং সিনেমা দেখাতে নিয়ে যান। এছাড়াও তিনি জানান কেনাকাটা করতে চাইলে আমরা চাতুচাক মার্কেটে যেতে পারি যেটা সাপ্তাহিক ছুটির দিন শনি ও রবিবার বসে। ব্যাংকক ও অন্যান্য শহর নানা ধরনের সুস্বাদু স্ট্রিট ফুডের জন্য বিখ্যাত। স্বল্প মূল্যে কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সবখানে পাওয়া যায়।

কয়েকদিনেই বুঝতে পারলাম থাইরা মানুষ হিসেবে খুবই শান্ত, নম্র, ভদ্র, আন্তরিক এবং আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইংরেজি ভাষা না জানলেও তারা যেকোনভাবে বিদেশি মানুষকে সাহায্য করতে কার্পন্য করে না। তাদের মধ্যে মানুষকে ঠকানোর কোন চিন্তাও কাজ করে না। নিজ দায়িত্বে তারা সর্বত্র পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে। রাস্তাঘাট বা রেস্টুরেন্ট যেখানেই হোক নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া কোথাও কেউ ময়লা ফেলে না। তারা অনেক আনন্দপ্রিয়, কিন্তু সবকিছু করে নিয়মের মধ্যে থেকে। ব্যাংককে ঠিকানা জানলে ও কিভাবে যেতে হয় জানলে যাতায়াত করা কোন ব্যাপার না। পুরো শহর জুড়ে মেট্রো রেল চলে, যা ব্যাংকক ট্রেন সার্ভিস (বিটিএস) নামে পরিচিত। ট্যাক্সি ও মোটর সাইকেল সুলভে ভাড়া করা যায়। বাস ও ট্রেনে করেও বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়, ভাড়াও কম। ব্যাংককের নৈশ জীবন বিখ্যাত ও কুখ্যাত, তবে সবখানে নিয়মমাফিক চলে, তাই অপরাধের মাত্রা খুবই কম। আরো একটা জিনিস জানলাম যে ব্যাংকক ও তার আশেপাশের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি স্বচ্ছল আর উত্তরের মানুষেরা কিছুটা গরীব। আর তাই আলো ঝলমলে অত্যাধুনিক শহরেও কয়েক জায়গায় ভিক্ষুক দেখলাম এবং আরো দেখলাম গরীব মানুষের কিছু দরিদ্র আবাস। বিশাল শহরে কখনো কখনো ট্রাফিক জ্যাম হয় তবে তা ঢাকার মতো দুর্বিসহ নয়। জ্যাম এড়াতে চাইলে বিটিএস বা এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করলে চলে।

ট্রেনিং শেষে ২৭ তারিখ বিকেলে জুলিয়ান, তার থাই স্ত্রী সিয়াম নানারা, হাঙ্গেরীয় ফটো এডিটর ইরিয়া হালাজ, জুডিথ, আয়াজ এবং আমি গাড়িতে করে ব্যাংকক থেকে প্রায় দুইশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হুয়া হিন যাত্রা করি। ইরিয়া তার প্রিয় মঙ্গোলিয়ান কুকুর মি. সাগানাকে সাথে নিয়ে যায়। রাত দশটায় আমরা নির্ধারিত সাবাই জাই রিসোর্টে পৌঁছাই এবং দেখলাম সি বিচ একদম লাগোয়া। কাপড় বদল করে আমরা খুব দ্রুত বিচে চলে যাই। আমি বেশি

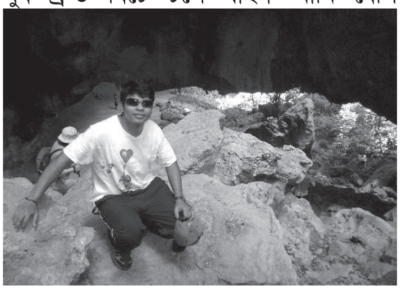

থাইল্যান্ডের হুয়া হিন সমুদ্র সৈকত তীরে ফ্রেয়া নাকর্ন গুহায় লেখক

উত্তেজিত ছিলাম কারণ বাংলাদেশে থাকলেও আমার এর আগে কোনদিন সমুদ্র দর্শন করা হয় নি। তাই জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখলাম ও স্পর্শ করলাম থাইল্যান্ড গিয়ে। অনেক রাত পর্যন্ত বিচের পাড়ে ছিলাম এবং অনেক গল্প করলাম। হালকা ডিনার করে আবারো কিছুক্ষণ সাগর পাড়ে হেঁটে তারপর ঘুমাতে যাই। হুয়া হিন মূলত থাইদের মধ্যে জনপ্রিয় পর্যটন শহর। বিদেশিরা এখানে কম যায়। তাই অনেক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরিবিলি। হুয়া হিন দুইদিন ছিলাম এবং এ সময়ের মধ্যে সেখানকার দর্শনীয় স্থান - বানরের জন্য খ্যাত চপস্টিক মাউন্টেন, খাও সামরিয়ত ন্যাশনাল পার্ক, খাও গোলক মাউন্টেন ও বিচ এবং হুয়া হিন শহরে ঘুরে বেড়াই।

৩০ মার্চ দুপুরে আমরা ব্যাংকক ফিরে আসি, কারণ আমার ও আয়াজের ফেরার তারিখ ছিল ৩১ মার্চ সকালে। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে খুবই খারাপ লাগছিল এবং আরো মন খারাপ হচ্ছিল সুন্দর দেশটিকে ছেড়ে যেতে। কিন্তু ফিরে যেতে তো হবেই, উপায় নেই। এরপর আরো নয়বার থাইল্যান্ড যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। ব্যাংকক ছাড়াও হুয়া হিন এবং প্রমোদ নগরী পাতায়া গিয়েছি একাধিকবার। কিন্তু প্রথম প্রেম যেমন ভোলা যায় না, তেমনি প্রথম বিদেশ ভ্রমণটি স্মৃতির মণিকোঠায় চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে।।

উদাস পথিকের কবিতা

বাংলা নববর্ষঃ ১৪৩২

বাংলা নববর্ষ
যাপিত জীবনের সুখ দুঃখ
আনন্দ-বেদনার একাত্ম বন্ধনে
বাংলা নববর্ষ প্রাণে দোলা দেয়
নব-চেতনা ও আনন্দ গানে।

বাংলা নববর্ষ
ফসলী-হিসাব, কর-দেনা-পাওনা
ব্যবসায়ী হাল-নাগাদের বার্তা নিয়ে
নতুনভাবে আরম্ভের চেতনার দুয়ারে
বাংলা নববর্ষ ঘুরে ফিরে আসে বারে বারে।

বাংলা নববর্ষ
দেশজ সংস্কৃতির চেতনা, গুড়-মুড়কি-মোয়া
খাগড়াই-বাতাসা-জিলাপীর সুঘ্রাণে
দৈ-চিড়া, মিষ্টি-মধুর খাবার আয়োজনে
বাংলা নববর্ষ চেতনা জাগায় হৃদয় গভীরে।

বাংলা নববর্ষ
রৌদ্র-খর তাপের মাঝে-বৃষ্টি-বাতাসে
প্রাণের ছোঁয়ায় ভিজিয়ে ঊষর প্রকৃতি,
মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিলে
প্রকৃতির মাঝে সজীবতা আনে।

বাংলা নববর্ষ
বয়ে আনে বর্নিল উৎসব,
কবিতা-গান-ভাটিয়ালী
দেশীয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জোয়ার বহে
প্রাণে প্রাণে
গ্রামীণ বাংলার সার্কাস-মেলা,
লোক-সংস্কৃতিতে পাখা মেলে
নতুন চেতনার, দিক-বিদিক আনন্দে
শিহরিত নাচ-গান কীর্তনের মুর্ছনায়।

বাংলা নববর্ষ
ফসলী উৎসব তথা গ্রামীণ জীবনের
কথা বলে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণায়
নবীনতার ডাক দিয়ে যায় বৈশাখী উৎসব
বাংলা মায়ের নিবিড় ভালোবাসা ভরে হৃদয় মন।

বাংলা নববর্ষ
উত্তাল আনন্দ বয় শহর-নগরে
গ্রাম-গঞ্জে, মিছিল-শোভাযাত্রা
আলপনা রেখা, মঙ্গলময় বাণী
শুভেচ্ছা-গান-কীর্তন কথা বলে হৃদয়ে।

বাংলা নববর্ষ
শিকড়ের অন্বেষণে খুঁজি ফিরি মাঠ-ময়দানে
পোশাক-আশাক, পান্তা-ইলিশ সানকিতে
মেঠো জীবন আর মাটি মানুষের সখ্যতায়
বাংলা নববর্ষ প্রেরণা জোগায়
বাঙ্গালী হয়ে বেঁচে থাকার
হাজার বছরের প্রত্যাশা।

হার্ট অ্যাটাক কেন হয়, লক্ষণ ও তাৎক্ষণিক করণীয়

নানা কারণেই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক এর চিকিৎসা করাতে না পারলে তৈরি হয় ঝুঁকি। ফলে এর জন্য সচেতন থাকা অত্যাবশ্যক। হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ও উপপরিচালক ডা. কাজল কুমার কর্মকার।

হার্ট অ্যাটাক কী, কেন হয়

ডা. কাজল কর্মকার বলেন, হার্ট বা হৃদযন্ত্র রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় পাম্প হিসেবে কাজ করে সারা শরীরে রক্ত সরবরাহ করে মাসক্যুলার অর্গান বা পেশিবহুল অঙ্গ সচল রাখে।

হার্টের চারটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। সারা শরীর থেকে ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রথমে হৃৎপিণ্ডের রাইট অ্যাট্রিয়াম বা ডান অলিন্দে প্রবাহিত হয়, সেখান থেকে রাইট ভেন্ট্রিকল বা ডান নিলয়ে যায়। এরপর পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে পাঠানো হয় অক্সিজেনের জন্য। এরপর অক্সিজেনযুক্ত রক্ত হার্টে ফিরে আসে লেফট অ্যাট্রিয়াম বা বাম অলিন্দে প্রবেশ করে লেফট ভেন্ট্রিকল বা বাম নিলয়ে যায়। এরপর রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় পাম্প হিসেবে কাজ করে সারা শরীরে রক্ত সরবরাহের মাধ্যমে শরীর সচল রাখে।

হার্ট নিজেও একটি মাসক্যুলার অর্গান। হৃদযন্ত্রের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য হার্ট অক্সিজেনযুক্ত রক্ত নেয় করোনারি ধমনির মাধ্যমে। করোনারি আর্টারি তিনটি- লেফট করোনারি আর্টারি, রাইট করোনারি আর্টারি ও লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিজেন্ডিং আর্টারি।

এই তিনটি আর্টারি বা ধমনির মধ্যে কোনো কারণে যদি কিছু অংশ বা পুরোপুরি ব্লক হয়, তাহলে হার্টের সমস্যা দেখা দেয়। পার্সিয়াল বা অংশত ব্লক হলে তাকে অ্যানজাইনা পেকটোরিস বলা হয়। আর সম্পূর্ণ ব্লক হলে তাকে বলা হয় হার্ট অ্যাটাক।

হার্ট অ্যাটাক কাদের হয়

১. বংশগত বা জেনেটিক কারণে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। কারো বাবা-মা কিংবা কাছের স্বজনদের হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকলে তাদের ঝুঁকি বেশি।

২. অতিরিক্ত অ্যালকোহল ও ধূমপান।

৩. অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস।

৪. অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ।

৫. অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা।

৬. শারীরিক ওজন কম, কিন্তু রক্তে কোলেস্টেরেল বা অতিরিক্ত চর্বি বেড়ে গেলেও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

৭. কায়িক পরিশ্রম, ব্যায়াম ও হাঁটাহাঁটি না করা, শুয়ে-বসে থাকা।

৮. মানসিক চাপ, উদ্বেগ, বয়স, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণেও হতে পারে।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ

১. হার্ট অ্যাটাকের প্রধান লক্ষণ বুকে ব্যথা হওয়া। দুই বুকের মাঝখানে মুষ্টিবদ্ধ হাত রাখলে যেটুকু জায়গা এটাকে রেট্রোস্টার্নাল পেইন বলা হয়। ভেতর থেকে ব্যথা হবে আর এই জায়গার ব্যথাকেই হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা বলে।

২. বুকের ব্যথা একসময় বাম হাত ও ঘাড়ের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। চোয়াল, পেটেও ব্যথা হতে পারে।

৩. হার্ট অ্যাটাকের তীব্রতা বেশি হলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, কাশি হতে পারে।

৪. প্রেসার কমে গিয়ে অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে।

৫. বুকের ব্যথার তীব্রতা বেশি হলে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে রোগী।

৬. অনেক সময় বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. বুক ধড়ফড় করা।

হার্ট অ্যাটাক হলে তাৎক্ষণিক করণীয়

ডা. কাজল কর্মকার বলেন, হার্ট অ্যাটাক এমন একটি সমস্যা যার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে রোগী যেকোনো সময় মারা যেতে পারে। বুকে ব্যথা অনুভূত হলে, হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ মনে হলে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে জরুরি স্বাস্থ্য সেবায় (৯৯৯) ফোন করতে পারেন।

আক্রান্ত ব্যক্তি যেন বেশি নড়াচড়া না করেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শান্ত থেকে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। রোগী যদি জ্ঞান হারায় বা শ্বাস নিচ্ছে না এমন হলে সঠিক নিয়মে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন বা সিপিআর দিতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে সিপিআর কীভাবে দিতে হয় সেটি জানেন এমন কোনো ব্যক্তি ছাড়া না জেনে যে কেউ সিপিআর দিতে পারবেন না।

আক্রান্ত ব্যক্তিকে অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধ অ্যান্টি প্লাটিলেট ড্রাগ দেওয়া যেতে পারে, যা রক্ত তরল করার জন্য ও ধমনিতে রক্ত প্রবাহে বাধা কমাতে সহায়ক।

কারো যদি আগে থেকে হার্টের সমস্যায় নাইট্রোগিসারিন জাতীয় ঔষধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসক, তাদেরকে তাৎক্ষণিক অবস্থায় জিহ্বার নিচে ওই ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। অন্যদের বেলায় দেওয়া যাবে না।

হার্ট অ্যাটাক হলে পালস রেট কমে যায়। এ সময় কাশি দিলে রিফ্লেক্স হয়, যার ফলে প্রেসার বাড়ে এবং হার্ট রেটও বেড়ে যায়। সেজন্য কাশি দিতে বলা যেতে পারে রোগীকে।

চিকিৎসা

ডা. কাজল কর্মকার বলেন, ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কি না, সেটি নিশ্চিত হবে। তাৎক্ষণিকভাবে রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে রক্ত যাতে জমাট না বাঁধে, চর্বি না জমে সেজন্য রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করা ও রক্ত তরল করার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয় রোগীকে। প্রেসার, গ্যাস্ট্রিক, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরেল থাকলে, ঘুম না হলে সেগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঔষধ খেতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শে। একই সঙ্গে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনে পরিবর্তন আনতে হবে।

এ ছাড়া আধুনিক চিকিৎসা হিসেবে অ্যানজিওগ্রাম করা হয়। হার্ট অ্যাটাকের পর অ্যানজিওগ্রাম করা যেতে পারে, আবার পরেও করা যেতে পারে। অ্যানজিওগ্রামের মাধ্যমে দেখতে হবে হার্টের ব্লক আছে কি না। যদি বেশি ব্লক থাকে, তাহলে বাইপাস করতে হবে। আর যদি কম ব্লক অর্থাৎ এক বা দুইটা ব্লক থাকে তাহলে রিং পরানো যেতে পারে। হার্টের চিকিৎসায় রক্তনালীর ব্লক দূর করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক বা পুনঃপ্রতিস্থাপন করাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিরোধ

১. জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

২. সকালে ও বিকেলে নিয়মিত ৩০-৪৫ মিনিট হাঁটা ও ব্যায়ামের অভ্যাস করতে হবে।

৩. অ্যালকোহল ও ধূমপান পরিহার করতে হবে।

৪. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, জাঙ্ক ফুড, অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিহার করতে হবে।

৫. ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, প্রেসার, কোলেস্টেরেল থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৬. পরিবারে যদি হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস থাকে, তাদের ২০ বছর বয়সের পর থেকেই নিয়মিত চেক আপ করাতে হবে।

৭. উদ্বেগ, মানসিক চাপমুক্ত থাকতে হবে, ঝগড়া কিংবা জোরে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সৌজন্যে: দ্যা দেইলী স্টার বাংলা

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার ৮৫ বছর

পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৩ এপ্রিল - ১৯ এপ্রিল, ৩০ চৈত্র ১৪৩১ - ৬ বৈশাখ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ

রাগ যখন পানি

শিউলী রোজলিন পালমা

হেলেনের উপর কণার রাগ এবার তুঙ্গে উঠে গেল। এবার আর তাকে ক্ষমা করা হবে না। হেলেন কণার বাসা পরিষ্কারের কাজে সহায়তা করে। কণা আজই তাদের বিল্ডিং-এর কেয়ার টেকারকে দায়িত্ব দেবে যেন অন্য একটি মেয়ে ঠিক করে দেয় ঘর পরিষ্কারের জন্য। অন্য মেয়ে পাওয়া না গেলেও হেলেন আসা মাত্রই তাকে জানিয়ে দেয়া হবে তার কাজ আর চলমান থাকবে না। কণার রাগের যথেষ্ট কারণ আছে, সে হেলেনকে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দিয়েছে যেন অন্তত এই বাসায় সে তুলনামূলকভাবে আরামে কাজ করতে পারে। সপ্তাহে একদিন তাকে ছুটি দেয়া হয়েছে, কারণ একজন মানুষ বিরতিহীনভাবে দিনের পর দিন কাজ করবে এটা বড়ই অমানবিক বলে মনে হয় কণার।

কণার বাসায় হেলেন একটি কাজই করে তাহলো ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঘর মুছে দেয়া। কাজের তুলনায় বেতন একটু বেশিই দেয়া হয়। তাই পরিবারের সদস্যদের দিক থেকে চাপ আছে যে, তাকে যে বেতন দেয়া হচ্ছে তাতে তার কাছ থেকে কাপড় কেঁচে নেয়া উচিত। কিন্তু কণা সেটা করে না। সমস্যাটা হল- কণার হালকা পাতলা শুচিবায়ুর সমস্যা আছে, সে নিজ হাতে কাপড় কাঁচা, মাছ কাটা, শাক সবজি কাটা ও প্লেট গ্লাস ধুতে পছন্দ করে, নতুবা সে স্বস্তি পায় না। হেলেন তার কণা খালার মনোভাব বুঝে যথেষ্ট সময় নিয়ে ঘর পরিষ্কারের চেষ্টা করে, কিন্তু কণা তবুও তার পায়ের তলায় হালকা ধূলা অনুভব করে। হেলেন ঘর সাফ করতে পানির সাথে একেক দিন একেক উপকরণ ব্যবহার করে, একদিন গুড়া সাবান, একদিন লাইজল, একদিন স্যাভলন, কিন্তু যেটা ব্যবহার করলে কোন উপকরণেরই দরকার হবে না সেটাই সে ব্যবহার করে না। সেটা হল গায়ের শক্তি বা জোর। কণা অবশ্য বুঝে জোর দিয়ে ঘর পরিষ্কারের মত শক্তি হেলেনের নেই, আর থাকবেই বা কিভাবে চার/পাঁচ বাসার হাঁড়ি বাসন, বাথরুম, বেসিন, কমোড, বাথটাব মাজতে মাজতে ওর হাতের শ্রী এবং শক্তি দুটোই প্রায় শেষ। তাই শুচিবায়ুর সমস্যা থাকলেও ঘর পরিষ্কার নিয়ে কণা হেলেনের সাথে পীড়াপীড়ি করে না, সে প্রতি শনিবার হেলেনের অনুপস্থিতির দিনে মনের মত করে ঘরটাকে ঘষে-মেজে নেয়।

হেলেন না এলে কাজ নিয়ে কণার সমস্যা নেই, কণা খুশি মনেই কাজটা চালিয়ে নেয়। কিন্তু সমস্যা হল, হেলেন নিয়ম মানবে না কেন? প্রত্যেকেরই তার দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা উচিত। গত তিনমাসে তিনবার বাড়ি গিয়ে দুদিনের কথা বলে পাঁচদিন করে থেকে এসেছে। প্রথমবার গিয়েছে বাড়িতে রান্না ঘর তুলতে, দ্বিতীয়বার গিয়েছে বোনের কাছ থেকে কেনা জমি রেজিষ্ট্রি করতে। কণা সহ্য করেছে, কারণ মেয়েটি অনেক পরিশ্রম করে তার অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা অব্দি চারটি বাসায় ও একটি মেসে কাজ করে, স্বামী রিক্সা চালায়। স্বামীর টাকায় অনেক কষ্টে সংসার চলে আর তার বেতনে চলে ঋণের কিস্তি, ঋণ করেই ঘর করেছে, জমি কিনেছে। তার উপর দায়িত্বও আছে- ভাই নেই বলে গ্রামে মা-বাবাকে ও শ্বশুড়-শ্বাশুড়ীকেও টাকা পাঠাতে হয়। সহ্য করার আরেকটি কারণও আছে, সেটা হল মায়া। হেলেনকে প্রথম দেখার দিন নাম জিজ্ঞেস করতেই যখন বলেছিল- হেলেন, তখন কণা ওর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে ভেবেছিল, সত্যিই মেয়েটি 'হেলেন অব ট্রয়'- এর মতোই সুন্দরী। মায়া পড়ে গেল মেয়েটির প্রতি। কিন্তু মেয়েটির রূপ-সৌন্দর্য, তেল চিটচিটে চুল, ময়লার আস্তরণ পড়া ত্বক ও পুরোনো, রংচটা, অপরিচ্ছন্ন পোশাকের মাঝে হারিয়ে গেছে। কণার মনটা নরম হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল- যদি হেলেন তার চুলে শ্যাম্পু করতে পারতো! পার্লারে গিয়ে পছন্দের হেয়ার স্টাইল করতে পারতো! প্রতিদিন যদি ত্বকের যত্ন নেয়ার সময় বের করতে পারতো! যদি আড়ং থেকে কিনতে পারতো তার পছন্দের পোশাক! তবে ওর সৌন্দর্যের সামনে অনেক টিভি মডেলও ম্লান হয়ে যেত! কিন্তু এটা সম্ভব নয়। এখানে হেলেনের কোন দোষ নেই, দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছে তাই জীবনের অনেক কিছুই লাভ করার ও ভোগ করার সুযোগ তার হবে না। তবুও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে হেলেন পরিশ্রম করতে শিখেছে এবং তার ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছে যা একটি সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

প্রথম দুইবার জানিয়ে গেলেও তৃতীয়বার না জানিয়েই হেলেন অনুপস্থিত। দুইদিন সহ্য করে কণা ফোন করলো হেলেনের স্বামীর কাছে- হেলেন কোথায়?

- খালা আমরা বাড়ি আইছি, হেলেনের বাবা খুব অসুস্থ, হঠাৎ খবর পাইয়া আমরা চইলা আসছি, আসার আগে আপনেরে ফোন করছিলাম কিন্তু ফোন ঢুকে নাই।

ফোন করছি, ফোন ঢুকে নাই এগুলো বহুবার কণা শুনেছে এবার সে ভীষণ বিরক্ত, আর মাফ নেই, একটাই কথা হেলেনের কাজ নেই। এমনই যখন সিদ্ধান্ত তখনই হেলেন এসে উপস্থিত। কণা কোন কথা বলছে না, হেলেন ভয়ে ভয়ে বলল, খালা আমার আব্বা খুব অসুস্থ হইয়া পড়ছিল, আব্বারে দেইখ্যা পরের দিনই আইসা পড়তাম কিন্তু আমার আপন ননাস হঠাৎ মারা গেছে। রাইতে ভাল মানুষ ঘুমাইছে, ঘুমের মধ্যেই মারা গেছে। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। আমার ননাসের জামাইয়ের এখন বড় বিপদ। আগে ঝালমুড়ি বেঁচত, এখন ঝালমুড়ির মশলা রান্না কইরা দিব কে? আমার ননাসের জামাইয়ের আবার একটা হাত নাই। আগে বউয়ে মশলা রান্‌তো, গোসল করাইতো, এখন ছেলেমেয়ের উপর চাপ পড়ছে, অরা ইস্কুলে যাইব না কাম করব?

কণা প্রশ্ন করে, কি হয়েছিল হাতে?

- কি হইয়া জানি হাতটা পইচা গেছিল, পরে কাইটা ফালাইছে।

কণার মন খারাপ হয়ে যায়, কত বিপদে ভরা মানুষের জীবন!

কিছুটা থেমে হেলেন আবার বলে, এদিকে খালা, আমার ছোট বইনের জামাইয়ের উপর গাছ পইড়া মাথা ফ্যাইটা গেছে, সাতটা সেলাই লাগছে।

- গাছ পড়ল কিভাবে?

- খালা, গাছ কাটার কাম করে, গাছ কাইট্যা বেঁচে, দড়ি বাইন্ধ্যা গাছ টান দিছে একদিকে, গাছ লাফ দিয়া মাথার উপর আইসা পড়ছে, মরারই কথা আছিল তবুও আল্লাহ্ রহম করছে বইল্যা বাঁইচ্যা গেছে।

- কণা বিমর্ষ হয়ে যায় ভাবে আমরা এসি রুমে, চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করি আর মানুষ বেঁচে থাকার জন্য জীবনের কত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। সামান্য সামান্য বিষয়ে আমাদের রাগ করা একদম ঠিক হবে না। হেলেনের উপর কণার সব রাগ পানি হয়ে যায়। ❑

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

তোমার চলে যাবার ছয়টি বছর

Robin Rozario
Born: 4th May 1947
Died: 23rd March 2019

প্রয়াত রবীন রোজারিও
জন্ম : ৪ মে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার প্রিয় পুত্রগণ, কন্যা, স্ত্রী, নাতি-নাতনী, পরিবার-পরিজনসহ অসংখ্য প্রিয়জনদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছো। তোমাকে ছাড়া আমাদের গৃহ শূন্য তোমার স্পর্শ আজও পরিবারে জড়িয়ে আছে।

পরম করুণাময় প্রভুর কাছে আমাদের একটি চাওয়া তিনি যেন তোমাকে তাঁর আশ্রয়ে রাখেন। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমার শোকার্ত পরিবার
ছেলে-পুত্রবধু, মেয়ে-মেয়ে জামাই,
নাতী-নাতনীগণ, আপনজনেরা ও
স্ত্রী : প্রণতি রোজারিও

মহাখালী খ্রিস্টান পাড়া
গ্রামের বাড়ি : দড়িপাড়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

তোমাদের স্মরি

সুপ্রিয়ান রোজারিও

সিলভেস্টার রোজারিও

ড্যাঞ্জেল রোজারিও

ডানিয়েল কুলেন্তনু

টাইনি রোজারিও

রেখা রোজারিও

উষা রাণী পালমা

"সত্যনিষ্ঠা বিনম্রতার আদর্শ করে দান
আত্মত্যাগের পরম ব্রতে হল তারা মহীয়ান
ভালোবাসার প্রতীক হয়ে রইল অনুক্ষণ।"

ঈশ্বরের অসীম দয়ায় ও ভালোবাসায় তোমরা এ পার্থিব জগৎ থেকে স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করেছ। তোমরা আজও আছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা আদর্শ জীবন-যাপন করতে পারি এবং তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি।

শোকার্ত চিত্তে
তোমাদেরই সংসার পরিজন
করান, নাগরী ধর্মপল্লী।

দাও প্রভু দাও তাদের অনন্ত জীবন

বেঞ্জামিন ডি'ক্রুশ
জন্ম: ১২ মে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৮ জানুয়ারি, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

শীলা ডি'ক্রুশ
জন্ম: ১০ নভেম্বর, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ মার্চ, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

আশীষ পিটার গমেজ
জন্ম: ৪ এপ্রিল, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৬ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

তাপস ইগ্নেসিয়াস গমেজ
জন্ম: ২৭ নভেম্বর, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

তোমরা আপন কাছের স্বজন, স্বর্গে রয়েছে এখন,
মৃত্যু পারেনি আলাদা করতে, সুখের জীবন-যাপন।
অমৃতধামে পেয়েছে পরম, শান্তি সুখের পরশ,
আমাদের দাও এই পৃথিবীতে
অন্তর-মনের হরষ।

চিরশান্তি কামনায় শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
লুসি ডি'ক্রুশ
মঠবাড়ি।

স্বপরিবারে বিদেশে স্যাটেল/স্টাডি/জব ভিসা

JAPAN

* মাত্র ৩-৬ মাসের মধ্যে জাপানে একা অথবা স্বপরিবারে স্থায়ী বসতি গড়ার সুযোগ ঃ নূন্যতম SSC পাস হলেই চলবে।
* জব ভিসা: Int'l Service Category-তে নিশ্চিত জব ভিসা। যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা/ব্যাচেলর/মাস্টার্স হতে হবে। বয়স: ২৫-৪০ বছর।
* স্টাডি ভিসা: ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম/ ব্যাচেলর/ মাস্টার্স ও পি এইচ ডি ডিগ্রিতে পড়াশোনায় সীমিত সুযোগ রয়েছে।

ROMANIA

* WORK PERMIT VISA : ২২-৪৮ বছর (রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার ও ফুড ডেলিভারি জব)
* স্টাডি ভিসাঃ ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম/ব্যাচেলর/ মাস্টার্স/পি এইচ ডি ডিগ্রী

Worldwide visit visa processing

একই সাথে- USA/Canada/Uk/Australia/New Zealand/S.Korea/Austria/Italy/Norway/Denmark/Sweden/Finland/Russia-তে ভর্তি ও ভিসা প্রসেসিং চলছে।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)

হেড অফিস: বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২
(আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
info@globalvillagebd.com

প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপের জন্য প্রাথমিক সহযোগিতা দিয়ে থাকি।

আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত ২২ বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।

আগ্রহী খ্রিস্টভক্তগণ আজই যোগাযোগ করুনঃ
+8801901-519721
+8801901-519723
+8801827-945246
@globalvillageacademybd

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

William Carey International School

(An Exclusive English Medium School) Govt. Reg. No.23/English (EIIN: 903421)

CAMBRIDGE International Education — Cambridge International School

Our Facilities

- Spacious Playground
- Reliable Standby Power Supply
- Air-Conditioned Classrooms
- Innovative Teaching Methods
- Modern Teaching Methodologies
- Health and Wellness Programs
- Dedicated Areas For Creative Learning
- Extra-Curricular Activities to Foster Skills
- Clubs (Science, Debating, Environmental, Cultural)

Session July 2025 to June 2026

ADMISSION OPEN

Playgroup to O' Level

Advanced Computer & Multimedia Resources

Using advanced technology in the curriculum equips students with essential digital skills, enhances interactive learning, and prepares them for future academic and career challenges.

CCTV Secured Premises

Our campus is fully secured with CCTV Surveillance, ensuring a safe learning environment for students and peace of mind for parents.

INDIVIDUAL DEVELOPMENT

This approach ensures each student gets personalized attention through modern educational technologies, boosting engagement and academic success.

REGISTER NOW www.wcischool.org

Bangladesh Baptist Church, 70-D/1, Indira Road, (West Razabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Phone: +88 02-4102-6113, Mob: 01989283257

DHAKA CAMPUS

ADMISSION OPEN

Session July 2025 to June 2026

Playgroup to STD-X

WHY CHOOSE US?

- Innovative teaching methods
- Dedicated Educators
- Extracurricular opportunities
- Inclusive Community
- CCTV Secured Premises

OUR FACILITIES

- Digital Class Room
- Spacious Playground
- Dedicated Areas for Creative Learning
- Reliable Standby power supply
- Air-Conditioned Classrooms
- Transportation
- Health & Wellness program
- Clubs (Science, Debating, Environmental, Cultural)

ABOUT SCHOOL

Join our Cambridge-registered, English medium school for a balanced education that excels in academics and character building. With top-notch facilities and dedicated educators, we ensure every child thrives. Enroll now for a brighter future!

REGISTER NOW www.wcischool.org

YMCA International Building, B-2 Jaleswar, Radio Colony Bus Stand, Savar, Dhaka-1343
Mobile: 01709091205, 01709127850

SAVAR CAMPUS

"Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it."- Proverbs 22:6

আর্নেষ্ট আলম ডি. কস্তা
সূর্যোদয় : ১ মার্চ, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
সূর্যাস্ত : ১২ এপ্রিল, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন (যোহন ১১:২৫)

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে, ...
যখন জমবে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়, ...
তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা, নিরালায় নিভৃতে বসে নীরবে শুনি তোমার মধুর কণ্ঠে গেয়ে যাওয়া কত গান।
বাতাসে ধ্বনিত রণিত কত কথা, পথ চেয়ে দেখি মন্থর গতিতে হেঁটে চলার অপূর্ব ছবি।
কে বলে তুমি নেই? তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় গভীরে।
তোমার পদচিহ্ন, হাতের ছোঁয়া, মধুর দৃষ্টি- সে তো চির জাগ্রত, চির জীবন্ত নীলাকাশের উজ্জ্বল তারার মত।
স্বর্গরাজ্যে তুমি রয়েছ পবিত্র ত্রিত্বের জয়গানে চির মুখরিত।
বাবা, তুমি মাকে ও তোমার সন্তানদের, নাতি-নাতনীদের, পুতি-পুতিনদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করো।

স্ত্রী	:	ফিলোমিনা নির্মলা গমেজ
ছেলে ও বৌমা	:	লরেন্স ডি. কস্তা ও এলিজাবেথ গমেজ
ছেলে	:	পঙ্কজ ডি. কস্তা
মেয়ে ও জামাই	:	ঊষা-প্রয়াত নিকোলাস, রীনা-সুশীল, শুভ্রা- জেমস, শিখা-সুজিত, সিম্মি- ডেনিস
মেয়ে	:	সিস্টার রেবা আরএনডিএম এবং সিস্টার মেরী আভা এসএমআরএ
নাতি-নাতবৌ	:	রুজভেল্ট-লিরা, ভিক্টর-রিমি, সুমন-প্রিয়াংকা, ব্লেইজ-মুমু, সুজন-সুইটি, প্রিন্স-পূজা, জেরী-কৃণা, জেসী-জিনা
নাতনী-নাতজামাই	:	এলিসন-অকসর
নাতি-নাতনী	:	কেলভিন, খ্রীষ্টফার, ম্যাথিও, ইভা, এমা, মারিসা, জেইডা, জেইক
পুতি-পুতিন	:	হৃদী, ক্লেইন, রাহী, এইডেন, নিকসন, অদ্রি, লিয়া, এলাইনা, ব্রুকলিন, এলা, নায়া, জিয়ানা, কালিন।

526 Abbey fields loop, Morrisville, NC 27560

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে –
ভক্তিপুষ্প * গীতাবলী * মঙ্গলবার্তা * খ্রিস্টযাগ রীতি
* খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
* ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
* এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ রচনাবলী বই
* 'যুগে যুগে গল্প'
* সমাজ ভাবনা
* প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
* বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
* খ্রীষ্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
* বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
* স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা
* উত্তরভঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান জনপদ

এছাড়াও রয়েছে – দুই সাইজের ক্রুশের পথের পুরো সেটের ছবি,
ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

অতিথি নারায়ণ

সাগর কোড়াইয়া

প্রচণ্ড গরম। বরেন্দ্র এলাকা বলে কথা। বৃষ্টির দেখা নেই অনেকদিন হলো। রাস্তায় ধুলো যেমন; আকাশে সূর্যের তাপও প্রখর। সকালবেলা মোটরবাইক চালিয়ে দূরের গ্রামে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেছি দুপুরে। ক্ষুধায় পেট চো চো করছে। শরীর ঘেমে একাকার। মোটরবাইকের রং পাল্টে গিয়েছে। ধুলার আস্তরণ এমনভাবে পড়েছে যে, নিজের বাইকে নিজেই চিনতে পারছি না।

তখন মাত্র চোখে মুখে একটু পানির ঝাঁপটা দিলাম। খবর এলো প্রায় বারো কিলোমিটার দূরের গ্রামে একজন মারা গিয়েছে। আগের দিন মারা গেলেও খবর এসেছে কেবল। দূরের আত্মীয়-স্বজনরা ইতিমধ্যে নাকি চলে এসেছে। সবাই প্রস্তুত। ফাদার এলেই কবরস্থ হবে।

কি আর করা। গ্রামে আবার দৌড়াতে হবে। জানি, গ্রামে পৌঁছে দেখবো এখনো প্রস্তুত নয়। তবে যদি প্রস্তুত হয়ে থাকে তাহলে আমার দেরীর কারণে আবার কথা শুনতে হবে বেশ। তাই দেরী না করে ঐ অবস্থায়ই রওনা দেওয়াটাকেই শ্রেয় বলে মনে করলাম।

রোদের তাপে মোটরবাইক চালানোও দুষ্করপ্রায়। তাপ চোখে-মুখে এসে লাগছে। মনে হচ্ছে যেন আগুনের শিখা মুখের চামড়া ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করবে। মুহূর্তেই গলা শুকিয়ে প্রায় কাঠ। কোথাও তেমন ছায়ার দেখা নেই। মাঠে ধান কাঁটা ইতিমধ্যে শেষ। মাঠ যে ফেঁটে চৌচির তা বুঝাই যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে হালকা বাতাস এসে মুখে লাগছে। অন্যরকম এক ভালোলাগার স্পর্শ অনুভব করি।

যাই হোক। অবশেষে গ্রামে এসে পৌঁছাই। আদিবাসী গ্রাম। হাতেগোনা কয়েকটি হিন্দু পরিবারও রয়েছে। গ্রামে প্রবেশ মুহূর্তেই লোকজনদের ভীড় দেখতে পেলাম। সবাই আমাকে দেখছে। বুঝতে পেরেছে যে, ফাদার চলে এসেছেন। পরিচিত অনেকে সামনে এগিয়ে আসে।

বাড়িটি গ্রামের একটু বাইরে। মোটরবাইক রেখে হেঁটেই যাই। বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি অনেক লোকজন বসে আছে। বাড়ির ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ইতিমধ্যে আমি ঘেমে একাকার। একটু দাঁড়ালাম। পকেট থেকে টিস্যু বের করে মুখের ঘাম মুছি।

আমার পেছনে একটি পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেলাম, ফাদার মাটি দেওয়ার পর আমাদের বাড়িতে ভাত খাবেন। লোকটিকে আমি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লোকটি বোধহয় আমার ইতঃস্ততবোধ বুঝতে পারলো।

আমাকে আরো অবাক করে লোকটি বললো, আমার বাড়ি এই গ্রামেই। আমি একজন হিন্দু।

লোকটির কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে বললাম, অবশ্যই যাবো।

লোকটির মুখে এক তৃপ্তির হাসি খেয়াল করলাম।

কবর দেওয়া শেষ হলো। ছায়ায় এসে দাঁড়ালাম। দেখি হিন্দু লোকটিও এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। দরদরিয়ে আমি ঘামছি। শরীরটা খুব দুর্বল লাগছিলো। বুঝতে পারলাম একঘটি ঠাণ্ডা জল হলে বেশ ভালো হয়।

মুহূর্তমাত্র; লোকটি বললো, ফাদার জলটুকু পান করে নিন। তাকিয়ে দেখি লোকটির পাশে একজন মহিলা জলের গ্লাস নিয়ে দাঁড়ানো।

বুঝতে পারলাম, মহিলা লোকটির স্ত্রী।

ধন্যবাদের দৃষ্টিতে তাকাতেই স্বামী-স্ত্রীর মুখয়োবে আনন্দের হাসি খেলে গেলো।

অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সাথে রওনা হলাম। হাঁটাপথে পাঁচমিনিট। গ্রামের শেষে হিন্দু পরিবার কয়টির বাস। জানতে পারলাম, যেকোন অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণে গ্রামের হিন্দু-খ্রিস্টান সবাই একসাথে উৎসব করে। কখনো কোনদিন গ্রামে মনোমালিন্য হয়নি বলেও জানলাম। শুনে ভালো লাগলো।

লোকটির অবস্থা মোটামুটি তা বাড়ির অবয়বেই বুঝা যাচ্ছে। কি করেন জিজ্ঞাসা করতেই বললো, রেল স্টেশনে একটি দোকান আছে। দোকানের আয় দিয়েই বেশ চলে যাচ্ছে। এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। ছোট ছেলেটা কলেজে পড়ে।

ভিতরের বাড়িতে প্রবেশ করতেই বালতি ভর্তি জল নিয়ে এলো স্ত্রীলোকটি। চোখমুখ, হাত-পা ধুইয়ে নিলাম। মুখ মোছার জন্য টাওয়াল এগিয়ে দিলো। হাতে নিয়েই বুঝতে পারলাম, একেবারেই নতুন। ভুর ভুর করে কর্পুরের গন্ধ বের হচ্ছে। বারান্দায় চেয়ার-টেবিল পাতা। বসলাম। সামনে রাখা টেবিল ফ্যানের বাতাসও প্রচণ্ড গরম লাগছে।

এবার বুঝতে পারলাম ক্ষুধা কাকে বলে। সেই সকালবেলা দু'টো রুটি খেয়ে বের হয়েছিলাম। এখন বেলা প্রায় গড়িয়ে এলো। কয়েক মুহূর্তমাত্র। স্ত্রীলোকটি খাবার এনে টেবিলে রাখলো। খাবার দেখে ক্ষুধার পরিমাণ বেড়ে গেলো আরো। যাই হোক। খাবার খেলাম তৃপ্তি সহকারে।

খাবার মনে হলো অমৃত। এমনই স্বাদ লাগলো, এখনো সে স্বাদ জিহ্বায় লেগে আছে।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো। তখন সবেমাত্র আমি ছাত্র। একটি মিশনে চল্লিশ দিনের জন্য গিয়েছি। দায়িত্বরত ফাদার বেশ হাস্যরসিক; পাশাপাশি ভোজন রসিকও। খাবারটেবিলে একদিন বললেন, আসলে খাবার সুস্বাদু বিষয়টা খুবই আপেক্ষিক। পেটে ক্ষুধা না থাকলে সুস্বাদু বলতে কিছু থাকে না। পেট যদি ভরা থাকে তাহলে খাবার যতই স্বাদের থাকুক না কেন তা গলধঃকরণ অসম্ভব। আবার ক্ষুধা অনুভূত হলে সাদা ভাতও অমৃত বলে মনে হয়।

হয়তোবা আমার এমনই অবস্থা হয়েছে। তবে সত্যি বলতে, আমার ক্ষুধা ও খাবারের স্বাদের কম্বিনেশনটা ছিলো চমৎকার।

খাওয়ার পর্ব শেষ করে গল্প করছি। কৌতুহলবশত আমাকে খাওয়ানোর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তাদের উত্তর শুনে আমি অবাক! লোকটি বললো, ফাদার আমাদের ধর্মে অতিথি নারায়ণ। অতিথি সেবা করা হচ্ছে ঈশ্বরকে সেবা করা।

লোকটির কথা আমি নীরবে শুনে গেলাম। বাইবেলের বাক্যটি মনে পড়ে গেলো, 'আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে। তৃষ্ণার্ত ছিলাম, দিয়েছিলে জল"। ❑

বাঘিনী কন্যার বিয়ে

সুনীল পেরেরা

যশু অর্থাৎ যোসেফ জমাদারের বাড়ির কাজের ছেলেটার নাম বকুল। কাজের ছেলে বলে তাকে কেউ এ নামে ডাকে না। সবাই তাকে বকু বলেই ডাকে। একমাত্র শীলাদি তাকে বকুল বলে ডাকে। বকুলের রোগা ডিগডিগে চেহারা। ওর বাবা বিনু গাছি এ বাড়িতে বাঁধা কামলা ছিল। আর মা ছিল রাঁধুনী। সেই সুবাদে নাবালক বকুও এ বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে সেই ছোটবেলা থেকে।

বকুর কথাবার্তায় কোন সাহিত্য নেই, নেই কোন ভাষার সৌন্দর্য। তবু ওর কথায় সবাই মজা পায়। মজু দোকানদারও তাকে খাতির করে দু'দন্ড বসিয়ে রাখে। এসবের কারণ, বকু সময় সময় গলায় কৌতুকের শব্দ তুলে নাটুকে ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে। শীলাদির কিছু শহুরে ভাষাও ইতোমধ্যেই রপ্ত করেছে। বকুর গলায় তাবিজের মতন কি একটা কালো সূতায় বেঁধে রেখেছে। বলে ওটা তার মায়ের আশীর্বাদ।

বকু অল্প বয়সেই ক্ষেতে খামারে কাজে যায়, বাড়ির কর্তা যশু মামার সাথে বাজার করে। ওর সমস্যা একটাই। মাঠ থেকে বাড়ির উঠানে পা দিলে ভাতের গন্ধ নাকে গেলেই খিধেয় ওর নাড়ি পাক খেতে থাকে। ওর ঘুমেরও কোন স্থানকাল নেই। কখনো ক্লান্ত দুপুরে খরের গাঁদায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার কখনো বাড়ির গোয়ালের কাজটাজ শেষ করে কালীসন্ধ্যায় উঠানে মাদুর পেতে ঘুমিয়ে ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকাচ্ছে। বকু অবাক হয়ে ভাবে, কোথা দিয়ে তার জীবনের বিশটি বছর পাড় হয়ে গেল। ছোটবেলার ডিগডিগে চেহারার বকু এখন পাকাপোক্ত তাগড়া যুবক। আজকাল আর কেউ তাকে তাচ্ছিল্য করে কথা বলার সাহস পায় না। সে নিজেও এখন শেয়ানা হয়েছে। জমাদার বাড়িতে তার একটা দখল রয়েছে। পাড়ার ফিতু মাতব্বরও তাকে আগের মত তাচ্ছিল্য করে না। পথে ঘাটে দেখা হলেই জমাদার বাড়ির হালচালের খবর লয়।

বকুর খোদাই করা মুখ, লম্বাটে দোহারা চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আর টনটনে গলা। কেউ কিছু বললে বুক চিতিয়ে প্রতিবাদ করতে শিখেছে। বাড়ির কর্তা যশু মামার বাইপাস সার্জারীর সময় এক মাস শহরে থেকেছে। তাই দেহে একধরনের শহুরে চেকনাই ফুটে উঠেছে। মাথায় শ্যাম্পু লাগানো ফুরফুরে চুলের বাহার। এসব দেখে কেউ কিছু বললে ঠোঁট উল্টে প্রতিবাদ করে তর্জনী তুলে।

ছোটবেলায় বকুর কোন দাম ছিল না পাড়ায়। কামের ছ্যারা বলে শিবু নাপিতেও তুচ্ছ্য করত। কিন্তু এখন গ্রামের সামাজিক কাজেকর্মে বকু দাওয়াত পায়। যাত্রা নাটক হলেও তাকে ডাকে ফুটফরমাস করার জন্য। তবে নাট্য পরিচালক অপুদা তাকে আদর করে। আগামী নাটকে লাঠিয়াল কিংবা সৈনিকের রোল দেবে বলেছে। এভাবেই সে অপুদার ছায়াসঙ্গী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এসব দেখেশুনে যশু মামা তাকে হুশিয়ার করে বলেছে," যাত্রা ফাত্রা যা-ই করছ আমার গিরস্থি যেন ঠিক থাহে।" মামার হুশিয়ারীতে সে মনে মনে কষ্ট পেলেও থেমে থাকে না। তার মনে এখন নতুন স্বপ্ন পিলপিল করছে বড়শিল্পী হবার।

যশু মামা বকুকে ছেলের মতই আদর করে। খাটিয়ে যুবক ছেলে বলে বাড়ির সবাই তাকে এ সংসারের একজন সদস্য বলেই মনে করে। শীলাদি বাড়িতে পা দিয়েই সবার আগে জিজ্ঞেস করে বকুর কথা। সে বকুলের জন্য বাহারি জামাকাপড় কিনে আনে। এসব দেখে যশু মামা মেয়েকে একান্ত ডেকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, পরের পোলা এই বাড়ির গোমস্তা, বেশী লাই দিলে শেষে মাথায় উঠব। পায়ের জুতা পায়ে রাহনই ভালা।" বাবার এ হেন হীনমন্যতায় শীলাদি কষ্ট পায়।

গঞ্জের বাজারে সবে মাত্র যাত্রাদল এসেছে। প্রথম রাতেই বকু পালাটা দেখেছে শিবু নাপিতের সাথে গিয়ে। কয়েকটা বিচ্ছেদ গানও প্রায় কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। মাঠে একাকি কাজ করতে করতে মনের আনন্দে গান করে। মায়ের গান গাইতে গেলেই বকুর চোখ জলে ভিজে যায়। যাত্রার একটা গানও অপুদাকে শুনিয়েছে। অপুদা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, "লেগে থাক বকু, এসব কাজে চর্চা না হলে উপরে ওঠা যায় না। তোর কণ্ঠে সুর আছে। দেখিস, তুইও একদিন যাত্রাদলের হিরো হয়ে যাবি।" অপুদা যতবার এসব কথা বলে ততবারই বকু তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। যাকে বলে গুরুদক্ষিণা।

ইতোমধ্যেই বকু বুঝতে পেরেছে অপুদা কেন তাকে এত খাতির করে। শীলাদির কথা বললেই অপুদা মিটমিটিয়ে হাসে। হয়তো শীলাদিকে সে মনে মনে ভালোবাসে।

শীলাদি সাপল বডির একজন যৌবনবতী মেয়ে। চেহারা ঠিক যেন নিখুঁত শিল্পমূর্তি। টলটলে ফোঁটা চোখ, মৃদু ময়ূরকণ্ঠী কণ্ঠ। গায়ের রং মেমসাহেবদের মতন লালচে ফর্সা। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদরেল ছাত্রীনেত্রী। প্রতিবাদে,আন্দোলনে সবার সামনে হাত মুঠো করে স্লোগান দেয়। বক্তৃতার সময় কণ্ঠে আগুন জ্বলে। সাংবাদিকরা নাম দিয়েছে বাঘিনী কন্যা। এসবই অপুদার বয়ান। শুনে শুনে বকু তাজ্জব বনে যায়। একটা মেয়েমানুষ এতটা পারে? গুলি আর জলকামানের কি ডরভয় নাই? অপুদা তলে তলে শীলাদির এতসব খবর রাখে। তবে কি শীলাদিও অপুদাকে ভালোবাসে? অবশ্য অপুদাও বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা ছাত্র। পেটের টানে গ্রামের চাকরি নিয়েছে। কিন্তু যশু মামা মেয়েকে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে এসব যাত্রাফাত্রা পোলার লগে মেয়ে বিয়ে দেবে না। দরকার হলে মেয়েকে তাজ্য করবে যদি তার অমতে বিয়ে করতে চায়। এর বেশী আর বলতে পারেনি যশুমামা। বুক IPIc ধরে বসে পড়েছিল। মামা বেশি রাগলে এমনিতেই গমগম করে কথা বলে চোখ মুখ তখন পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। সে যাত্রায় সতেরো দিন বিছানায় পড়েছিল যশু মাতব্বর। মামী বরাবই বলেন, পরীক্ষা শেষ হলেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। এভাবে কত পরীক্ষা শেষ হয়েছে, কিন্তু বিয়ের কন্যা কিছুতেই রাজী হয় না।

শীলাদির গায়ে ফুরফুরে বিলেতি গন্ধ। চেঁচিয়ে কথা বলতে গেলে তার নাকের ফুটো চওড়া হয়ে যায়। বিয়ের কথা উঠলেই হা হা করে হাসতে থাকে। এক লাফে পুকুরে নেমে এপার ওপার সাঁতার কাটে। মামী ভয়ে হায় হায় করে পুকুরপাড়ে ছুটে যায়, পাছে মেয়ের ঠান্ডা লাগে। ছোটবেলায় কাফ-কাশের ঠান্ডায় অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে। সামনে ফাইনাল পরীক্ষার পর বিয়ের কথমা পাকাপাকির আলাপ চলছে। একমাত্র মামীই রোজ সন্ধ্যায় প্রার্থনায় বসে। মামা হয় গ্রামের বিচার শালিসে না হয় অন্যকোন কাজে ব্যস্ত

থাকে। মামীর সাথে বকুই প্রার্থনা বসে। প্রার্থনার পর মাদুর পেতে উঠানে বসলেই মায়ের কথা মনে পড়ে। তখন তারা ভরা আকাশ পানে, তাকিয়ে একাকি চোখের জলে ভাসে। একদিন এভাবে কাঁদতে দেখে মামীমা ছুটে আসে। বকুর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, মায়ের কথা মনে হলে আমার কাছে আসবি। আমার ছেলেরা সবাই দেশের বাইরে। দুই তিন বছর পরপর ওরা এলে বাড়িটা গমগম করতে থাকে খুশির আনন্দে। এসব বলতে বলতেই মামীর চোখে জলের বন্যা।

মাতৃস্নেহ কাতর বকু মামীকে শোনায় তার ছেলেবেলার গল্প। মেলায় গিয়ে হারিয়ে যায় তারপর অনেকরাতে হারান চৌকিদার তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। ছোটবোনটার সাথে সারাক্ষণ আঁড়ি আবার একে অন্যের ছাড়া এক পলকের জন্যও স্থির থাকতে পারে না। সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর কে আগে বাবা মাকে প্রণাম করবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। আবার বাবা যখন হাট থেকে গামছার কোনায় বেঁধে লিলি বিস্কুট নিয়ে আসতো তখন ঝগড়া, কে আগে বিস্কুট নেবে। একবার ভাইবোনে মারামারি করে তাই বাবা চড় দেয়। পরে মা বলেছিল বাবা মনের কষ্টে সেইরাতে ভাত খায়নি। এসব কথা বলে বকু চোখের জলে ভাসে আর মামীকে কাঁদায়। মায়ের মন তো, অন্যের দুঃখে মন কাঁদে।

বকুদের অভাবের সংসার তাই ছোটবোনটাকে পিসিমা পালক হিসেবে নিয়ে যায়। পিসিমার কোন মেয়ে সন্তান ছিল না। পিসি মারা যাবার পর গত বর্ষায় বোনের বিয়ে দেয় মোংলায়। তখন যশুমামা আর সে গিয়েছিল বিয়েতে। পদ্মা সেতুতে উঠতেই বকু চিৎকার দিয়ে ওঠে। "দেখ দেখ মামা কি বিশাল নদী।" বকু ভেবে পায় না অথৈ জলের মাঝে কি করে ব্রিজ তৈরি করা হলো। ফেরার পথে নাইট কোচে এসেছিল। সারারাত প্রায় জেগেই রয়েছে, কখন পদ্মা সেতু পার হয়ে যায়। বাসটা রাতের শেষ ভাগে সেতুর উপর উঠতেই ঝমঝম শব্দে তার দেহে এক সুখি শিহরণ জেগে ওঠে। নীচে অথৈ কালো জলরাশি আর উপরে সারা আকাশে শরতের কাশফুল যেন ফুঠে রয়েছে। যশুমামাকে ডাকতে সাহস হলো না। এত শব্দেও তার ঘুম ভাঙ্গেনি। বোর বোর শব্দ করে শ্বাস কেটে ঘুমুচ্ছে। বাস এপার এসে থামতেই ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। দেখা পেল পথের ফুটপাতে একটা শীর্ণদেহী লোক ঘুর্ণি খাওয়া লাট্যুর মত দলা পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। লোকটার কুয়াশাচ্ছন্ন চোখ, বিশুষ্ক চেহারা। সকালের ঠান্ডা বাতাসে খুক খুক করে কাশছে। লোকটার কাশি দেখে বকুর মনে পড়ে তার বাবাও এমনিভাবে কাশতে কাশতে গলা দিয়ে রক্ত ওঠে মারা যায় রাজযক্ষায়। এরই মধ্যে বাসে ওঠা নিয়ে দুই হকারের কথা কাটাকাটি। শেষে হাতাহাতি থেকে রক্তারক্তি। একটা লোকের মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। বকু রক্ত দেখে প্রায় চিৎকার দিয়ে নামতে চেয়েছিল। পাশের এক যাত্রী তাকে ধরে থামায়। বলল, " আরে! এ তো দেখছি খুনোখুনির মামলা।" অন্য এক নিরীহ যাত্রী জিভে চুকচুক শব্দ করে বলল, "সাত সকালেই মারামারি?" বকু এখনো ঘুমের ঘোরে সেই রক্তারক্তির দৃশ্যটা দেখে চিৎকার করে ওঠে।

বয়স্ক মানুষেরাও মাঝে মাঝে খুব ছেলে মানুষি করে। পদ্মা সেতুর পারে সেই খুনোখুনির রক্তাক্ত দৃশ্য দেখার পর তিন মাস বিছানায় ভুগেছে যশুমামা। সেই থেকে বকুর বিছানা হয়েছে যশুমামার ঘরের মেঝেতে। একেতে রক্তের দৃশ্য দেখে ভয় অন্য দিকে তার নাকা ডাকা। এমনিতেই মামী প্রেসারের রোগী। ঠিক মত ঘুমুতে না পারলে তার প্রেসার বেড়ে যায়। কিন্তু মামার নাক ডাকা শুরু হলে যুদ্ধ বিমানের মত ঘড়ঘড় শব্দ হয়, তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হয়। তাই রাত জেগে তখন বকুর এই কর্মটি করতে হয়। অসময়ে ঘুম ভাঙ্গালে মামা আবার রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

যশু মামাকে নিয়ে দিন দিন ঝামেলা বাড়তেই থাকে। একটু ভালো হলেই আসরে গিয়ে বসে। তাই শীলাদি পই পই করে শাসিয়ে গেছে, আগে বাবার সেবা যত্ন পরে অন্য কাজ। কিন্তু মামাকে থামানো সমস্যা। অনর্গল কথা বলতে থাকে। অথচ ডাক্তারের কড়া নির্দেশ, নিয়ম মেনে না চললে মহাবিপদ হতে পারে। দুইবার সে মানুষে টানাটানি হয়েছে। তৃতীয়বার যমদূতকে আটকে রাখা যাবে না। মামা সবাইকে নানা পরামর্শ দেন কিন্তু নিজে নিয়ম মেনে চলেন না।

নিয়মে অনিয়মে মাস চারেক কাটল, তারপর আবার সেই আসর। এরই মধ্যে একদিন তিনচার জনে/চাঙ্গাদোলা করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। পরে ঘর ভর্তি বমিটমি করে একাকার। মামী রাগ করে দুই দিন কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। শীলাদি অভিমান করে বাড়ি আসাই বন্ধ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মামীর কান্নাকাটিতে বাড়ি আসতে রাজি হয়েছে। এ কথা শুনে যশু মামা একেবারে সাধু সন্ন্যাসী সেজে বসে আছে।

মামী বলল, "তুই ইষ্টিশানে যা বকু। বিষ্টিবাদলের দিন, গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে মেয়েটা একা আসবে। তাছাড়া গেছু বেপারীর নেশাখোর ছেলেটা পথে উৎপাত করে। মেয়েদের দেখলেই দাঁত কেলিয়ে হাসে।" একথা ঠিক পদু ইতোমধ্যেই সংসারের সব পথঘাট ঘুরে এসেছে। গাঁজার কলকেতেও হাত পাকিয়েছে। আসরে বসলে তোবরানো গালে তিন টানেই কলকে পুড়ে ছাই। তাই পাড়ার ছেলেরা আঁড়ালে ওকে কলকেপদু বলে ডাকে। অচিরেই শোনা যাবে পদু একটা বাজে মেয়ে ধরে নিয়ে এসে বলবে, এটা তার বিয়ে করা বউ।

সকাল থেকেই টিপ টিপিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। গায়ের মাঝখান দিয়ে কাঁচা-পাকা পথটা নদীতে গিয়ে ডুবেছে। স্টেশনে যেতে হলে নদীর পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তায় যেতে হয়। পথের শেষ মাথায় বটতলায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা বসে। সামনে পথের দু'ধারে ঝোঁপঝাড়। এখানে এলেই বুক টিপটিপ করে। কখন ফোঁস করে চক্কর মেলে রাস্তায় ফণা তুলে টহল দিবে জাত কেউটের বাচ্চা। এই সাপের কামড়েই তার মা মারা গিয়েছিল জমাদার বাড়ির বাঁশতলায় ছাই ফেলতে গিয়ে।

মামীর অনুমানই ঠিক। বৃষ্টির মাঝে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পদু। ভোশ ভোশ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। বাপের মত জর্দা খাওয়া রঙিন দাঁতে পান চিবাচ্ছে। বকু নরম আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করে, "কি গো পদুদা, সারের বস্তার ন্যায় খাড়াইয়া রইছ ক্যান? কোন রাজকইন্যার জইন্য বিষ্টিতে ভিজতাছ। চেহারাখানতো এক্কেবারে ভিজা কাউয়্যার মত অইছে।"

একথা বলতে বলতেই দেখা গেল শীলাদি রিকসায় ছাতা ধরে আসছে। সে কাছে আসতেই পদু ফিক্ ফিক্ করে হেসে এক দৌড়ে বটতলা দিয়ে অদৃশ্য। বকু এবার তাজ্জব। শীলাদির সঙ্গে একই রিকশায় তার গুরু অপুদা। বকু শুনেছে, গত মাসে অপুদার একটা নামকরা অফিসে চাকরি হয়েছে। সে নাকি গাড়িতে চড়ে গ্রামে এসেছিল। কিন্তু শীলাদি অপুদা এক রিকশায়.. .. . এ হিসাব কিছুতেই মিলাতে পারছে না বকু।

শীলাদির ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। দিদি এ গ্রেডে পাশ করেছে। তাই এখন বাড়িতে কেবলই বিয়ের আলাপন চলছে। বর আর কেউ নয়, স্বয়ং অপুদা। অপুদারও বিসিএস পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। তাই যশুমামার এখন আর এ বিয়েতেআপত্তি নেই। ক'দিনের মধ্যেই শীলা-অপুর বিয়ে হয়ে যায় ঘটা করে। মূল ঘটক বকু। অর্থাৎ জমাদার বাড়ির কামের ছ্যারা বকু। ❑

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd

নং-১৬.০০.০০০০.০২৭.০৬.০০২.২৩-১৮০

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪৩১
২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রজ্ঞাপন

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করলেন:

ক্র. নং	নাম	ট্রাস্টি বোর্ডের পদবী
১	মাননীয় উপদেষ্টা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
২	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৩	এডভোকেট জন গমেজ, বাড়ি নং-২৯, রোড নং-৩, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০	ভাইস চেয়ারম্যান
৪	জনাব পিউস কস্তা, আরবান দিগন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, ৫-এ, ৬৪, গ্রীনরোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৫	ড. বেনেডিক্ট আলো ডি রোজারিও, ৬২/এ, অঞ্জলী এপার্টমেন্ট, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৬	জনাব মৃগেন হাগিদক, ৩২/৫, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬	সদস্য
৭	জনাব মন্টু পিটার রোজারিও, নাভানা জহুরা মেনর, বাসা নং-১১, ব্লক-১, মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৮	জনাবা রীতা রোজলীন কস্তা, ১৬/বি, পূর্ব রাজাবাজার, ইন্দিরা রোড, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৯	এডভোকেট ফনিন্দ্রনাথ কর্মকার, হোল্ডিং নং-৪৯৬৩, সাধাপুর (গোপের বাড়ী), ঢাকা খ্রীস্টিয়ান সমবায় সমিতি আবাসন প্রকল্প-৩, থানা-সাভার, জেলা- ঢাকা-১২১৬	সদস্য
১০	জনাব জ্যাকশন পিউরিফিকেশন, গ্রাম-ভেটুর, ইউনিয়ন-তুমিলিয়া, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা- ঢাকা	সদস্য

২। ট্রাস্টি বোর্ডের মেয়াদকাল ২৮ ডিসেম্বর ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
৩। উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে সরকার কোনো মনোনীত ট্রাস্টিকে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। অনুরূপভাবে কোন ট্রাস্টি ইচ্ছা করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন।

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ
৪. ভাইস চেয়ারম্যান জনাব..
৫. জেলা প্রশাসক (সকল), ...
৬. সম্মানিত ট্রাস্টি জনাব ....
৭. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)
৮. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৯. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)
১১. সচিব, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ওয়াক্ফ ভবন, ঢাকা
১২. অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা ও আইন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসিনে বানু
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৫৫১০১৩০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ওয়াক্‌ফ ভবন (৮ম তলা), ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৪১০৩২৯৬১, ৪১০৩২৯৮১, ফ্যাক্স: ৪১০৩২৯৬২, ই-মেইল: info@crwt.gov.bd
www.crwt.gov.bd

স্মারক নং- ১৬.০৭.০০০০.০০০.০০.১৬.২০২৫.২১৮৭ **তারিখ:** ২৭ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট-এর "সচিব" পদে জনাব লিন্টাস রক রোজারিও'র দায়িত্বভার গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট-এর স্মারক নং- ১৬.০৭.০০০০.০০০.০০.০৩.২০২৫.২১৫১, তাং- ০৯.০২.২০২৫ খ্রিস্টাব্দ মূলে ট্রাস্টের ২৭তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং এর প্রেক্ষিতে স্মারক নং- ১৬.০৭.০০০০.০০০.০০.১৪২.২০২৫.২১৭৬, তাং- ১০.০৩.২০২৫ খ্রিস্টাব্দ অনুসারে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট-এর 'সচিব' পদে জনাব লিন্টাস রক রোজারিও'কে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক নিয়োগ প্রদান করা হয়।

২। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণে নবনিযুক্ত সচিব-এর সহিত যোগাযোগ করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ধন্যবাদান্তে,

(এডভোকেট জন গমেজ)
ভাইস-চেয়ারম্যান
খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

প্রয়োজনে যোগাযোগ ঃ-
লিন্টাস রক রোজারিও
সচিব
খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ওয়াক্‌ফ ভবন (৮ম তলা), ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৪১০৩২৯৬১, ৪১০৩২৯৮১, ফ্যাক্স: ৪১০৩২৯৬২
মোবাইল: ০১৮২৬-৬২২৪১৮
ই-মেইল: secretary@crwt.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.crwt.gov.bd

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেজিঃ ফাঃ চার্লস জে ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,
ফোন ঃ ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬ ফ্যাক্স ঃ ৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল ঃ cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট ঃ www.cccul.com,
অনলাইন নিউজ: www.dhakacreditnews.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com

সোস্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, অনলাইননিউজ, ইউটিউব) মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ প্রসঙ্গে

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট) এর পক্ষ থেকে সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কতিপয় ব্যক্তি ঢাকা ক্রেডিটের বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তা, উপদেষ্টা এমনকি ধর্মীয় নেতাদের জড়িয়ে কতিপয় সদস্য এবং সদস্য নয় এমন ব্যক্তি তাদের ভেরিফাইড আইডি থেকে ফেসবুক সহ সোস্যাল মিডিয়ার অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে সম্পূর্ণ অসত্য, মিথ্যা তথ্য, বানোয়াট, কু-রুচিপূর্ণ মন্তব্য পোষ্ট ও বক্তব্য প্রদান করে সমিতির ভাবমূর্তি ও সমিতির নেতৃবৃন্দের মান-হানির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই বুঝে না বুঝে, সেই সমস্ত পোষ্টে বিরূপ মন্তব্য ও শেয়ার করে যাচ্ছেন।

ইতিপূর্বে সোস্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা বানোয়াট, মানহানিকর বক্তব্য পোষ্ট করার জন্য অনেকের বিরুদ্ধে সমিতির উপবিধি, সমবায় সমিতির আইন ও বিধি এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সোস্যাল মিডিয়ায় এ ধরনের মিথ্যা ও মানহানিকর বক্তব্য প্রদান ও শেয়ার, কমেন্ট করা থেকে সকলকে বিরত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমিতি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা থাকলে সরাসরি সমিতির সাথে যোগাযোগ অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউলি:, ঢাকা।

ভয়

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

মধ্যরাতের দিকে ফাদারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি অনুমান করলেন, আচমকা একটা শব্দই এ অসময়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গার কারণ। তিনি বিছানায় টানটান শুয়ে থেকেই অনুমান করতে চেষ্টা করলেন, আসলে শব্দটা কিসের! এর উৎসটা কোথায়। এ সময় তাঁর বুকের ভেতর এক ধরনের ভয় মিশ্রিত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এবং তা তাঁর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। ফাদারের বাসভবনের এদিকটাতে, ঘন গাছপালা এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। চারদিকে রাত্রিকালীন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। চারদিকে রাত্রিকালীন ঝিঁঝিঁর শব্দ। ওদিকে রান্নাঘরের কাছাকাছি, এক রুমে আদম ও পিতর ঘুমাচ্ছে। কখনও কখনও ফাদার তাদের প্রতিযোগিতামূলক নাক ডাকার শব্দ শুনতে পান। তারা ফাদারের বাড়িতে কাজ করে। একজন রান্নাঘরের বাবুর্চি আর অন্যজন বাগানের মালী। আবার মিলেমিশে তারা বাজারঘাটও করে।

আচ্ছা এটা কিসের শব্দ হতে পারে? একবারই মাত্র 'খট'! তারপর রহস্য ছড়িয়ে পড়া। খুবই কাটখোট্টা শব্দ। এবার ফাদার, বিছানায় উঠে বসলেন। দ্রুত হাত চালিয়ে, মেঝেতে তাঁর পায়ের কাছাকাছি একজোড়া স্যান্ডেল পাওয়া গেল। লণ্ঠনের সলতেটা বাড়িয়ে দিলেন। মনে হল সলতেটা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুবই কষ্ট নিয়ে জ্বলছে। সম্ভবত কেরোসিন কম। ফাদারের রুমের উত্তরদিকে টানা-বারান্দা। তারই একপাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, পাকা কাঠের চার পায়া ও চার হাতল সমৃদ্ধ ভারী খাটিয়াটা। অর্থাৎ অত্র ধর্মপল্লীর মৃতদের লাশ বহন করার বস্তুটা। খ্রিস্টভক্তরা প্রচলিত ভাষায় যাকে বলে 'তুম্বা'। তো এই তুম্বাটা; অনেক দিনের পুরনোই বলতে হবে। বয়স তার অনেক। ঘুণে বা উইপোকায় ধরার সাহস পায়নি এখনও। আর ওরা দুনিয়াজোড়া জিনিস রেখে, এটাকেই বা খেতে আসবে কেন? ওদেরও তো প্রাণের মায়া বা মৃত্যুভয় বলতে কিছু আছে, নাকি? শত হলেও ওরাও তো প্রাণী। শব্দটা সম্ভবতঃ, ওই মরার তুম্বাটার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেই এসেছে বলে মনে হচ্ছে! এ বিষয়ে ফাদার শতভাগ নিশ্চিত। ফাদারের বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে। মাথায় তাঁর চুল যে কয়েকটা রয়েছে, বেশির ভাগ কাশফুলের রং ধারণ করেছে। তার মানে, অভিজ্ঞতার ডামাডোলে তিনি বেশ ভারাক্রান্ত এখন!

মাত্র সাত মাস হতে চলল, ফাদার এই ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিত হয়ে এসেছেন। এখানে আসার পূর্বে তিনি দীর্ঘদিন পার্বত্য এলাকায় ছিলেন। তার আগে ছিলেন, দেশের উত্তরাঞ্চলে গারো অধ্যুষিত জনপদে। তো, তাঁর দীর্ঘ পালকীয় দায়িত্ব পালন কালে; অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। প্রতিকূল অবস্থার, মুখোমুখিও হতে হয়েছে তাঁকে। সব মিলিয়ে তাঁর স্মৃতির ভান্ডার বেশ সমৃদ্ধ হয়েছে, বলতেই হবে। ইতোমধ্যে দু'জন ডিকন এসে, ফাদারের সাথে সময় দিয়েছে। তারা ফাদারকে লিখতে বলেছে। 'স্মৃতিকথা' লেখার ইচ্ছা থাকলেও, সময় এবং সুযোগ তাঁকে নিরুৎসাহিত করছে বলেই মনে করেন তিনি। তবে তিনি মনে করেন, 'লেখার অনেক রসদ জমা আছে আমার ভান্ডারে। লিখলে মন্দ হবে না! দেখা যাক।' আকার আয়তনে, এই ধর্মপল্লী এলাকার পরিধি মোটামুটি বড়ই বলা চলে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে, খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যাও বেশ! তিনি আশা করছেন, অচিরেই একজন সহকারী পালপুরোহিত, স্থায়ী ভাবেই চলে আসবেন এখানে। তখন হয়তো; লিখতে শুরু করবেন তিনি।

তো যেমনটি বলা হয়েছে, পালকীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে; ফাদারকে তাঁর দীর্ঘ যাজকীয় জীবনে, বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে অনেক ধরণের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আশৈশব 'ভীতু' ব'লে নিজের ভাই-বোনদের কাছে এবং বন্ধুমহলে তাঁর খ্যাতি থাকলেও, আজকাল নানাবিধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই ধর্মযাজক নিজেকে আর 'ভীতু' বলে মানতে চান না। সময়ের সাথে মানুষের মাঝে যেমন অনেক পরিবর্তন আসে, তেমনই ফাদারের মধ্যে অন্ততঃ একটা পরিবর্তনই লক্ষণীয়ভাবেই এসেছে। আর তা হল, তাঁর 'সাহস'! এসময় চারদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর রাতে, ফাদার নিছক একটা শব্দ শুনে 'আতংকিত' হবেন; এমন হাস্যকর ঘটনার নায়ক হতে চান না তিনি। আদম আর পিতরকে 'ও আদম! ও পিতর! উঠোতো তোমরা! ওদিকে কেমন যেন অদ্ভুত একটা শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল ...!' ইত্যাদি ব'লে ডাক ছেড়ে, বেচারাদের ঘুম ভাঙাতে চান না তিনি। আর তারা এ সময়, এ মধ্যরাতে যদি ঘুমের ঘোরে রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে; তো তাতে বিঘ্ন ঘটানো ফাদারের মোটেই ইচ্ছে নেই। তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাঁর, বলতেই হবে! আজ রাতে তারা দু'জনই, দস্তুরমত অবস্থান করছে পালপুরোহিতের আবাসে। এমনও রাত যায়, কখনও শুধু আদম! অথবা কখনও শুধু পিতর! হ্যাঁ। তাদেরও তো পরিবার আছে! সঙ্গত কারণেই, পরিবারকে সময় দিতে হয় তাদের। তবে পারতপক্ষে, তারা ফাদারকে একা থাকতে দেয় না। ফাদারের কক্ষের পাশেই, তাদের ঘুমানোর ব্যবস্থা করা আছে। মাঝে মধ্যে এই দুই বাবার অনুপস্থিতে, ছেলেরা রাতে এসে ঘুমায় এখানে। সাথে বিভিন্ন কাজে, ফাদারকে সাহায্য করে। স্থানীয় প্যারিশ কাউন্সিলের লোকজন, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি রাখেন। তাঁরা সবসময় ফাদারের খোঁজখবর রাখেন। বিষয়টা ফাদারের কাছে খুবই ভাল লাগে।

বিছানা থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে, জানালার পর্দা টেনে দেখলেন। ওদিকে ওই পশ্চিমদিকে নবনির্মিত গির্জাঘরটি, তার সঠিক অবস্থানেই আছে। তারপর সবুজ ঘাসে মোড়ানো প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে, চারপাশে ঝোপঝাড়ে সমৃদ্ধ পুরনো পুষ্করিণী। তো এই পুষ্করিণীটা, বহুদিন থেকেই অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। আগে গির্জার আশপাশের মানুষেরা, তাদের প্রয়োজনে পাকা সিঁড়িবাঁধানো ঘাটে এলেও এখন কেহ; ভুলেও ওদিকে পা বাড়ায় না। তো এই অজপাড়া গাঁয়ের ধর্মপল্লীতে এসে এই ধর্মযাজক শুনেছিলেন, এ পুকুরকে ঘিরে গা শিউড়ে ওঠা সব কাহিনি। এই পুকুরের দক্ষিণে মিশনের প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন। পশ্চিম দিকে খেলার মাঠ এবং সর্ব দক্ষিণে কবরস্থান। এখন ঘোর অমাবস্যা চলছে। তাই সঙ্গত কারণেই ওদিকটা গহীন অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে আছে। কিন্তু ভরা পূর্ণিমার রাতে ওই দক্ষিণ দিকটা একেবারেই ফকফকা দিনের মত দেখায়। এমন কি কবরের সব কয়টা ক্রুশই স্পষ্ট দেখা যায়।

সুনসান নীরব তা; নিস্তব্ধ রাত এখন। আমেরিকান ফাদার বার্গম্যানকে, ধর্মপল্লীর লোকজন ডাকতেন 'বাঘ' বলে। লম্বা দোহারা গড়নের ফাদার যেন বাস্তবিক 'দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' আরকি! প্রচণ্ড হৃদয়বান হলেও তিনি মানুষটা রেগে গেলে, একেবারে গুলি খাওয়া বাঘের মতই হুংকার দিতেন। তাই সকলেই যেমন তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তেমনই ভয়ও পেতেন। তিনি নাকি প্রায়ই মধ্যরাতে হাঁটতে হাঁটতে, সোজা কবরস্থানে

চলে আসতেন। সেই সময় তো ছিল আরও ঘন বন-জঙ্গল। ঝোপঝাড়। তাঁর হাতে থাকতো রোজারিমালা। নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করতে করতে তিনি পুরো কবরস্থান, খেলার মাঠ তারপর পুকুরের পাড় ধ'রে পায়ে পায়ে সাহসী চক্কর মেরে সোজা চলে আসতেন তাঁর বাসবভবনে। গির্জার আলতারের সামনে যাজকীয় আব্রু প'রে দাঁড়াতেন যখন, তখন মনে হতো সাক্ষাৎ যিশুখ্রিস্ট উপস্থিত! মোটরসাইকেলে চ'ড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়াতেন তিনি। গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে ধূলি উড়িয়ে আসতে দেখলেই, খ্রিস্টভক্তরা সেই রাস্তার পাশেই হাঁটু গেড়ে ভক্তি দেখাতেন। কারণ তিনি কমুনিয়ন নিয়ে হয়তো, কোন রোগীর বাড়িতে যাচ্ছেন। অথবা রোগীর বাড়ি থেকে আসছেন।

অবশ্য বর্তমান কালের এই বাঙালি ফাদার, তিনি তো আর জন্মসূত্রে আমেরিকান নয়। তাই তত সাহস তাঁর হয়নি যে, গভীর রাতের ঘোরে অন্ধকারে তিনি আনমনে হাঁটতে হাঁটতে কবরস্থানে চলে যাবেন। তবে দিনের বেলাতে, দুপুরে বা বিকেলে যখন তিনি চান কবরস্থানের দিকে একা একাই চলে যেতে পারেন। এবং যানও তিনি। তাই তিনি নিজেকে আর, শৈশবের সেই ভীতু ভাবতে চান না। তিনি এখন যথেষ্ট সাহসী বটে। যাহোক, সেই প্রসঙ্গ এখন তত জরুরী নয়। জরুরী বিষয় হলো শব্দটা! শব্দ তো যখন তখন হতেই পারে। এবং যে কোন দিকেই। কিন্তু তাই ব'লে ওদিকে ওই তুম্বাটার দিকে কেন? এটাই এখন গভীর ভাবনার বিষয়। ফাদার পাশের টেবিল থেকে রোজারিমালা, পবিত্র বাইবেল এবং একটা ক্রুশ নিলেন। নাহ্। এখন ভয়টয় থাকা আর উচিত নয়। তাছাড়া বিড়াল, ইঁদুর বা চিকাটিকা উপর থেকে ধুম ক'রে নিচে পড়লেও তো শব্দ হবে। হয়তো বা হয়েছেও তাই। আবার প্রশ্ন, 'ওরা চুন-সুড়কির ওই খোলা সিলিং থেকে পড়বেইবা কেন? আদম, পিতর তো এখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে নিশ্চয়। তা ঘুমাও বাছারা! 'জেগে থাকো এবং প্রার্থনা কর' পর্যায় এখন তোমরা নেই। আমিও এবার, ঘুমানোর চর্চা করি।' আপন মনে কিছুক্ষণ ভাবেন। নিজের সাথে নিজেই কথা বলেন।

তারপর ফাদার তাঁর বিছানায় ফিরে, চাদর টেনে গায়ের উপর জড়িয়ে নেন। হারিকেনটা থাকুক এ মাত্রাতেই। তিনি প্রার্থনা শুরু করছেন। প্রেয়ার ইজ পাওয়ার। হ্যাঁ। প্রার্থনাই শক্তি। সাধ্বী মাদার তেরেজা, সব সময়ই এ কথা বলতেন। সবাইকে প্রার্থনা করতে, উৎসাহিত করতেন তিনি। হ্যাঁ! এবার পাস্কাপর্বের উপদেশে তিনি, 'শান্তি-অশান্তি' এবং 'প্রার্থনা' বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। শান্তিরাজ যিশুখ্রিস্ট; তিনি তো শান্তির ললিতবাণী বয়ে নিয়ে এসেছেন, এ সংঘাতময় অশান্তির রাজ্য পৃথিবীতে। তাঁর স্বর্গীয় শান্তির অমৃতবাণীর ফল্গুধারায়, সিক্ত এবং পরিপুষ্ট হয়ে উঠুক পাপপূর্ণ সকল বিশ্বাসীর অন্তরাত্মা। তারা সকলেই, পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠুক।

ওকি! আবার সেই শব্দ! এবং সেই ওদিকেই, যেখানে রয়েছে ওই ভীতিকর তুম্বাটা! তা টর্চটা কোথায় যেন! এইতো হাতের নাগালেই রয়েছে, তিন ব্যাটারির তাঁর প্রিয় তিন ব্যাটারির টর্চ লাইটটা। তা এ মুহূর্তে ব্যাটারি ট্যাটারি ঠিকঠাক মতো আছে তো? তাঁর এই দুঃসময়ে? নাকি মওকা বুঝে তিন ব্যাটারির ওই জিনিসটা, 'দেড়ব্যাটারি' হয়ে আছে? লোকে বলে, ভূতে পেলে নাকি সব কিছুই মওকা বোঝে! এবং জায়গা মতো অকার্যকর হয়ে পড়ে! এমনকি মানুষের হার্টবিটও অনিয়মিত হয়ে যায়! ক্ষেত্র বিশেষে থেমেও যায়! এবং ফলশ্রুতিতে যা হবার, তাই হয়! হুম! যত্তসব অলুক্ষণে! নাহ্। এইতো টর্চ। তার সবই ঠিক আছে। টর্চটার গোড়ার দিককার ঢাকনা মোচড় দিতেই, তাঁকে অবাক ক'রে দিয়ে তির্যক আলো জ্বলে উঠলো! এই তো! সামনের সবকিছুই, একেবারে দিনের মত ফকফকা! দেয়ালে ঝুলানো যিশু-হৃদয়ের ছবিটা, জ্বলজ্বল ক'রে আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাহ্! কী চমৎকার দেখা গেল! তা বলতেই হবে, ফাদার এখন আর সেই তাঁর শৈশবের 'ভীতু বালক' নন। বাইবেলের সাধু পৌলের সাহসী চরিত্র, ফাদারের স্মরণে আসে। ফাদার কি পারবেন সাধু পৌলের মত, একজন সাহসী খ্রিস্টযোদ্ধা হয়ে উঠতে? ফাদার তিনি তো, একজন সাধারণ ধর্মযাজক। সর্বোপরি একজন দুর্বল-মানুষও বটে। তাই ভয়ভীতি তাঁর মাঝে থাকতেই পারে। এবং আছেও। সবাই তো আর বা এই সাধু পৌল ও হতে পারেন না। বা ফাদার বার্গম্যান নন! ঝটপট বিছানা থেকে উঠে, টর্চ হাতে এক পা দু'পা এগিয়ে যান তিনি। জানালার পর্দা ফাঁক ক'রে, সোজা বাইরে আলো ফেলেন। কোন দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ নেই তো ওখানে?

এ সময় তিনি জানা-অজানা খ্রিস্টযোদ্ধাদের স্মরণ করেন। হ্যাঁ! এদের তো আবার অভাবও নেই। তাঁর জানা ফাদার হিউলেট, ফাদার ম্যাকবেথ, ফাদার রিগবী, ফাদার ইভান্স এবং ফাদার আব্রাহাম এই নামগুলো স্মরণে আনেন। এ জগতে খ্রিস্টের বাণী প্রচার এবং স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার শপথে অটল থেকেই, প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে তাঁদের! হ্যাঁ, ঘটনাক্রমেই অবর্ণনীয় নির্মমতার শিকার হয়েছেন তাঁরা! এবং তাঁরা একেক জন সাধু স্তেফানের, সাধু পিতরের, সাধু পৌলের চারিত্র্য পরিধান করেছেন তাঁদের সত্তায়! খ্রিস্টের জন্য 'খ্রিস্টশহীদ' হওয়ার গৌরবে অভিষিক্ত হয়েছেন!

আরে! ওই শক্ত কাঠের তুম্বাটা ঝুলে আছে না? ফাদারের ভাবনায় ছেদ পড়ে। তাঁর শরীরের সব কয়টা লোম দাঁড়িয়ে যায়! দু'কান দিয়ে তপ্তগরম হাওয়া বের হচ্ছে মনে হয়। বুকের ভিতর ধুমধাম আওয়াজ ওঠে! এত রাতে ওই তুম্বাটাই বা ঝুলে থাকবে কেন? বিষয়টা কী? তবে কি তুম্বা বলেই এটাকে ঘিরে, যত্তসব আজগুবি আর ভূতুড়ে সব ঘটনা ঘটবে? কেন? তুম্বা কি ফাদারদের আশেপাশে থাকতে পারে না? ত্রস্তপায়ে এবার তিনি ছুটে যান বড় দরজার কাছে। আবার জানালার কাছে। একবার ডানে। আবার বায়ে......।

গতমাসে এক ফাঁসির মড়াকে কবরস্থ করেছেন ফাদার। তখন থেকেই একধরনের ভয়, ফাদারের বুকে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তো, ফাঁসির মড়া বলেই কথা! নইলে তাঁর এই দীর্ঘ পালকীয় জীবনে, কত মৃত মানুষকেই তো তিনি সমাধিস্থ করেছেন। সেই পার্বত্য এলাকায়। গারো জনপদে। কই! কখনই তো এমনটি হয়নি! অবশ্য মিশনের অনেকেই তাঁকে অভয় দিয়েছেন। আবার অনেকে, সমূহ ভয়ের কথাও বলেছেন। তা মানুষের বেলায় যা হয়। মৃত্যুকে কে না ভয় পায়? তাও যদি হয় অপঘাতে বা আচম্বিতে মরা! অন্ধকার রাতে কবরস্থানের দিকে তাকালে, পাশের ওই লম্বা তালগাছটাকে একটা দীর্ঘকায় অশরীরী ছায়ার মতই মনে হয়। মনে হয় ছায়াটা ক্রমেই; লম্বা থেকে লম্বাতর হচ্ছে! লম্বা হচ্ছে আর কাছে; আরও কাছে আসছে। এমনটা হচ্ছে; ওই ফাঁসির মড়াটা দেখার পর থেকেই। কিন্তু এমন হবেই বা কেন? ফাদারের তো ভয় পাওয়ার কথা নয়! আর লোকে শুনলেই বা বলবে কী! ফাদার মানুষ, আবার ভয় পায় ... ...! ওমা, ফাদার যদি ভয় পায় তো আমাদের দশা হবে কী? না, না, না! ফাদারের বুকে যথেষ্ট সাহস রাখতেই হবে। আবারও মনে পড়ে এ সময়, ফাদার আব্রাহামের কথা। খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। তাঁর কর্মরত ধর্মপল্লী এলাকার কতিপয় আততায়ীর হাতে মারাত্মক জখম হয়েছেন তিনি। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছেন তিনি। মর্মন্তুদ এই দুর্ঘটনার খবর শুনে, বেহুঁশ হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি হাসপাতালে। গিয়ে দেখেন মাথায়, বুকে, দু'বাহুতে, পিঠে বলতে গেলে পুরো শরীরটাই তাঁর ব্যান্ডেজে মোড়া! সংজ্ঞাহীন ফাদার ইমার্জেন্সিতে মড়ার মত পড়ে আছেন!

উহ্! কী কষ্টের আর বেদনার সেই দৃশ্য! যা ভাষায় বর্ণনাতীত!

তাই কখনও কখনও মনে হয়; এ পালকীয় দায়িত্ব বড়ই চ্যালেঞ্জের! বড়ই নিরাপত্তাহীন! ঠিক যেমনটা ছিল যিশুখ্রিস্টের বেলায়। তাই এই কঠিন সত্যটির মাঝে মস্ত বড় এক সান্ত্বনা লুকিয়ে আছে। সাথে আছে সীমাহীন আত্মতৃপ্তিও। ভয় তো মানুষের জীবনে থাকবেই। একজন পুরোহিত, তিনিও এই শৃঙ্খলার বাইরের কোন মানুষ নন! তবে হ্যাঁ। সেই ভয়কে অতিক্রম করাটাই বড় বিষয়। এ কাজটা যে পারে; সেই তো পায় বীরের সম্মান। এই প্রচেষ্টার দুর্নিবার প্রচ্ছন্ন এক অভিঘাত, নিজের মাঝে অনুভব করেন ফাদার। তাই এ সময় কখনও নিজেকে কখনও ফাদার হিউলেট, কখনও ফাদার ম্যাকবেথ, কখনও ফাদার রিগবী, কখনও ফাদার ইভান্স, আবার কখনও ফাদার আব্রাহাম হিসেবেই দেখেন।

ফাদার কিছুক্ষণ পায়চারি করেন। বুকে সাহস সঞ্চয় করে জানালার পর্দা সরিয়ে আবার টর্চের আলো ফেলেন। বাইরের অন্ধকারের কঠিন পর্দা ঠেলে, আলো সরাসরি গিয়ে পড়ে জমকালো সেই তুম্বাটার উপর। ঠিকই একদিকে কাৎ হয়ে ঝুলছে ওই জিনিসটা! আসলে এই তুম্বাটাই প্রতিটি মানুষের জীবনের এক চরম সত্য!

ফাদারের মনের পর্দায় এখন মৃত্যু বিষয়ক নানান রঙ্গিন চিত্র, হলিউডের সিনেমার দৃশ্যের মতই জীবন্ত, সরব হয়ে ছোটাছুটি করছে। এখন চারদিকে টানা নীরব অমাবস্যার রাত। সময়টা ফাদারের কাছে খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে! দ্রুত এগিয়ে যান তিনি, আদম-পিতরের কক্ষের কাছে। জোরে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে যথেষ্ট স্পষ্ট ভাষায়, আদমকে এবং পিতরকে ডাকতে কসরত করেন ফাদার। দরজায় ধাক্কাও দেন।

-ও আদম! ও পিতর! তোমরা উঠ তো!

হ্যাঁ! যেই ডাকা, সেই কাজ। আদম ও পিতর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। ফাদারের সামনে এসে দাঁড়ায় তারা। নিভৃত এবং অদম্য স্বপ্নচারীর মতই দেখাচ্ছে; তাদের দু'জনকে। ফাদারের মনে হল, তারা এতক্ষণ 'নিশি-জাগরণী' করছিল!

-কী হয়েছে ফাদার? কোন এ্যাকসিডেন?

-ও ফাদার। ভয় পেয়েছেন নাকি?

পিতরের হাতে লণ্ঠন। বাতাসের ধাক্কায়, কেরোসিনের সলতে নিজেকে সামলে নেয় বার বার।

আদম পিতর খুবই ত্রস্তব্যস্ত হয়ে পড়ে, নবাগত এই ফাদারকে নিয়ে।

-না! না! কোন এ্যাক্সিডেন্ট না। মানে ওদিকে; ওই তুম্বাটা ঝুলে আছে তো...!

সাবধানে ঢোক গিলেন ফাদার। কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে কোন তরল নামছিল না! তা হবে কেন? গলা তো তাঁর, শুকিয়ে একেবারে কাঠ! তা ভয় তো, পুরোটা না পেলেও কিছুটা তো পাবারই কথা। তিন জনই এগিয়ে যায়, ফাদারের কক্ষ সংলগ্ন টানা বারান্দার দিকে। লণ্ঠনের মৃদু আলোয়, গোয়েন্দা দৃষ্টি নিয়ে ফাদারের আশেপাশে ভয়ের কারণ অনুসন্ধান করে আদম পিতর।

-দেখি দেখি ফাদার। টর্চটা দেন।

পিতর আদমের চেয়ে বেশি সাহসী। সে উত্তর দিকের দরজা ঠেলে, পায়ে ধূপধাপ শব্দ তুলে, সরাসরি বারান্দায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় বাইরে প্রচণ্ড বাতাস বইছে। সেই বাতাশের অনেকটাই, মাতাল ভূতের চেহারা নিয়ে গ্রিলঘেরা টানা বারান্দায় বেতমিজ গতিতে আছড়ে পড়ছে! ফাদারের আবাসের ওদিকে পুষ্করিণী। তারপর ঢেউটিনের ছাউনি-দেয়ালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লম্বা ভবন। তার পশ্চিম পাশ ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণমুখি খোলা মাঠ। এবং সর্ব দক্ষিণে 'গেইট অব হেভেন!' মানে সোজা বাংলায় যাকে বলা হয়, 'গোরস্থান!'

তো ফাদার আন্দাজ করেন, 'হ্যাঁ! এই দমকা বাতাসটা, ওই 'স্বর্গের দ্বার' থেকেই উঠে আসছে!' এ সময় ফাদার তাকিয়ে, পিতরকে দেখতে পাচ্ছেন না! দেখতে বামন ও কালো-রঙা বুড়ো পিতরটা, দিব্যি অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে নাকি? তাই তো! আশেপাশে কোথাও নেই পিতর! তিনি ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখেন, বাইরে শুধুই লম্বা অন্ধকার! ডান হাতের পিঠ দিয়ে, দু'চোখ ডলেন তিনি। নাহ! সবদিকেই শুধুই, নারকীয় চরিত্রের রহস্যময় অন্ধকার! এ সময় তেড়ে আসা, বখাটে স্বভাবের এবং দুর্বৃত্ত গতির বাতাসের উদ্ভট একটা গন্ধও পাচ্ছেন তিনি! স্বাভাবিক হতে, চেষ্টা করেন ফাদার। তিনি মনে মনে বলেন, 'ধূর ছাই! বাতাস তো, বাতাসই!' ওটা আসছে, 'স্বর্গের দ্বার' পেরিয়ে! তাই, ভয় কিসের? ওইতো, আদমটাকে অদূরেই দেখা যাচ্ছে! একরকম আবছা ছায়ার মতই দেখাচ্ছে তাকে! যাক!

এখন তিনি নিজের সাথে আদম এবং পিতরকে খুবই 'নিরাপদ' ভাবতে শুরু করেছেন।

-ও ফাদার! একদিকের দড়ি ছিঁড়ে মরার তুম্বাটা ঝুলে পড়েছে! দেখ দেখি, কাণ্ড কারখানা! মনে হইতাসে, এই সময় তুম্বাটাও বেশ নড়াচড়া করতাসে! কী আচানক!

পিতরের গলা শুনে; পায়ে ধূপধাপ শব্দ তুলে, আদম ছুটে যায় তুম্বার দিকে।

-ও ফাদার! দেখেন দেখেন! নিচে এ্যাত্ত বড় ঘাড় মটকানো; একটা মর্দা চিকা চিৎপটাং হয়ে আছে!

আদমের গলা; ফাঁটা বাঁশের মত ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ক'রে ওঠে, 'ও বুঝেসি! আমাদের বিড়ালটা; ওকে ধাওয়া করেসিলো! ওদের ধস্তাধস্তিতেই, মরার তুম্বাটা খাড়াখাড়ি ঝুইলা পড়েসে! দেখসো নি কারবারডা!

-দেখ দেখি! যত্ত সব আজগুবি বিষয়! তাও এই রাত বিরেতে! ভয়ের তো সুযোগ হবেই!

ফাদার আশ্বস্ত হলেন এবার।

-শোনেন ফাদার। কালকেই তুম্বাটা অন্য জায়গায় টেরেন্সফারের ব্যবস্থা করবো...।

আদমের ভয়ার্ত চেহারায়; সাহসের চিকন আলো ঝিলিক মারে।

'হ ফাদার! কালকাই এটাকে সরাইয়া ফেলবো!' আদমের সাথে, নিজেকে সরাসরি যোগ করে পিতর।

-আরে ধুর! ওটা ওখানেই থাকবে ...! সমস্যা নাই কোন ...!

ফাদার দু'হাত নেড়ে; বিষয়টাকে দিব্যি হালকা করতে চাইলেন।

-তাহলে ফাদার! এক কাজ করা যায় ...। শক্ত মোটা রড দিয়া, অইডারে উপরে ঝুলাইয়া রাখার ব্যবস্থা করবো। হ্যাঁ! তখন ইঁদুর বিড়াল তো দূরের কথা। মরা মানুষে আর শয়তানে ধস্তাধস্তি করলেও, তুম্বা আর নিচে পড়বে না! এমনকি একদিকে কাঁইতও হইবে না।

পিতরের প্রস্তাবে, হালকা টকঝাল রসিকতার আমেজ। ফাদারও হাসলেন ওদের সাথে।

-ঠিক বলেছ। ঠিক বলেছ, পিতর! ঠিক আদম! হাঃ হাঃ!

ফাদারের সাথে আদম ও পিতর, দু'জনই যৌথভাবে যোগ দেয়। এবার হাসে তিনজন মিলে। এখন 'গেইট অব হেভেনের' তীব্র ঝাঁঝালো সেই বাতাসও নেই আর!

দক্ষিণ দিকে তাকান তিনি। গির্জার দক্ষিণের খোলা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে, তারপর খেলার মাঠ পেরিয়ে তাঁর দৃষ্টি চালান হয়ে যায় একেবারে 'স্বর্গের দ্বার' বরাবর। হ্যাঁ। কাজটি তিনিই করবেন। ওটা হবে তাঁর হাতের, প্রথম প্রকল্প। সমাধিস্থলের শেষ প্রান্তে, একেবারে বড় ক্রুশটির সামনেই তিনি নির্মাণ করাবেন একটি ছোট ঘর। সেই ঘরেই স্থানান্তরিত করবেন এই তুম্বাটিকে। তার সাথে থাকবে, মৃতদের কবর খোঁড়ার কোদাল। সেখানে সাথে থাকবে, ঝুড়ি। এবং আরও দরকারি জিনিসপত্র। তখন ভবিষ্যতে আর, অন্য কোন পাল-পুরোহিতকে তাঁর

মত ভয় পেতে হবে না! প্যারিশ কাউন্সিলে প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন। তিনি নিশ্চিত, এ কাজে সফল হবেনই তিনি।

এবার ডান হাতের পিঠ দিয়ে, আবার দু'চোখ ডলেন ফাদার। এবার তিনি লক্ষ্য করলেন; রাতের আঁধার কেটে, পূর্বদিগন্তে ভোরের আলো ছড়িয়ে, সূর্যটা উঁকি দিতে শুরু করেছে। পুষ্করিণীর ওদিকে সিস্টারদের 'সাধ্বী মণিকা' কনভেন্টের সাদা অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে এসেছে। ফাদার মনে মনে আশ্বস্ত হলেন, 'অবশেষে ভয় কেটেই গিয়েছে! ভয়ের কিছুই নেই। তা ছাড়া, ভয়ের কীইবা আছে?'

তিনি আদমকে লক্ষ ক'রে বললেন, 'আদম! আমার মনে হচ্ছে, সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকেই তুমি, এদেন উদ্যানে না ঘুমিয়ে, সদঘুদ-জ্ঞানদায়ক ফলের বৃক্ষ চৌকি দিচ্ছ!' এবং পিতরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'পিতর! তুমিও গেৎসিমানি বাগানে, প্রার্থনাশীল মন নিয়ে জেগে আছ! হ্যাঁ! যথেষ্ট হয়েছে!'

তাদের কাঁধে হাত রেখে তিনি বলেন, 'শোন আদম! শোন পিতর! ধন্যবাদ! এবার ঘুমাতে যাও তোমরা!'

আদম এবং পিতর উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। 'ফাদার!' আদম বলে, 'আপনে এইডা কী কইলেন! আমি কি, সেই আদম? সেই আদম তো, একবার নিষিদ্ধ ফল গিলেছিল! আমি তো ওই আদমের চাইতে আরও বড় পাপী! আমি তো হাজার বার তাই গিলছি! আগামীতেও আরও কতবার যে, তা গিলবো তার কি ঠিক আছে? কবরে যাওয়া পর্যন্ত, তাই করে যাবো!'

'ফাদার!' পিতর বলে, 'আর আমিও কি সেই পিতর? ওই পিতর তো, তিন বার যিশুকে অস্বীকার করেছিল! আর আমি তো, হাজার বার, লক্ষ বার যিশুকে অস্বীকার করছি! আগামীতে আরও কতবার যে তা করবো, তার কি ঠিক আছে? আমারও কবরে যাওয়া পর্যন্তই, তাই করে যাবো!'

ফাদার বললেন, 'শোন আদম। ঈশ্বর যেমন, অবাধ্য আদমের মধ্য দিয়ে এবং যিশুকে অস্বীকারকারী সেই পিতরের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন, ঠিক তেমনই তোমাদের মধ্য দিয়েও তিনি তাই করবেন। বিশ্বাস কর তোমরা।'

একই সাথে তারা দু'জন ব'লে ওঠে, 'হ্যাঁ ফাদার। আমরা বিশ্বাস করি। এখন দরকার হইলে, মরণ পর্যন্ত না ঘুমাইয়া, আপনার জন্যি জাইগা থাকুম আমরা! আমরা এইখানে আছি। এইবার আপনে ঘুমাইতে যান!'

এবার ফাদার, তিনিও আদম-পিতরের মত প্রফুল্ল চিত্তে সশব্দে হেসে ওঠেন। ❑

শ্যামলের সুরা বিহীন উৎসব

সুমন কোড়াইয়া

আর মাত্র তিনদিন পর ইস্টার সানডে বা পুনরুত্থান রবিবার। শ্যামল কোড়াইয়ার উৎসবের জন্য প্রস্তুতি মোটামুটি শেষ। সে বাবা-মা, স্ত্রী সন্তানদের জন্য কেনাকাটা করেছে। তার স্ত্রী একটি শাড়ি চেয়েছিল, তাকে এবার দুইটি শাড়ি কিনে দিয়েছে। সাথে একটি থ্রি পিচও উপহার দিয়েছে। বায়িং হাউজে চাকরি করে চল্লিশ উর্ধ্ব শ্যামল। উচ্চ বেতনে চাকরি করে সে। গত জানুয়ারিতে অফিসে ভালো পারফরমেন্স করায় একটা প্রমোশন পেয়েছে। এক লাফে তার বেতন বেড়েছে পঁচিশ হাজার টাকা। তার বৌ শ্যামলী তাকে বার বার বলছে, গত বড়দিনে তো তুমি গির্জায় গিয়ে ফাদারের নিকট পাপস্বীকার করনি। এইবার পুণ্য শনিবার চল আমরা একসাথে গির্জায় গিয়ে পাপ স্বীকার করি। ইস্টার সানডের আগের দিনকে কাথলিক খ্রিস্টানরা পুণ্য শনিবার বলে। শ্যামল রাজি হয়েছে পাপস্বীকার করতে।

শ্যামলদের বাড়িতে ইস্টারে হরেক রকম মাংস যেমন শূকর, মুরগী ও গরুর মাংসের আয়োজন করা হয়েছে। আনা হয়েছে মিষ্টি ও বিভিন্ন পদের ফল। বাদ যায়নি দই-চিড়া। বাড়িতে শ্বশুর বাড়ির লোকজন এবং তার দুই বোনকে নিমন্ত্রণ দিয়েছে। তারা ইস্টারের পর দিন বেড়াতে আসবেন। ইস্টারের একদিন পর সেও যাবে তার শ্বশুর বাড়িতে। এরপর শুরু হবে তার অফিস। ব্যস্ত হয়ে পড়বে সে। আবার ফিরে যাবে রাজধানী ঢাকায়।

পুণ্য শনিবার সকালে চুল কাটতে গ্রামের সেলুনে যাচ্ছিল শ্যামল। বাজার কাছে হওয়াতে হেঁটেই যাচ্ছিল। তার সামনে তিনজন গ্রামের বৌ ছিল। তাদের কথোপকথন তার কানে এলো।

মৌসুমী: বড়দিন-ইস্টার আসলেই একটা জিনিস খুব খারাপ লাগে।

সুরভী : কী?

মৌসুমী: কী আবার, জান না। মদ। আমাদের স্বামীরা তো মদ নিয়াই ব্যস্ত। পাইল পরবের দিন এক সাথে দুপুরের খাবার খাব, সেটার কপালই তো হয় নাই। তারা বেশি ব্যস্ত মদ নিয়ে। আমাদের কোন গুরুত্ব নাই।

পার্বতী: ঠিক বলেছ দিদি। বেডারা তো মদ খায়। আনন্দ করে, আবার আমাদের সাথে খারাপ আচরণও করে।

শ্যামলের তিন নারী প্রতিবেশির মদ সংক্রান্ত আলোচনা চলতে থাকলো বাজারে আসা পর্যন্ত। তাদের আলোচনা তার মনের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে লাগলো। কথাগুলো কী শ্যামলের জন্যও প্রযোজ্য নয়? নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলো।

সে মনে মনে ফিরে গেল পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে। তাদের এক প্রতিবেশি যিনি পরলোগত হয়েছেন আরও কুড়ি বছর আগে, সেই আন্তনী কস্তা ঢাকায় একটি ক্লাবে চাকরি করতেন। বছরে তিন চার বার গ্রামে বেড়াতে যেতেন। বেড়াতে গিয়েই তিনি প্রচুর মদ পান করতেন। সাথে সমবয়সী পাড়াপ্রতিবেশি ও বন্ধুদের মদ খাওয়াতেন। মদ্যপ অবস্থায় উল্টা-পাল্টা কাজ করতেন। যেমন বাড়িতে পাটিতে ধান শুকাতে দেওয়া হয়েছে, ধান পাটিসহ পাশের পুকুরে ফেলে দিতেন। সব চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার ছিল মদ খেয়ে তিনি নিজেকে শেষ দিকে সামাল দিতে পারতেন না। তাকে মদ্যপ অবস্থায় পাওয়া যেত বাড়ির পাশে কোন কৃষি জমিতে, পুকুরে বা খালে। তাদের গ্রামে উদার যুবক-কিশোররা তাকে ধরাধরি করে বাড়িতে দিয়ে যেত। যারা তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিত, পেছনে তার মদ্যপ হওয়া নিয়ে নানা মসকরা করতো।

এই এআই যুগেও গ্রামে দুই একজন আন্তনী আছে। যারা বড়দিন ইস্টারে মদ্যপ অবস্থায় এদিক সেদিক পড়ে থাকে। শ্যামল ঠিক করল, সে এই ইস্টারে মদের পেছনে এক টাকাও খরচ করবে না। কোনভাবেই মদ পান করবে না।

মদের কথা চিন্তা করতে করতে শ্যামলের চুল কাটা শেষ। বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে দুপুরের খাবার খেল। বিকালে গেল সস্ত্রীক পাপস্বীকার করতে। পাপস্বীকার করে সে মনে বড়ো শান্তি পেল। ফাদার পাপস্বীকার শোনার পর ক্ষুদ্র উপদেশে শ্যামলকে বললো: "ভালো জীবন যাপন করলে আশে-পাশের মানুষ ও আত্মীয়-স্বজনরা মনে কষ্ট পায় না, খুশি হয়। পাশাপাশি ঈশ্বরও খুশি হয়। তোমাকে আশীর্বাদ করছি। ভালো জীবন-যাপনের ইচ্ছাই তোমাকে ভালোর দিকে নিয়ে যাবে।"

ইস্টার সানডে। সকাল এগারটা। গির্জায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে বাড়িতে ফিরেছে শ্যামল। তখন গ্রামের মানুষ এবাড়ি ও বাড়ি আসা যাওয়া করছে। ইস্টারের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, ছোটরা বড়দের নিকট হতে আশীর্বাদ নিচ্ছে। বড়রা আশীর্বাদ দিচ্ছেন।

শ্যামলের বাল্যবন্ধু শোভন আসলো তাদের বাড়িতে। তার বন্ধু চট্টগ্রামে চাকরি করে।

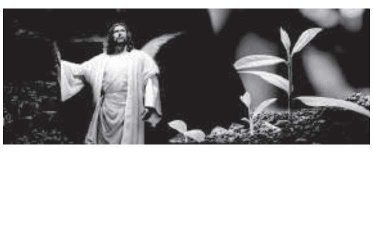

সে বছরে একবার বাড়িতে আসে। খুব বেশি প্রয়োজন পড়লে আরেকবার ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসতে হয়। খুব বেশি ছুটি পায় না সে। একটি প্রতিষ্ঠানের স্টোর কিপারের চাকরি করে। গত বড়দিনে শোভন আসেনি। তাই ইস্টারে এসেছে। যখনই বাড়িতে আসে শোভন মদের পেছনে পানির মতো টাকা ঢালে। সাথে চট্টগ্রাম থেকে বিদেশী মদও নিয়ে আসে।

সে বলে, বন্ধু একটু খাওয়াবি না?

শ্যামল বুঝতে পারে। বলে, বন্ধু কিছু মনে করিস না, এইবার ইস্টারে মদের আয়োজন করি নাই। মদ ছাড়াই ইস্টার করছি।

শোভনের মুখে চিকন কিন্তু দুষ্ট হাসি দেখা গেল। এই হাসির অনেক মানে হয়। শ্যামল বুঝতে পারে। তবে এই হাসিতে আন্তরিকতা আছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। ইস্টারের দিনে, শ্যামল হাসির আর অন্য কোন মানে বের করতে চায় না। সে বলে, বস দই চিড়া মুড়ি দিতে বলি বৌকে?

শোভন পকেট থেকে হাফ লিটার মদ বের করে। বলে, অনেক দিন পর তোর সাথে দেখা। চল একটু গলা ভিজাই।

শ্যামলের বৌ শ্যামলী তখনই ঘরে প্রবেশ করলো। বরের বন্ধুকে যথেষ্ট সমীহ করে শ্যামলী। সে বলে, শোভনদা, শ্যামলকে ডাক্তার মদ খেতে নিষেধ করেছে। মদ খেলে ওর সমস্যা হয়।

চুপ করে থাকে তার স্বামী।

শোভন মদের বোতলটা আবার থ্রি কোয়াটার প্যান্টের পকেটে রেখে দেয়। শোভন এই প্যান্ট বিশেষ বিশেষ সময় পরে, যখন মদ নিয়ে এদিক সেদিক যায়, তখন পকেটে মদ বহন করা তার জন্য সহজ হয়।

শ্যামল দুপুরে আনন্দময় পরিবেশে বাবা-মা, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে এক সাথে নিয়ে খাবার খেল। দুপুরে খাওয়ার সময় শ্যামলের বাবা ফ্রান্সিস বলেন, আগের দিনের ইস্টার খুব মিস করি রে। পুণ্য বৃহস্পতিবার সারা রাত নিশি জাগরণী প্রার্থনা করতাম। আমরা রাতে জেগে থাকতাম। ওই রাতেই শত্রুদের হাতে ইস্কারিয়ত যুদা যিশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল। জেগে থাকার জন্য আমরা রাতে কাবাডি খেলারও আয়োজন করতাম। কাবাডি খেলার চল তো এখন প্রায় উঠেই গেছে বলা চলে।

শ্যামলের মনে আছে, যখন সে প্রাইমারি স্কুলে পড়েছে, তখন হা ডু ডু বা কাবাডি খেলার আয়োজন দেখেছে। সে নিজেও খেলতো। তার নিজের ওই পুরাতন দিনের কথা মনে হলে ভালো লাগে।

এক সাথে খাবার খাওয়ার সময় ওরা আরেকটি বিষয় আলাপ করলো। সেটা হলো বৈঠক। ইস্টারের দিন সমাজের মানুষ (দশ থেকে বার পরিবারের মানুষ, তবে কম বেশিও হতে পারে; এক সমাজ) সকালে গির্জা থেকে পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে বাড়িতে ফিরে সকালের নাস্তা খেত যার যার বাড়িতে। দুপুরে সমাজের কোন একটি বাড়ি নির্ধারণ করা হতে, সেখানে বৈঠক হতো। এই বৈঠকে কষ্টের গান, ইস্টারের গান ও কীর্তন গাওয়া হতো। সমাজের সকলে সেখানে উপস্থিত থাকতো। অনেকে শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে ইস্টার করতে বৈঠকের সময় শুভেচ্ছা আদান-প্রদান ও ভাব বিনিময় করতো। বছরে কোন কোন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে শুধু ঐ সময়ই দেখা হতো। কারণ গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই হয়ত ঢাকা নয়ত চট্টগ্রাম শহরে থাকে। এই বৈঠক শেষে জিলাপি, মুড়ি, বাতাসা বিতরণ করা হতো। এগুলো কেনার জন্য ইস্টারের কয়েক দিন আগে গোয়ামেল বা প্রস্তুতি সভা করা হতো; সেখানে বাড়ি প্রতি চাঁদা নির্ধারণ করা হতে বৈঠকে খরচ করার জন্য। বৈঠকে পান করার জন্য মদও কেনা হতো। বড়োরা বিশেষ করে, যারা বিবাহিত পুরুষ, তারা দুই তিন পেগ মদ পান করতো।

গোলাপ রোজারিও সুরা একটু বেশি ভালোবাসতেন। তিনি নিজেও বৈঠকে লুকিয়ে মদ নিয়ে যেতেন। বাড়ি থেকে মদ খেয়েও আসতেন। একবার মদ খেয়ে সমাজের প্রধানকে অপমান করেন। বিষয়টা মারামারির পর্যায়ে চলে যায়। পরে গির্জার ফাদার এসে তাদের দ্বন্দ্ব মিটমাট করেন। সেই থেকে তাদের সমাজে বৈঠক করা বন্ধ। বিশেষ করে, নারীরা চায় না আর বৈঠক হোক। তারা বলে, বৈঠক করে লাভ কী? পুরুষদের মদ খাওয়া হয় আর শেষে মারামারি হয়।

বৈশাখের দুপুর। খাবার খেয়ে সবে শুয়েছিল শ্যামল। পাশের বাড়ি থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। তারা স্বামী-স্ত্রী জানালা খুলে দেখে পাশের বাড়ির পার্বতী কাঁদছে। কেউ কী মারা গেছে? প্রশ্ন করে শ্যামল?

আরে না? তুমি জান না, মাইকেলটা একটা অমানুষ। প্রতি বড়দিন-ইস্টার আসলেই তো মদ খেয়ে বৌকে মারে- ক্ষোভের সাথে উত্তর দেয় শ্যামলী।

তারা দুই জন ঘর থেকে বের হয়ে দৌঁড়ে গেল মাইকেলদের বাড়িতে। গিয়ে বুঝতে পারে মাইকেল মদ খেয়ে অতিরিক্ত মাতাল হয়েছে। তার হাতে একটা লাঠি। ইতিমধ্যে হয়তো স্ত্রীকে সেটা দিয়ে মেরেছেও। আবারও মারার জন্য যাচ্ছিল, তখন শ্যামল তাকে ধরে ফেলে। টেনে উঠান থেকে ঘরে নিয়ে যায়। বলে, ভাই, শান্ত হও। বৌদিকে মারছ কেন?

বৌ আমারে ভালোবাসে না। আমি মদ খাই বলে রাগারাগি করে- উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেয় মাইকেল। বলতে বলতে টলে পড়ে যাচ্ছিল সে।

শ্যামল জানে এখন মাইকেলের বিপক্ষে কথা বললে তার উপরও সে রেগে যাবে। বলে, তুমি শোয়ে থাক ভাই। আমি বৌদির সাথে কথা বলছি। শ্যামলের একটা প্রভাব এই পাড়ায় আছে। সে ভালো বেতনের চাকরি করে বলে, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। বিপদে আপদে কেউ টাকা ধার চাইলে সে না করতে পারে না। মাইকেলও অনেকবার তার নিকট টাকা চেয়েছিল। যদিও কোন বারই সে ফেরত দেয়নি। শ্যামলের প্রতি সমীহ আছে মাইকেলের। মদ্যপ মাইকেলকে বিছানায় শোতে সাহায্য করে শ্যামল।

কিছুক্ষণ পরই পেট থেকে সব কিছু গলা দিয়ে বের হয়ে যায় তার। বমি বিছানায় পড়েনি। তবে ফ্লোর ভাসিয়ে দিয়েছে। বমির উটকো গন্ধে আশেপাশে যারা রয়েছে, তাদেরও বমি হবার উপক্রম।

উঠানে মস্ত একটা আম গাছ। সেখানে এবার প্রচুর আম ধরেছে। গাছের নিচে বেঞ্চে বসে কাঁদছে পার্বতী। সে যেটা বলছে, সেটা গতকালকে বাজারে যাওয়ার কথার সাথে মিল পেল শ্যামল।

'বড়দিন ইস্টারের আনন্দ কী শুধু পুরুষ মানুষের? সে মদ খাবে। দুপুরে এক সাথে ভাত পর্যন্ত খাবে না। আমার সাথে খারাপ আচরণ করবে। মদ খেতে নিষেধ করলে মারবে। আমার মতো নারীরা খুবই অসন্তুষ্ট মদ্যপ স্বামীদের কারণে।" পাবর্তীর ভাষ্য।

শ্যামল দেখেছে, পাবর্তীর শ্বশুর ভিনসেন্টও এরকম ছিলেন। তিনিও মদ খুব পছন্দ করতেন। মদ খেয়ে বৌকে পেটাতেন। কোন বড়দিন ইস্টারে বাড়িতে শান্তি থাকতো না এই বাড়িতে।

এক ইস্টারে প্রচণ্ড গরম পড়ে, অতিরিক্ত মদ পান করে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ভিনসেন্ট। হাসপাতালে নিতে নিতে তিনি মারা যান। একই পরিণতি যেন না হয় তাই পাবর্তীও স্বামীকে মদ খেতে বারণ করে কিন্তু তার স্বামী সে কথা শোনার পাত্র না।

পরদিন শ্যামলদের বাড়ির আত্মীয়-স্বজনরা বেড়াতে আসে। দুপুরে ভাত খাওয়ার আগে ছোট বোনের স্বামী রঞ্জন জিজ্ঞেস করে, দাদা, জিনিসের ব্যবস্থা আছে নাকি?

না ব্যবস্থা করি নাই ভাই, উত্তর দেয় শ্যামল।

রঞ্জন ব্যাগ থেকে মদ বের করে।

ভীষণ লজ্জায় পড়ে যায় শ্যামল। সে বলে, সত্যি কথা বলতে কী, এই ইস্টারে জিনিসের খোঁজই করি নাই। এছাড়া মদ খাওয়ার ব্যাপারে ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা আছে আমার বিরুদ্ধে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রঞ্জন বলে, ডাক্তার তো বলবেই।

তবে শ্যামল সেদিন সত্যি সুরা পান করেনি। যদিও তাকে মদ খাওয়ার বিষয়ে কোন চিকিৎসকই নিষেধ করেনি। শ্যামলের মনে প্রশ্ন, সামাজিকতার নামে এই মদ খাওয়া কোনদিন বন্ধ না? ❑

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার ৮৫ বছর

ফিরে পাওয়া জীবন

ফাল্গুনী ডি কস্তা

যখন আমার জ্ঞান ফিরল, তখন নিজেকে মেঝেতে আবিষ্কার করলাম। মাথার ওপরে সাঁই সাঁই করে ফ্যান ঘুরছে। মনে হলো, আমিসহ পুরো ঘরটাই যেন ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে আছে। অসহ্য যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়েছে সারা শরীরে। ঠোঁটের ফাটল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, গাল বেয়ে টপটপ করে নোনতা জল ঝরছে। কোথায় আছি, প্রথমে বুঝতে পারলাম না। মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছিল না। শুধু এটুকু মনে আছে, আমি বন্ধুদের আস্তানায় এসেছিলাম। তারপর কী ঘটেছে, তা আর কিছুতেই মনে পড়ছে না। কেবল একটা অস্পষ্ট স্মৃতি জেগে উঠল, আমি টিউশনির কথা বলে বন্ধুদের সঙ্গে এখানে আড্ডা দিতে এসেছিলাম।

ধীরে ধীরে অতীত জীবনের স্মৃতিগুলো একে একে আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল। আমি বাবা-মায়ের আদরের সন্তান। তাঁদের স্নেহ-ভালোবাসায় আমাদের ছোট্ট সংসার ছিল অপার সুখের আধার। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, প্রার্থনা করা, উৎসবে যোগ দেওয়া এসব ছিল আমাদের নিত্যদিনের রুটিন। বাবা-মা আমাকে কখনো চোখের আড়াল হতে দিতেন না। ক্ষুধা লাগার আগেই মা খাবার এগিয়ে দিতেন, আর ব্যথা পেলেই তাঁরা যেন নিজের বুকের মাঝে আঘাত অনুভব করতেন। আমার সামান্য কষ্টেও তাঁরা অস্থির হয়ে যেতেন। চাকরিজীবী হওয়ায় মাকেও আমি ঘরের বিভিন্ন কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করতাম। সারাদিনের প্রতিটি কথা ও ঘটনা মায়ের সাথে শেয়ার করলাম। আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট খুব ভালো হয়েছিল। মা আমার পাশে বসে রাত জেগে আমাকে পড়াতেন, মুখস্থ করতে সাহায্য করতেন, পড়া ধরতেন। তাঁদের প্রতি আজ্ঞাবহ থাকার পুরস্কার পেয়েছিলাম ভালো ফলাফলের মাধ্যমে। কিন্তু সময় বদলে যেতে বেশি দেরি হয়নি।

আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষে ভর্তি হলাম, তখন বাবা-মায়ের কথাগুলো একসময় বিরক্তিকর ঠেকতে লাগল। ধীরে ধীরে তাঁদের প্রতি এক ধরনের অবচেতন অশ্রদ্ধা গড়ে উঠল আমার ভেতর। সেই অনুভূতি দিন দিন গাঢ় হতে লাগল। তাঁদের একটাই কথা, "পড়াশোনায় মনোযোগ দাও, এটা তোমার ভবিষ্যৎ গড়ার সময়।" অথচ সেই কথাগুলো আমার কাছে বিষের মতো তিক্ত মনে হতো। পড়াশোনার চেয়ে মোবাইল স্ক্রিনের আলোয় ডুবে থাকা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া বেশি ভালো লাগত। আস্তে আস্তে বাবা-মায়ের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করে দিলাম। মনে হতে লাগল, যেন আমি তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাই। হয় তাঁরা মরে যাক, না হয় আমি মরে যাই এমন এক বিভ্রান্তিকর অনুভূতি ঘিরে ধরেছিল আমাকে। "আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর, তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা, এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর, এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।" বারবার সুকান্তের লাইনগুলো মনে বাজতে লাগল।

বাবা-মার শাসন ও ভালোবাসা থেকে পালিয়ে আমি বন্ধুদের সঙ্গ বেছে নিলাম। ওদের আড্ডায় জড়িয়ে পড়লাম, যারা নিয়মিত নেশাদ্রব্য গ্রহণ করত। প্রথমে বাঁধা দিলেও পরে কৌতূহলবশত অল্প অল্প করে আমিও সেই পথে পা বাড়ালাম। বন্ধুরা একসময় চাপ দিতে লাগল, "তুই সবসময় আমাদের টাকায় খাস, এখন থেকে তুইও টাকা যোগাড় করবি।" বাবা-মা যে হাতখরচ দিতেন, তার সবটাই ওদের হাতে তুলে দিতাম। কিন্তু একসময় সব ফুরিয়ে গেল। একদিন বন্ধুরা বলল, "আজকের টাকাটা কোথায়?" আমি নিরুপায় হয়ে ওদের আস্তানায় গিয়ে বললাম, "আমার কাছে আজ টাকা নেই।" এই কথা শুনেই শুরু হলো তীব্র বাকবিতণ্ডা, তারপর তা হাতাহাতিতে গড়াল। তারপর... আর কিছুই মনে নেই।

তবে, অজ্ঞান অবস্থায় অবচেতন মনের দু'টো স্বপ্ন এখনো মস্তিষ্কে ঝলসে উঠছে। এক, অন্ধকার বনানী। কে যেন আমার হাত ধরে একটি নদীর পাড়ে নিয়ে গেল। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছিল, আমি পরম তৃপ্তিতে জল পান করলাম। আর দেখলাম, মা আমাকে আদর করে খাওয়াচ্ছেন। ঠিক তখনই তীব্র ক্ষুধা অনুভব করলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য ফিরে এলো।

শরীর এতই দুর্বল যে উঠে দাঁড়াতে পারছি না। সারাদিনের অনাহার আর আঘাতে পঙ্গুর মতো পড়ে আছি। কয়টা বাজে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এই প্রথম বুঝতে পারলাম "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়"। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হলো। চাইবার আগেই মা পাঁচ বেলার খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখতেন। অথচ এই মুহূর্তে ক্ষুধার জ্বালায় উদর পুড়ছে! মা-বাবা ভালোবেসে ব্যাপ্তিজমের সময় আমার নাম রেখেছিলেন "মানিক"। বয়স আমার আঠারো। হঠাৎ এক ভালো বন্ধু এসে পড়ল ও আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। বাড়ি গিয়ে দেখি মা শয্যাশায়ী, সারাদিন আমাকে খুঁজে না পেয়ে। বাবাও প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে মা-বাবার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলাম। মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "মা, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কখনোই তোমাদের ছেড়ে দূরে থাকব না!" এই জগত সংসারে নিজের পরিবার ছাড়া আপন কেউ নেই, এই সত্যিটা আজ জীবনের মূল্যে বুঝতে পারলাম। "তবুও আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি, এই বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে, বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী, এই বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।" কবি সুকান্তের লাইনগুলো আবারও বেজে উঠল মনের পর্দায়। ❑

এসো হে বৈশাখ
মিল্টন রোজারিও

চারিদিকে আজ সাজ সাজ রব
ফুটেছে লাল কৃষ্ণচূড়া শাখায় শাখায়,
সোনালু দুলছে যেন সারা গায়ে মেখে সোনা
বর্ষ বরণের এমন আড়ম্বর আয়োজন
চলছে আজ সারা বাংলায়!!

কুমার পাড়ায় হচ্ছে তৈরী
মাটির পুতুল ঘোড়া-হাতী
আরো আছে কত রকমারি হাড়ি-পাতি
জমবে মেলা ঘুরবে নাগর-দোলা
এই তো আমাদের বর্ষ বরণ কাটবে
সারাবেলা!

তালের পাখা বাঁশের বাঁশী
নাটাই হাতে কিশোর উড়াবে ঘুড়ি
মেলা ভরে আজ আনন্দ ছড়াছড়ি
ছোট মনি ব্যস্ত মাটির পুতুল সাজিয়ে
ছোট ভাইটি মাতায় ঢোল বাজিয়ে!

রাজপথে শত বরণ ডালা হাতে
ছুটে সকল ছেলেমেয়েরা এক সাথে
মঙ্গল শোভাযাত্রায় বৈশাখের প্রভাতে
বাহারি রঙের সাজ সেজে সবে
"এসো হে বৈশাখ...." কণ্ঠ মেলাবে!

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

আলোর পথে ফেরা

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

উপজেলা সদর থেকে বেশ দূরে গ্রামটির অবস্থান। উত্তর পাশে দিগন্ত-বিস্তৃত ফসলের মাঠ, দক্ষিণে উপজেলা সদরে যাওয়ার রাস্তা। ফসলী-মাঠটি এ গ্রামের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে আবহমান কাল ধরে। মাঠটির উর্বর জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর নির্ভর করেই এ গ্রামের মানুষের জীবন-প্রবাহের গতিবিধি নির্ধারিত হয়। গ্রামের পাশে অবস্থিত বিশাল এ মাঠটির কারণেই হয়তো বা এ গ্রামের নাম হয়েছে মাঠপাড়া। এ মাঠপাড়া গ্রামে পঞ্চাশটি পরিবারের বাস। কৃষির ওপর নির্ভরশীল বিধায় পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থা কখনও স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছেনি। তবে বিগত কয়েক বছর যাবৎ গ্রামের কিছু পুরুষ সদস্য মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরী জন্য নিয়ে যাওয়ার কারণে গ্রামে পেট্রো-ডলারের ছোঁয়া লাগে। পেট্রো-ডলারের শক্তিতে বাড়ি-ঘরের চেহারার সাথে সাথে মানুষের বাহ্যিকতায়ও পরিবর্তন আসে।

এ গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান রোমেল। রোমেলদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এমন এক ধরণের ভালোবাসার বন্ধন আছে যা অনেক পরিবারের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। রোমেল মেধাবী। ক্লাসে প্রথম স্থানটি যেন ও'র জন্যই বরাদ্দ। ও'র মেধা সবাইকে মুগ্ধ করে। সম-বয়সীরা ও'কে ঈর্ষা করে। বড়রা ও'কে ভালোবাসে, স্নেহ করে। কিন্তু রোমেলের মধ্যে অহংকারের ছিঁটেফোঁটাও নেই। ও' কখনো কাউকে অবহেলা করে না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না, কষ্ট দেয় না।

কৃষির ওপর নির্ভরশীলতাকালীন সময়ে কদাচিৎ কিছু অনুষ্ঠান অথবা পার্বণে হাতে-গোনা কয়েকজন গ্রামবাসী মদ-পান করতো। তাও আবার সীমিত পরিসরে। পেট্রো-ডলার শক্তিশালী অবস্থান নেয়ার পর মদ-পানের বিষয়টি আর সীমিত পরিসরে থাকে না। ইহা বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করে। মাদক নামক বিষ মহামারীর মতো পরিবার থেকে পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে। এ মহামারী থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করার জন্য যাদের কাজ করার কথা তারা নিজেরাও মাদকের ছোবলে ধরাসায়ী হয়। যে দু'একজন মাদক থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়, তাদের পক্ষে মাদক-বিরোধী জোরালো ভূমিকা রাখা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

মদ নামক মাদক-এর আকাশ-ছোঁয়া চাহিদার কারণে রাতারাতি অঢেল টাকার মালিক হওয়ার ধান্ধায় গ্রামের কয়েকটি পরিবার দেশী-মদ তৈরি করা শুরু করে। এক সময় যে যুব-সংগঠনগুলো মাদক-বিরোধী অভিযান পরিচালনা করতো তারা বিভিন্ন ছুঁতোয় প্রায়শঃ মদের পার্টির আয়োজন করে। এ পার্টিগুলো অনেক যুবক-কিশোরের মদ-পানের হাতে-খড়ি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। যুব সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত এ ধরণের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে রোমেলও মদের স্বাদ নিতে বাধ্য হয়।

বার্ষিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হওয়ায় গ্রামের যুব-সংগঠনের পক্ষ থেকে পার্টির আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সদস্য বিধায় রোমেলও পার্টিতে অংশগ্রহণ করে। পার্টির এক পর্যায়ে মদের বোতল খোলা হয়। রোমেল চলে আসতে চায়। কিন্তু অন্যরা রোমেলকে চেপে ধরে। রোমেলের কাছের বন্ধু রাজন। রাজন রোমেলকে বলে, বন্ধু, একবার একটু চেষ্টা কর। তুই ভালো ছেলে তা আমরা সবাই জানি। একবার একটু পরীক্ষা করেই দেখ, কেমন লাগে? ভালো না লাগলে আর জোর করবো না। রোমেল রাজনকে বলে, দেখ রাজন, আমাকে জোর করিস্ না। আমি পত্রিকায় পড়েছি মদ শরীর ও মনের ক্ষতি করে, পরিবার ও সমাজের ক্ষতি করে, সর্বোপরি দেশের ক্ষতি করে। যা এতগুলো ক্ষতির কারণ তা আমি পান করা তো দূরের কথা ছুঁয়েও দেখবো না। রোমেলের কথা শুনে ও'রা হাসে। হাসতে হাসতে বলে, ঠিক আছে রোমেল, আজ শুধুমাত্র অল্প একটু টেস্ট করে দেখ কেমন লাগে। আর কোনদিন তোকে অনুরোধ করবো না, জোরাজুরি করবো না। পুরুষ মানুষ এক চুমুক মদ পান করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আজকাল মেয়েরাও তো মদ পান করছে দেদারসে।

রাজন রোমেলের দিকে মদের গ্লাস এগিয়ে দেয়। দ্বিধাগ্রস্ত, অনিচ্ছুক রোমেল মদের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ায়। কাঁপা কাঁপা হাতে ও' গ্লাসটি হাতে নেয়। কিন্তু সে মদের গ্লাস হাতে নির্বাক বসে থাকে। মদ পানে ও'র বিবেক বাধা দিতে থাকে অনবরত। রোমেল হয়তো মদের গ্লাসটি রেখেই দিতো। কিন্তু রাজন জোর করে রোমেলের মুখে সম্পূর্ণ মদ ঢেলে দেয়। অনভ্যস্ত রোমেলের শরীরে মদের ক্রিয়া শুরু হতে বিলম্ব হয় না। মদ ও'র মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম দেয়। মনে হয় সে যেন অন্য এক পৃথিবীতে চলে গেছে। যেখানে সব কিছু সহজ ও আনন্দময়। এ অশুভ আনন্দ থেকে রোমেল বেরোতে পারে না। ও' ধীরে ধীরে মদে আসক্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু, রোমেলের এ আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হয় না। কয়েকদিন পরই রোমেল বুঝতে পারে, মদ ও'র শরীর এবং মন দু'টোই ধ্বংস করে দিচ্ছে। দিন দিন ও'র শরীরের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। পড়াশোনা ও খেলার প্রতি আগ্রহ কমে যায় আশ্চর্যজনকভাবে। ও' এক অন্ধকার জগতের দিকে চলে যায়, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত কষ্টের, যন্ত্রণার। রোমেল বুঝতে পারে, মদ-পানের পরিমান বৃদ্ধির সাথে সাথে ও'র জীবন আরও কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে।

মায়ের চোখের জল রোমেলের হৃদয়ে এক অজানা অনুভূতির সৃষ্টি করে। ও'র মা, যিনি রোমেলকে অনেক স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা দিয়ে বড় করছিলেন এবং ছেলেকে নিয়ে গর্ব করতেন, সে মাকে দেখে রোমেলের হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছিলো। মা'র কষ্টমাখা মুখের দিকে রোমেল তাকাতেও পারছিলো না। একদিন মা রোমেলকে ডেকে বললেন- রোমেল, আমি জানি তুমি ভালো ছেলে, তুমি আমাদের গর্ব। কিন্তু, কেন এমন করছো? আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে, তুমি কি তা বুঝতে পারছো না?

রোমেলও অনেক কষ্ট পাচ্ছিলো। কিন্তু ও' জানতো, এখন ও'র পক্ষে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাটা সহজ নয়। মাদক ও'র জীবনকে গিলে ফেলেছিলো। এ অন্ধকার জগৎ থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে পাচ্ছিলো না ও'।

মানুষ সামাজিক জীব। পারস্পারিক সহযোগিতায় তাদের এগিয়ে চলতে হয়। আবহমানকাল থেকে এ ধারা চলে আসছে। একজনের বিপদে অন্যের এগিয়ে আসা বা এগিয়ে যাওয়াটা মানুষের স্বভাবজাত। ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। স্বভাবজাত বিধায়ই ব্যতিক্রমগুলো আমাদের বেশী চোখে পড়ে। রোমেলের এ বিপদে ও'র মামা এগিয়ে আসেন। তিনি রোমেলকে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিনোদ রায়-এর নিকট নিয়ে যান। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ রোমেলকে বলেন- আমি জানি, তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছো। কিন্তু জানো কী? মানুষের সৃষ্ট সকল সমস্যা থেকে মুক্তি সম্ভব, তবে প্রথমে নিজের ভেতরে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাটা জাগ্রত করতে হবে।

ডাঃ বিনোদ রায় রোমেলকে পুর্নবাসন

কেন্দ্রে পাঠানোর পরামর্শ প্রদান করেন। রোমেল প্রথমে সংকোচবোধ করছিলো। ডাঃ বিনোদ রোমেলকে বুঝিয়ে বললেন- এটা কোনো লজ্জার বিষয় নয়, বরং এটি তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তুমি যদি পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরামর্শগুলো মেনে চলতে পারো, তাহলে সমস্যা হতে মুক্ত হতে পারবে”।

রোমেল কিছুটা আশাবাদী হয়ে পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি হয়। প্রথম প্রথম তার খুব কষ্ট হয়। শরীরে নানা ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। মাথাব্যথা, অবসাদে স্নায়ু যেন ভেঙ্গে যেতে থাকে। কিন্তু রোমেল বুঝতে পারছিলো, এ কঠিন পথ যদি ও’ পাড়ি দিতে পারে তাহলে ও’র সামনে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। পুনর্বাসন কেন্দ্রে রোমেল জীবনকে নতুন করে দেখার চেষ্টা করতে থাকে। চিকিৎসক এবং থেরাপিস্টরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ধীরে ধীরে রোমেল পুনরুদ্ধারের পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

পুনর্বাসন কেন্দ্রের এক বিশেষ সেশন থেকে রোমেল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পায়। ও’কে বলা হয়, “মাদক কখনও কারো জীবনের অংশ হতে পারে না। এটি শুধু মাদকাসক্ত ব্যক্তির ভিতরের শক্তিকে ভঙ্গুর করে দেয়, আর তার ভেতরের প্রতিভা, স্বপ্ন, আশা সব কিছু নষ্ট করে দেয়। কিন্তু মাদকাসক্ত ব্যক্তিটি যদি মনকে শক্ত করতে পারে, পরিবর্তন করতে পারে, সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারে তাহলে সে মাদকের ভয়াল গ্রাস থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে পারবে। মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার নয়”।

পুনর্বাসন কেন্দ্রের সঠিক পরিচর্যা এবং নিজের একান্ত প্রচেষ্টায় রোমেল ধীরে ধীরে মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পায়। পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে ফিরে আসার পর ও’ পুনরায় পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়। এবার ও’ বন্ধু নির্বাচন করতে ভুল করে না। খারাপ বন্ধুদের রোমেল পরিত্যাগ করে। ভালো বন্ধু খুঁজতে গিয়ে ও’র বন্ধুর সংখ্যা কমে যায়, এতে রোমেলের কোন কষ্ট হয় না। পুনর্বাসন কেন্দ্রে ও’ শিখে এসেছে- পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন হার মানা যাবে না এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। ও’ প্রতিজ্ঞা করে, কখনো নিজের ওপর বিশ্বাস হারাবে না।

একদিন রোমেল ও’র মা ও বাবার নিকট গিয়ে বলে- মা, বাবা, আমি বুঝতে পারি, আমি তোমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু আজ আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আর কখনো কোন ধরণের ভুল পথে হাঁটবো না। আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছি। আমি আবার নতুন করে শুরু করতে চাই, আমি আলো দেখতে চাই, আলোতে ফিরতে চাই, আলোতে থাকতে চাই। তোমরা অন্ধকার থেকে আলোতে ফেরার জন্য লড়াই করা তোমাদের এ সন্তানটিকে আশির্বাদ করো।

রোমেলের মা কাঁদতে কাঁদতে রোমেলকে জড়িয়ে ধরে বলে- আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি, বাবা। তুমি আমাদের শক্তি, তুমি আমাদের গর্ব হবে বাবা। আমরা সব সময় তোমার পাশে আছি বাবা। আমাদের আশীর্বাদও সর্বক্ষণ তোমার সাথে থাকবে।

বাবা-মা’র সহযোগিতা এবং আশীর্বাদে রোমেল পুনরায় ও’র স্বপ্ন পূরণের পথে চলা শুরু করলো। পড়াশোনা, খেলাধুলা এবং সমাজসেবায় অংশগ্রহণ- সবকিছু ও’র জীবনে ফিরে আসলো। মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে কেউ যদি সত্যিই সত্যিই জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলতে চায় তাহলে যে তা সম্ভব- রোমেল তা প্রমাণ করে দিলো।

রোমেল এখন বেশ বুঝতে পারে মদ আসলে জীবনের কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারে না। বরং তা মানুষকে তার ভালোবাসা, তার সম্পর্ক এবং তার স্বপ্ন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। কিন্তু কেউ যদি মনে-প্রাণে চায় তাহলে মুক্তি, সুখ এবং শান্তি সবই অর্জন করা সম্ভব- এর জন্য শুধুমাত্র জীবনকে বুঝতে হবে, জীবনকে ভালোবাসতে হবে এবং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। ❑

“যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী অথবা এইচএসসি, ডিগ্রী বা অর্নাস পর্যায়ে অধ্যয়নরত তাদের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান অন্বেষণ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য বিশেষ নিমন্ত্রন”

তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?
তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

যদি তুমি হ্যাঁ বল...... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।
- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সংঘের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও **“এসো দেখে যাও”** প্রোগ্রামের আয়োজন করতে যাচ্ছে। যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, তাদের নিম্নের উল্লেখিত যে কোন ফাদারের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। (দিন ও তারিখ পরে জানিয়ে দেয়া হবে)।

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ
স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফাদার লিন্টু আরেং, ওএমআই আহ্বান পরিচালক মোবাইল: ০১৬০৭-০১৯৫৫৭	**ঢাকা অঞ্চল** ফাদার পিন্টু কস্তা, ওএমআই মোবাইল: ০১৭১৫-২৪৪৭৯৬ **সিলেট অঞ্চল** ফাদার সুজন কিস্কু, ওএমআই মোবাইল: ০১৮৩৯-২৬২৫৬০	**রাজশাহী অঞ্চল** ফাদার প্লাবন রোজারিও, ওএমআই মোবাইল: ০১৭৩৬-৫১৯৮০৪ **চিটাগং অঞ্চল** ফাদার রকি কস্তা, ওএমআই মোবাইল: ০১৮৩৭-৮৩৭৫৭৫

আমার প্রতি যিশুর আহ্বান

সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ

তপস্যাকাল, প্রায়শ্চিত্তকাল, যাতনাভোগকাল বিভিন্ন শব্দের সাথে কম বেশী আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। যা দ্বারা আমরা পাস্কা রহস্য বুঝতে পারি। অর্থাৎ যিশুর যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান। যিশুর ক্রুশের সাথে নিজেদের ক্রুশ নিয়ে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করে এক সাথে পথ চলা। আবার তাঁর পুনরুত্থানের সাথে একাত্ম হওয়া।

যিশুর সময়কার সব চেয়ে লজ্জাজনক এবং অপমানজনক শাস্তি ছিল ক্রুশীয় মৃত্যু। কোন ব্যক্তিই চাননা কোন কারণে অপমানিত হতে। যিশুর কোন দরকার ছিলনা ক্রুশ বহন করে কালভেরী পর্বত পর্যন্ত পথ চলার। তবে এর পিছনে বড় কারণ হলো -তিনি [যিশু] আমাদের প্রত্যেককে ভালোবাসেন। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হলো কাজে। যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে সে ব্যক্তি কাজের মধ্য দিয়ে তার ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকে। যিশু আমাকে, আপনাকে অর্থাৎ প্রত্যেক আমিকে ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসেন। তাঁর এ ভালোবাসা নিঃস্বার্থ। তিনি চান তাঁর এ ভালোবাসায় আমরা প্রত্যেকজন যেন অংশগ্রহণ করি।

যিশু পিতার বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ পুত্রকে (যিশু) নিয়ে পিতার যে পরিকল্পনা ছিল পুত্র তা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পিতার বাধ্য হয়েছেন। কি মনে হয়! এই বাধ্যতা পালন করতে যিশুর কি কষ্ট হয়নি! অবশ্যই হয়েছে। নিজেকে দিয়ে একটু চিন্তা করি। যখন আমি জানব একজন আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দিবে- আমার বন্ধু, আমার প্রিয়জন, আমার মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন যাকে আমি এত ভালোবাসি। তখন আমি কি সিদ্ধান্ত নিতাম! আমি কি তাকে ঘৃণা করতাম, তাকে ছেড়ে দিতাম, অন্য মানুষের দ্বারস্ত হতাম, তার নামে সমালোচনা করতাম। এর চেয়ে আরো বেশিই করতাম। কিন্তু যিশু! কিছুই করেন নি। তাঁর ভালোবাসা একটুও কমে যায় নি। বরং প্রথম দিনের মত শেষ দিন পর্যন্ত একই ভালোবাসায় ভালোবেসেছেন।

পৃথিবীতে বসবাসকারী রক্ত মাংসের প্রত্যেকজন মানুষই পাপী দুর্বল। পাপের মধ্যেই আমাদের অবস্থান। পাপ প্রলোভন কোন কিছু থেকেই আমরা পরিপূর্ণ মুক্তি পাইনা আর পাবোও না। এগুলো আমাদের যাপিত জীবনের নিত্য সঙ্গী। যিশু ঈশ্বর ছিলেন বলেই সকল পাপ প্রলোভন জয় করেছেন। কিন্তু আমরা দুর্বল মানুষ। পাপ প্রলোভন, অন্যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। প্রলোভন আসা পাপ নয় বরং প্রলোভনে পড়াই পাপ।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছোট বড় কত অন্যায় অধর্ম করে বেড়াই যা বলে শেষ করা যাবে না। অন্যে আমার কাছে কোন অন্যায় করলে কড়ায় গন্ডায় ধরে রাখি। ক্ষমা করি ঠিকই কিন্তু ভুলে যাই না বরং মনে গেঁথে রাখি। পরিবেশ, পরিস্থিতিতে পড়লে তা আবার স্মরণ করিয়ে দিই। আমাদের মাথা অনেক ভাল। তাই আমার মনে হয়কি যিশুর মাথা বেশী ভাল ছিলোনা। অর্থাৎ আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণে অন্যায়, অপরাধ,পাপ করে থাকি তা যদি তিনি মনে রাখতেন তাহলে আমার আপনার অবস্থা কি হত! একদিন এক মুহূর্তে কি এ পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারতাম? অবশ্যই না! আমরা যে ভাবেই থাকিনা কেন তিনি আমাদের ভালোবাসেন। আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় না। বরং আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা উপচে পড়ে প্রতিনিয়তই।

পুনরুত্থান আমার আপনার কাছে কি দাবি করে। এখন যিশুর কোন হাত নেই! আমাদেরই হাত আছে অন্যকে সাহায্য করার। যিশুর কোন পা নেই আমাদেরই পা আছে অন্যের কাছে যেতে, পাশে দাঁড়াতে। যিশুর কোন চোখ নেই, আমাদেরই চোখ আছে অন্যকে (অভাবী মানুষ) দেখতে, সাহায্য করতে। যিশুর কোন মুখ নেই, আমাদেরই মুখ আছে যেন মঙ্গলবাণী ঘোষণা করি, ভাল কথা বলি।

আমাদের হৃদয় যেন সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখি, ভালোবাসি, স্থান দেই সবাইকে। পুনরুত্থান আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করে-রূপান্তরিত মানুষ হয়ে উঠার। আমরা যেন খ্রিস্টের হাত, পা ও মুখ হয়ে উঠি। তাঁর পুনরুত্থানের বার্তা ছড়িয়ে দেই সবার মাঝে।

যিশুখ্রিস্টে পুনরুত্থান আমাদের জন্য যে বাণী নিয়ে আসে -

- অন্তরে পবিত্রতা অর্জন ও তার বহিঃপ্রকাশ।
- যথার্থভাবে জীবনযাপন করা।
- অন্যকে সাহায্য সহভাগিতা করা।
- বিশ্বাসের ভিত মজবুত করা।
- অন্যের বিচার না করে নিজের দিকটা দেখা।
- পরিবারের শান্তি আনয়নের কাজ করা।

“প্রীতি শুভেচ্ছায় পুণ্যময় ইস্টার”

তার্সিসিউস গমেজ (তাসু)

বড় বিরহের ইস্টার-অকাল প্রয়াণের সাক্ষী এবার
কত তাজা প্রাণ ঝড়ে গেল অকাতরে
মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে
অসময়ে- যে ফুল না ফুটিতে-
বড়ই বেদনার।

এরা সবই অভাগা-ধর্মপল্লী হাসনাবাদ
ক্ষণজন্মা পুরুষ নারী- বিচার বিধাতার
স্বর্গবাসী হলো তারা-ডাক পরম পিতার
স্ত্রী, স্বামী সন্তান-দুঃখ ভার পিতা মাতার।

বাকী জীবন আমরণ, দুঃখের সাগর
সীমাহীন দুর্ভোগ, অশান্ত মন
স্নেহ প্রেম ভালোবাসা, আশীসে কাঙ্গাল
আশা আকাঙ্খা, বাসনার হয়েছে কবর।

ভাই হ্যামন, ব্যাংকার চমৎকার
বোন লিপি, কতই বা বয়স তার
সতেজ প্রাণ কেড়ে নিল, নাই প্রতিকার
সাক্ষী প্রমাণ বিদ্যমান, পেলনা বিচার।

অসীম কারিগর, জয়শিরা অসীম
চকের অঞ্জন দিলিপ ডমিনিক
বিধবা নারী ডেলফিনা (প্রিংকার মা)
সংগ্রামী জীবনান্তে মৃত্যু হলো আমেরিকা।

আরেক গৃহবধূ কঠিন রোগ যন্ত্রনায়
শোকে দুঃখে, স্বামী সন্তান রেখে
ম্যাগডিলান স্বর্ণালী এই এপ্রিলে
সবারে কাঁদিয়ে, ঝড়ে গেল অকালে।

মহা-আলোড়ন সৃষ্টিকারী বালক আকাশ
গোল্লা ধর্মপল্লীর অনাথ সন্তান
ষড়যন্ত্রের শিকার, সপিলে নিজ প্রাণ
অকালে ঝড়ে গেল, কেঁদে ওঠে মনপ্রাণ।

মানব বন্ধন, মিছিল আর্তনাদে
বৃথা গেল সবই, বিচার বাণী নিভৃতে কাঁদে
অসহায় কাঙ্গালের নীরব বেদনায়
অশ্রু ঝড়ে নেত্র পরে, নির্বিকার প্রতিপদে।

পহেলা বৈশাখ-নব বর্ষবরণ ১৪৩২ স্বাগতম
আনন্দ শোভাযাত্রায় হোক, প্রীতির বন্ধন
চৈত্র সংক্রান্তি শেষে, নব উল্লাসে ভয়ে মন
বিগত গ্লানি; দুঃখ ব্যথা ভুলে
নব উদ্যমের শুভক্ষণে।

পুণ্যময় ইস্টার, মৃত্যুকে প্রভু করিলেন জয়
সমাধি দুয়ার খোলা, হলেন মৃত্যুঞ্জয়
আল্লেলুইয়া ধ্বনিতে উল্লাসিত ধরা, আর
নাহি ভয়
তিনি মহান পরিত্রাতা, যিশু প্রেমময়।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার
৮৫ বছর

নয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তবুও ভয়

অসীম বেনেডিক্ট পামার

যুদ্ধ ও ভয় এই দু'টো বিষয় নিয়ে একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যুদ্ধ এবং ভয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভয় প্রায়শই সংঘাতের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে থাকে যার প্রতিফলন দেখতে পাই মানুষের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যা, স্থানচ্যুতি এবং সামাজিক ব্যাঘাতের মাধ্যমে ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং নিজ নিজ সমাজকে প্রভাবিত করে জীবনের অনিশ্চয়তা ডেকে আনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে আর্কডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডের হত্যা, জোট ব্যবস্থা, সোমে এবং ভার্দুনের মতো বড় যুদ্ধ, স্প্যানিশ ফ্লু মহামারী এবং জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উত্থান যা যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যু মূলত অনাহার, এক্সপোজার, রোগ, সামরিক সংঘর্ষ এবং গণহত্যার কারণে হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩৯-৪৫ খ্রিস্টাব্দে একটি বিশ্বব্যাপী সংঘাত, সর্বগ্রাসী শাসনের উত্থান, হোলোকাস্ট, মূল যুদ্ধ, নতুন প্রযুক্তি এবং মতাদর্শের উত্থান প্রতিপাদ্য সরবরাহ করে। প্রধান যুদ্ধবাজ ছিল অক্ষশক্তি - জার্মানি, ইতালি, জাপান এবং মিত্রশক্তি ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কিছুটা হলেও চীন। হিটলারের "নতুন জার্মানি" দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাত এবং বৃহত্তম যুদ্ধে পরিণত করেছিল।

একটি উত্তেজনাপূর্ণ বৈশ্বিক ভূদৃশ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান হুমকির মূল্যায়ন দৃশ্যমান। ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে ট্র্যাজেডি ও প্রহসনের মাধ্যমে। বিশ্ব ইতিমধ্যে মানব ইতিহাসের দু'টি সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কয়েক দশক পার হওয়ার পর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা আছে কি? নাকি সন্দিহান কিংবা সংশয়। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, আদর্শিক সংঘর্ষ এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা মূলত ইঙ্গিত বহন করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা।

সমসাময়িক ঘটনাবলী ইঙ্গিত দেয় যে ভয় পাওয়ার অনেক কিছু আছে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকেও বাড়িয়ে দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের মতো পশ্চিমও যুদ্ধের মধ্যে জ্বলছে। শেষ কথা, এশিয়াও যুদ্ধের আতঙ্কে। মতাদর্শগত সংঘর্ষসহ ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার আগ্রাসন দৃশ্যমান। বলাবাহুল্য, কূটনৈতিকভাবে দ্বন্দ্বের সমাধান হয়নি এখনও। ঐতিহাসিক মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আলোচিত যে বিষয়গুলো প্রতীয়মান তা হল ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য, ধর্মীয় পার্থক্য, দীর্ঘস্থায়ী ইস্রায়েল-ইরান-ফিলিস্তিন উত্তেজনা, ইয়ামেন, সিরিয়া এবং ইরাকের মতো আঞ্চলিক যুদ্ধ প্রধান।

দক্ষিণ চীন সাগর সম্পর্কিত চীন-মার্কিন একটি এশীয় সমস্যা। দ্বীপপুঞ্জের সামরিকীকরণ, চীনা ও আমেরিকান বাহিনীর মধ্যে নিয়মিত নৌ সামরিক মহড়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সামুদ্রিক সীমানা নিয়ে উত্তেজনা সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ায়।

এইবার আসা যাক, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং সাইবার হুমকির মত ঘটনাবহুল কিছু কথা। মাইক্রোসফটের প্রকাশিত রাশিয়া, চীন, ইরান, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাইবার গুপ্তচরবৃত্তি এবং হ্যাকাররা বিদ্যুৎ গ্রিড ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সহ জ্বালানি খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, এবং সর্বোপরি ইউক্রেন, ন্যাটো, ইইউ এবং অন্যান্য পশ্চিমা সংস্থাগুলির উপর বিশ্বব্যাপী সাইবার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

২০২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা অতিরঞ্জিত, মুদ্রাস্ফীতি যা উন্নত অর্থনীতিতে একটি মহামারী, চীনের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবণতা নিম্নমুখী যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংঘাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নয় এই স্লোগান যেন থাকে সর্বত্র। একটি জটিলবিহীন ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত নেটওয়ার্ক যা বিশ্বব্যাপী আধুনিক বিশ্বকে করবে সংঘাতমুক্ত এবং শান্তিময়। ❑

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা
পরিশোধ করেছেন কি?

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
গৌরবময় পথচলার ৮৫ বছর

পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৩ এপ্রিল - ১৯ এপ্রিল, ৩০ চৈত্র ১৪৩১ - ৬ বৈশাখ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ছোটদের আসর

মিলনেই আনন্দ

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

“মা ও বাবা আজ তো পূণ্য শনিবার এবং আগামীকাল প্রভু যিশুর “পুনরুত্থান পার্বণ”, কিন্তু পাশাপাশি উঠানে বসবাস করেও কাকার সাথে রাগ অভিমানে কথা না বলার পালা শেষ না করে কিভাবে আমরা পুনরুত্থান পার্বণ আনন্দ মনে পালন করবো? মা, বাবা চলো আজকের এই পুণ্য দিনে আমরা মন হতে সবকিছু ভুলে কাকার সাথে কথা বলি এবং সবাই আনন্দমনে যিশুর পুনরুত্থান পার্বণ উদ্‌যাপন শুরু করি।” কথাগুলো বলছিল অর্পা।

গ্রামের নাম অন্তপুর। একদম অজপাড়া গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে হাতিয়াখাল। খাল ঘেঁষে অর্পাদের ছোট বাড়ি। খুবই ছিমছাম ও সুন্দর বাড়ি। অর্পারা দুই ভাই ও এক বোন। বাবা একজন এনজিও কর্মী। মা স্থানীয় মিশনারী কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষিকা। অর্পাদের সুন্দর সাজানো গোছানো সংসার। অর্পার বাবারা দুই ভাই। অর্পার বাবা বড়। প্রায় দশ বছর হয় দাদু যিশুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। বাবা মারা যাবার পরও ভাইদের মাঝে সুন্দর সম্পর্ক থাকার ফলে প্রায় আট বছর দু'ভাই যৌথ পরিবারে বেশ সুন্দর ভাবে বসবাস করছিল। কারণ বর্তমান সময়ে যৌথ পরিবারে বসবাস একদম নেই বললেই হয়। গ্রামের মানুষ দুই ভাইয়ের আদর্শময় যৌথ পরিবারে বসবাস দেখে অনেকেই হিংসা করতেন। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিল খুব ভালো সম্পর্ক ও বিশ্বাস। এরই মাঝে ভালো এক সম্বন্ধ পাওয়ায় বেশ অল্প বয়সে অর্পার কাকাতো ভাই অমিত বিয়ে করে।

অর্পার কাকাতো ভাইয়ের বিয়ের পর হতেই কাকার সাথে সংসারের ছোট ছোট বিষয় নিয়ে দূরত্ব শুরু হতে থাকে বাবার। একদিন সামান্য পরিবারের মাসিক বাজার হিসাবপত্র নিয়ে ছোট ভাই বড় ভাইকে অনেক কথা শোনায়। এতে করে বড় ভাই মনে ভীষণ কষ্ট পায়। তারপরও নীরব থাকে। কিন্তু এই ঘটনার পর কু-বুদ্ধি দিয়ে অর্পার কাকাতো ভাইয়ের কুমতলবী শ্বশুর ও বৌ কাকাকে যৌথ পরিবার হতে আলাদা বা ভিন্ন হতে বাধ্য করে। একমাত্র আদরের ছোট ভাই হতে ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর হতেই অর্পার বাবা মনে ভীষণ আঘাত পায়। সেই আঘাতে আঘাতে ধীরে ধীরে দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা বলাও বন্ধ হয়ে যায়। একদম পাশাপাশি দুই উঠানে একই রক্তের দুই ভাইয়ের পরিবারে সবার সাথে সবার কথা বলাও বন্ধ। কেউ কাউকে দেখতে পারে না ও সহ্য করতে পারে না। এতে করে অর্পাও মানসিকভাবে ভীষণ কষ্ট পায়। অর্পা স্থানীয় কলেজ হতে আই. এ. পাশ করে ঢাকায় মনিপুরীপাড়া সিস্টারদের হোস্টেলে থেকে তেজগাঁও কলেজে অনার্স করছে। মাঝে মাঝে কলেজ ছুটি হলেই টিউশনি হতে ছুটি নিয়ে গ্রামে যায়। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে এসেও সে আগের মতো সুখ ও শান্তি পায় না। কারণ যে কাকা জন্মের পর হতে কোলে নিয়ে আদর স্নেহ যত্নে ও ভালোবাসায় তাদের বড় করেছে, সে কাকা আজ তাদের সাথে কথা বলে না। প্রায়শ্চিত্তকাল শুরুর পরই অর্পা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারের পুনরুত্থান পার্বণে এক সপ্তাহ পূর্বে ঢাকা হতে পরিবারের শপিং করে বাড়ি যাবে পুনরুত্থান পার্বণ পালন করতে। অর্পা নির্দিষ্ট দিনে বাড়ি এলো। বাড়ি এসে পুনরুত্থান পার্বণের বিভিন্ন প্রস্তুতিতে মাকে সাহায্য করছে। অবশেষে সবাইকে নিয়ে পুণ্য বৃহস্পতিবার ও পূণ্য শুক্রবারে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গির্জায় যাওয়া হয়। আজ পুণ্য শনিবার। পুণ্য শনিবার অর্পারা সবাই একসাথে গির্জায় যায় রাতের খ্রিস্টযাগে অংশ নিতে। একসাথে খেতে বসে। খাওয়া শেষ করে অর্পা পাস্কা পার্বণ উপলক্ষে ঢাকা হতে শপিং করা নতুন জামা কাপড় একে একে মা-বাবা ও ভাইদের হাতে তুলে দেয়। রাত তখন অনেক গভীর। সবাই ঘুমিয়ে পরেছে কিন্তু অর্পার চোখে ঘুম নেই। সে ধীরে ধীরে মা বাবার রুমে এসে নক করে বললো, মা বাবা আমি কি একটু আসতে পারি? উত্তর এলো এসো ভিতরে। অর্পা মা বাবার পাশে বসলো। বাবা জিজ্ঞেস করলো, তুই কি কিছু বলবি অর্পা? হ্যাঁ, আমি কিছু বলতে এলাম এতো রাতে। তুই বল, আমরা শুনি। “মা ও বাবা আজ তো পুণ্য শনিবার এবং আগামীকাল প্রভু যিশুর “পুনরুত্থান পার্বণ”, কিন্তু পাশাপাশি উঠানে বসবাস করেও কাকার সাথে রাগ অভিমানে কথা না বলার পালা শেষ না করে কিভাবে আমরা পুনরুত্থান পার্বণ আনন্দ মনে পালন করবো? মা, বাবা চলো আজকের এই পুণ্য দিনে আমরা মন হতে সবকিছু ভুলে কাকার সাথে কথা বলি এবং সবাই আনন্দ মনে যিশুর পুনরুত্থান পার্বণ উদ্‌যাপন শুরু করি।” একমাত্র অতি আদরের মেয়ের কথা শুনে মা ও বাবা ভীষণ হতবাক ও আবেগে আপ্লুত। মেয়ের কথায় তাদের শক্ত মনের পরিবর্তন হলো। অর্পার মা চোখের জল মুছতে মুছতে বললো, অর্পা তো ঠিকই বলেছে, ওদের ছাড়া আমরা কিভাবে পুনরুত্থান পার্বণ পালন করবো? চলো, আমরা এখনই ওদের ঘরে যাই ও কথা বলি। অর্পা তখন আনন্দে উল্লোসিত। মা বাবাকে নিয়ে পূণ্য শনিবার গভীর রাতে একমাত্র কাকার ঘরে গেলো। বাবা, কাকাকে জড়িয়ে ধরলো ও মা কাকী মাকে। এক আনন্দের পরিবেশে তখনই উভয় পরিবারের সবাই সবার সাথে হাসিমুখে কথা বললো এবং মিষ্টিমুখ করলো। রাতেই কথা হলো, আগামীকাল দুই ভাইয়ের পরিবার একসাথে পুনরুত্থান পার্বণের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবেন ও একসাথে পাস্কা পার্বণ পালন করবে মিলনের আনন্দে॥

রিমঝিম ফিলোমিনা গমেজ
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুল এণ্ড কলেজ

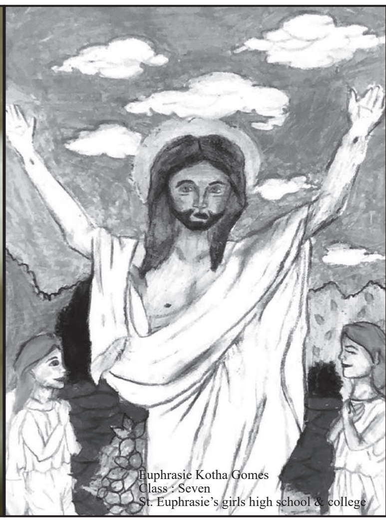

Euphrasie Kotha Gomes
Class : Seven
St. Euphrasie's girls high school & college

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পুণ্যসপ্তাহের প্রক্কালে সান্তা মারীয়া মাজোরে বাসিলিকায় প্রার্থনারত পোপ মহোদয়

তালপত্র রবিবার তথা পুণ্যসপ্তাহের আগের দিন শনিবার (১২/৪) বিকালে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস রোমে অবস্থিত সান্তা মারীয়া মাজোরে বাসিলিকা পরিদর্শনে যান। ভাতিকানের প্রেস অফিসের বিবৃতি অনুযায়ী পোপ মহোদয় বাসিলিকায় প্রবেশ করেন সালোস পপোলি রমানি (রোমের রক্ষাকারিণী রাণী) নামক মা মারীয়ার প্রতিকৃতির সামনে প্রার্থনা করতে। রোমের রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার প্রতি পোপ মহোদয়ের বিশেষ ভক্তি সর্বজনবিদিত। তিনসপ্তাহ আগে রোমের জেমেল্লি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েও পোপ মহোদয় অল্প সময়ের জন্য উক্ত বাসিলিকায় থেমেছিলেন। যেদিন তিনি একটি ফুলের তোড়া বাসিলিকার প্রধান পুরোহিত কার্ডিনাল রোনালদাস মাক্রিকাসের হাতে তুলে দিয়েছিলেন মা মারীয়ার কাছে নিবেদনের জন্য।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের পোপ নির্বাচনের পর দিন (১৪ মার্চ ২০১৩) থেকেই তিনি সালোস পপোলি রমানি (রোমের রক্ষাকারিণী রাণী) মা মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি শুরু করেন। বিশেষ করে যেকোন প্রৈরিতিক যাত্রা শুরু ও শেষে তিনি এই বাসিলিকায় এসে প্রার্থনা করেন। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় প্রৈরিতিক যাত্রা উপলক্ষে সর্বশেষ সান্তা মারীয়া মাজোরে বাসিলিকা পরিদর্শন করেন। তবে শনিবার (১২/৪) বিকালে পোপ মহোদয়ের ১২৬তম বাসিলিকা পরিদর্শন ছিল।

তালপত্র রবিবার উপলক্ষে সাধু পিতরের চত্বরে সমবেত তীর্থযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস

যন্ত্রণাভোগ রবিবারে ভাটিকানসিটির সাধু পিতরের স্কয়ারে সমবেত তীর্থযাত্রীদেরকে 'শুভ তালপত্র রবিবার ও শুভ পুণ্য সপ্তাহ' শুভেচ্ছা জানান পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস। খ্রিস্টযাগের শেষ আশীর্বাদের পরপরই হুইলচেয়ারে করে পোপ মহোদয় বাসিলিকা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ১০ মিনিট তীর্থযাত্রীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এর আগে গত রবিবারে (৬/৪) অসুস্থ ও চিকিৎসা সেবাকর্মীদের জুবিলী উপলক্ষে পুণ্যপিতা প্রকাশ্যে সাধু পিতরের চত্বরে বেরিয়ে আসেন। তালপত্র রবিবারে কুশল বিনিময়ের শেষে পোপ মহোদয় পুনরায় বাসিলিকার ভিতরে প্রবেশ করেন এবং কিছু সময় সাধু পিতরের সমাধিতে প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি যথাক্রমে সাধু দশম পিউস ও প্রয়াত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের সমাধিস্থানের কাছে নীরব প্রার্থনা করেন।

বিমান হামলায় মিয়ানমারে আরেকটি কাথলিক গির্জা ধ্বংস হয়েছে

মিয়ানমারে খ্রিস্টান অধ্যুষিত একমাত্র রাষ্ট্র চিনে দেশের সেনাবাহিনীর বিমান হামলায় সম্প্রতি একটি কাথলিক গির্জা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার মধ্যদিয়ে দেশটির সামরিক জান্তা ও বিরোধীদের মধ্যকার চলমান গৃহযুদ্ধের আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা সংগঠিত হলো। যার প্রভাব দেশের খ্রিস্টান ব্যক্তিবর্গ ও তাদের উপাসনালয়ের উপর দারুণভাবে পড়বে। হাখার ডায়োসিসের অংশ ফালাম শহরের ক্রাইস্ট দ্যা কিং গির্জায় গত ৮ এপ্রিল আক্রমণ করা হয়। সংবাদ সংস্থা ফিদেসের স্থানীয় সংবাদদাতা জানান, গির্জাটির ছাদ ও ভিতরের অংশের বেশিরভাগই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, যদিও দেয়ালগুলো এখনো ঠিকঠাক আছে।

স্থানীয় মণ্ডলীর অভাব পূরণের লক্ষ্যে অনেক ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে ১০০০ আসন বিশিষ্ট খ্রিস্টরাজার গির্জাটি নির্মাণ করা হয়। ৭৫ বছরের পুরাতন ছোট গির্জিকার স্থলে নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন এই গির্জার আশীর্বাদ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। বিমান হামলায় গির্জাটি ধ্বংস হওয়াতে ফালামের খ্রিস্টভক্তগণ মর্মাহত হলেও তারা গির্জাটি পুনঃনির্মাণ ও পুনঃস্থাপন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

গত নয়মাস ধরে ফালাম শহরটি জান্তা সামরিক বাহিনী ও চিনল্যাণ্ড প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংঘর্ষের ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। চিনল্যাণ্ড প্রতিরক্ষা বাহিনী শহরটি ঘিরে রাখে এবং ভীষণ সংঘর্ষের পর সামরিক বাহিনী ফালামের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে পালিয়ে গেলে চিডিএফ ফালামের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এমনিতর পরিস্থিতিতে বার্মার অন্যান্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ স্থানের মতোই ফালামেও বিমান থেকে বোমা বর্ষণ সহ কামান ব্যবহার করা হয়। বোমাগুলি বাড়িঘর, বিভিন্ন স্থাপনা এবং উপাসনালয়ে আঘাত হানে, যেমনটি ক্রাইস্ট দ্য কিং চার্চে ঘটেছে।

চিন মানবাধিকার সংস্থার মতে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে মায়ানমারের চিন রাজ্যে সেনাবাহিনীর বোমা হামলায় ৬৭টি গির্জাসহ ১০৭টি ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে।

রক্তাক্ত তালপত্র রবিবার ঈশ্বর আমাদেরকে দয়া করুন-আর্চবিশপ কুলবোকাস

ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধে আরেকটি ভয়ংকর অধ্যায় যুক্ত হলো ১৩ এপ্রিল, তালপত্র রবিবারে। উত্তর-পূর্ব ইউক্রেনের সুমি শহরের ট্রাজেডি তালপত্র রবিবারের উপাসনার পবিত্র ও শান্তিপূর্ণবোধকে শোকে ও ধ্বংসে পরিণত করেছে। রাশিয়ার সীমান্ত থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুমি শহরে মারাত্মকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করা হয়। তালপত্র রবিবারে সকাল ১০টার দিকে যখন ভক্তজনগণ উপাসনায় অংশ নিতে গির্জায় যাচ্ছিল তখন দু'টি ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র শহরের কেন্দ্রস্থলে আঘাত হানে। যার ফলে ঘটনাস্থলেই ১৫জন শিশুসহ ৩৪জন মৃত্যুবরণ করে এবং শ'য়ের অধিক আহত হয়। যারা পুণ্যসপ্তাহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল তারাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ভাতিকান নিউজকে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে, ইউক্রেনে ভাতিকানের অ্যাপোস্টলিক নুনসিও, আর্চবিশপ ভিসভালদাস কুলবোকাস বলেন, এই ধরণের বিবেকহীন সহিংসতার মুখে তারা অসহায়বোধ করছেন। নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রভুর প্রতি তাকিয়ে তাঁর আশ্রয়ের আশা করা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কেননা মনে হচ্ছে আর কোন শক্তি শান্তি বা জীবন রক্ষা করতে সক্ষম নয়। তালপত্র রবিবারে ইউক্রেনে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিশ্ব চার্চ পরিষদ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড

স্থাপিতঃ ০১/০৫/২০০৭ খ্রিঃ, রেজি. নং-০৫, তারিখঃ ১৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ,১ম সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০১ (আইন), তারিখঃ ০৫/০১/২০২৩ খ্রিঃ, ২য় সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০২ (আইন), তারিখঃ ২০/০৩/২০২৪খ্রিঃ
অফিসঃ নীড়-২৮, ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোনঃ +৮৮ ০২-২২৩৩১৪০০৪, মোবাইলঃ +৮৮ ০১৩২৯-৭২২৯৮৯, ই-মেইলঃ info@caccoltdbd.com, ওয়েবঃ caccoltdbd.com

সূত্র : কাক্‌কো/সিএস/২০২৫-৭৬ তারিখ : ১৫.০৪.২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টাব্দ কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর সকল প্রাথ মিক সদস্য সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী, ভোটিং ডেলিগেট এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত কাক্‌কো লিঃ-এর স্থায়ী কার্যালয়: নীড়-২৮, ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে ১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন সেক্রেটারী, ১ (এক) জন ট্রেজারার এবং ৮ (আট) জন সদস্য সরাসরি সকল ভোটিং ডেলিগেট-এর ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে প্রাথমিক সদস্য সমিতির সম্মানিত ভোটিং ডেলিগেটগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি কাক্‌কো লিঃ-এর কার্যালয় থেকে জানা যাবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
চেয়ারম্যান, কাক্‌কো লিঃ

টুটুল পিটার রড্রিকস্
সেক্রেটারী (কো-অপ্ট), কাক্‌কো লিঃ

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ও অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

সোনাবাজু গির্জার প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ মে ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ মঙ্গলবার সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পর্বোৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করা হবে। দেশে বিদেশে অবস্থানরত সকল ভক্তপ্রাণ ভাই বোনদের উক্ত পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এই পবিত্র পার্বণে যারা পর্বকর্তা হতে আগ্রহী তাদের জন্যে শুভেচ্ছা দান ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা মাত্র ও পবিত্র খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ (দুইশত) টাকা। ফাতিমা রাণী আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা খ্রিস্টযাগ
৪ মে - ১২ মে, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ
সময়: বিকাল ৪:৩০ মিনিট

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
১৩ মে, মঙ্গলবার ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ
সময়: সকাল ৯:৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে
ফাদার টমাস কোড়াইয়া
মোবাইল: ০১৭০৫-৩০৯৬৮৪
পাল-পুরোহিত এবং খ্রিস্টভক্তগণ

CARITAS DEVELOPMENT INSTITUTE (CDI) 1983

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'-র সকল পাঠক/পাঠিকাবৃন্দকে পাস্কাপর্ব উপলক্ষে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে

মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতায়ন একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার পূর্বশর্ত।

আমরা সম্পূর্ণ আবাসিক ও সর্বাধুনিক ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকি। আমাদের সঙ্গে আছেন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যারা সার্বক্ষণিক কারিতাস ও সমমনা প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা অর্জনে দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। আমাদের মেধাবী গবেষকদল অব্যাহতভাবে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, এ্যাকশন রিসার্চ, ইমপ্যাক্ট স্টাডিসহ যে কোনো সামাজিক গবেষণাসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আস্থা অর্জন করেছে।

পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ
কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ০২২২২২২৯৬২৫, ইমেইল- cdi@caritascdi.org
www.caritascdi.org

CARITAS কারিতাস BANGLADESH বাংলাদেশ

মহান খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পাঠক-পাঠিকাসহ সকলকে কারিতাস জানাচ্ছে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

- কারিতাস অর্থ “দয়ার কাজ” বা “সর্বজনীন ভালবাসা”।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে মিলন সমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশ মানুষের সহযোগী হতে চায়; বিশেষতঃ সেইসব মানুষের যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলো: মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষের মতো জীবন যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

মায়ের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ইউফ্রেজী মঞ্জু গমেজ

জন্ম: ৩১ জানুয়ারী ১৯৫০খ্রিষ্টাব্দ।

মৃত্যু: ৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

রাহুৎহাটি, বাইস্তারবাড়ি, হাসনাবাদ মিশন

দেখতে দেখতে তিনটি বছর কেটে গেল তোমার ভালোবাসা, স্নেহ মমতা, আদরের শূন্যতাকে ঘিরে। তোমার শূন্যতা, ভালোবাসা আমরা প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করি। তোমার আদর্শ, শিক্ষা আমাদের জীবন পথে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা ও শক্তি যোগায়। সব কিছুই জীবন্ত আর সতেজ যা আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে আছে। মা, আমরা তোমাকে খুব ভালোবাসি, তোমার কথা খুব মনে করি।

সন্তানদের জীবনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন পিতা মাতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মা ও বাবা, এই পৃথিবী থেকে তোমরা চলে যাওয়ায় আমরা তা অনুভব করতে পারি।

মা, আমরা সবসময় তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করি তোমার স্মৃতিময় জীবনের মধ্য দিয়ে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শে আমাদের বাকী জীবনটা পার করে দিতে পারি। তুমি আমাদের স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সুস্থ থেকে বিশ্বস্তভাবে আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে পারি যেভাবে তুমি করেছো। পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তোমার আত্মা স্বর্গসুখে চিরশান্তিতে বাস করতে পারে।

তোমারই শোকাহত,

পরিবারবর্গ।

লেখক ও গবেষক
উইলিয়াম অতুল-এর
খ্রিস্টান সমাজের ইতিহাস নিয়ে পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা

তিন খণ্ডে রচিত
বাঙলায় খ্রিস্টধর্ম

খ্রিস্টান সমাজের ইতিহাস

মুদ্রিত মূল্য
৩২০০.০০

একসঙ্গে
অর্ডার করলে
বিশেষ ছাড়!!

অর্ডার করতে ফোন করুন
01930 879794

অনলাইন অর্ডার করতে
www.rokomari.com/bhashachitra

ভাষাচিত্র

ভাষাচিত্র প্রকাশিত খ্রিস্টমণ্ডলীর
গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান
বই পেতে যোগাযোগ করুন

অর্ডার করতে ফোন করুন
01930 879794

অনলাইন অর্ডার করতে
www.rokomari.com/bhashachitra

এছাড়া বইগুলো
পাওয়া যাবে
প্রতিবেশীর বিভিন্ন
বিক্রয়কেন্দ্রে

খ্রিস্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রতিবেশী প্রকাশনী
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী
নাগরী বেরি বাঁধ
গাজীপুর

ভাষাচিত্র

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে--
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

২১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জন পিটার কস্তা
জন্ম: ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ.: কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত লতিকা জার্লেট কস্তা
জন্ম: ৪ এপ্রিল, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৮ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম:রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ.:কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

প্রকৃতির অমোঘ বিধান, "জন্মিলে মরিতে হইবে"। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল অনেক সময়, তোমরা চলে গেছ পরপারে, স্নেহ ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। তোমাদের স্নেহ ভালোবাসায় ধন্য আমরা। প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমাদের শূন্যতা। তোমাদের অমায়িক হাসি, সরলতা, সদালাপ, উদারতা, বন্ধু-বাৎসল্য, স্নেহপরায়ণতা, হৃদয়গ্রাহী ভালোবাসা আজও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয় নীরবে নিস্তব্ধতায়। তোমরা ছিলে, আছ, থাকবে আমাদের ভালোবাসা হয়ে, অন্ধকারে আলো হয়ে, সুদিন হয়ে প্রতিদিন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে–
ছেলে ও ছেলে বউ : পলাশ ও লিজা
মেয়ে : লিপি, নূপুর, ঝুমুর ও ঝুমা
মেয়ে জামাই : প্রদীপ, বিলাশ ও রিচার্ড
নাতি : স্ট্রীগ, রিদম ও পিটার-পার্থিব
নাতনি : স্ক্যাবি, স্ক্যালি, স্ক্যারি, লীথী, লরা, রায়না ও লিরিক।

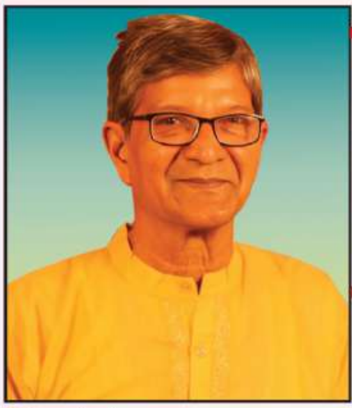

স্বর্গীয় ক্লেমেন্ট ফিলিপ রোজারিও

জন্ম: ১৫ জানুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ছোটগোল্লা (সরদার বাড়ী)

"মরণ সাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি"

প্রিয় বাবা,

গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে পরম পিতার অনন্তধামে। আমাদের বাবা ছিলেন ধর্মপ্রাণ, হাসি-খুশি, পরোপকারী, পরিশ্রমী একজন মানুষ। তোমাকে হারিয়ে আমরা বড় একা হয়ে গেলাম, আমাদের মা তোমাকে সারা ঘর খুঁজে বেড়ায়, তোমার কণ্ঠ, তোমার পায়ের শব্দ আজও কানে বাজে।

আমাদের বাবার মৃত্যুর সময় যেসকল ফাদার-সিস্টার, আত্মীয়-স্বজন আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের জানাই অজস্র কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

স্বর্গধাম থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন সর্বদা ভালো থাকি। সেইসাথে তোমার আদরের নাতী-নাতনীদের আশীর্বাদ দান করো, যেন আমরা সকলে মিলে মিশে শত কষ্টের মাঝেও তোমার দেখানো পথে চলতে পারি।

প্রেমময় পিতা তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমার ভালোবাসার
সন্তানেরা ও
স্ত্রী: মিসেস অরুণা রোজারিও
এবং পরিবারবর্গ
ছোট গোল্লা, সরদার বাড়ী

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র মাধ্যমে সকল পাঠক-লেখক, শুভানুধ্যায়ী ও সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে জানাই পুণ্যময় পাস্কা পর্বের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

কার্যকরী পরিষদ (২০২৫-২০২৮)

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ

আগষ্টিন প্রতাপ গমেজ
চেয়ারম্যান

ডিউক পি. রোজারিও
ভাইস-চেয়ারম্যান

পেপিলন হেনরি পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারি

জেমস ডি. রোজারিও
পরিচালক অর্থ ও প্রশাসন

ইউজিন কোড়াইয়া
ট্রেজারার

সুজয় পিউরীফিকেশন
সদস্য

প্রদীপ আগষ্টিন গমেজ
সদস্য

শুভ রঞ্জন চিসিম
সদস্য

ডন ক্লারেন্স হাওলাদার
সদস্য

লিংকার্স বি. রোজারিও
সদস্য

গিলবার্ট গমেজ
সদস্য

এইচ হিলারিশ হাউই
সদস্য

ঋণদান কমিটি

তার্সিসিউস পালমা
চেয়ারম্যান

উজ্জ্বল ফ্রান্সিস রিবেরু
সেক্রেটারি

রনী ফ্রান্সিস গমেজ
সদস্য

টমাছ টনী গমেজ
সদস্য

লিনসন গমেজ
সদস্য

আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি

রবার্ট সাইমন গোমেজ
চেয়ারম্যান

বীরেন বি. গমেজ
সেক্রেটারি

মায়া মনিকা গাঙ্গুলী
সদস্য

কাজল শিমন ডি' কস্তা
সদস্য

রনী মাইকেল গমেজ
সদস্য

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা-১৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Easter Issue - 13

পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৫

Regd. No. DA-33

১৩ - ১৯ এপ্রিল, ৩০ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ - ৬ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি....

প্রকল্পগুলোর কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণই আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার সার্থকতা।

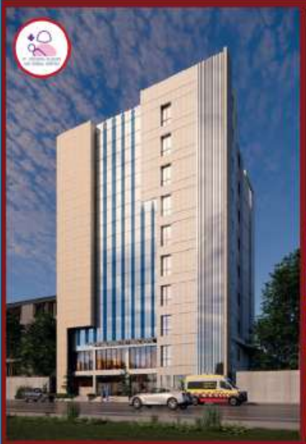

৫ বছরে দ্বিগুণ ≪ স্থায়ী আমানত ≫ ৯ বছরে তিনগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস	সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এল.টি
১৩.৫০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%	৬.০০%	৫.০০%

* ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
* ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৩০%।
* ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০%।
* ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৪০%।

SHORT TERM HDPS

One Year		Two Years		Three Years	
Total Deposit (1,000X12)	12,000/=	Total Deposit (1,000X24)	24,000/=	Total Deposit (1,000X36)	36,000/=
Interest 9%	585/=	Interest 9%	2,375/=	Interest 9%	5,411/=
Bonus (If Regular)	500/=	Bonus (If Regular)	1,000/=	Bonus (If Regular)	1,500/=
Amount Payable	13,085/=	Amount Payable	27,375/=	Amount Payable	42,911/=

MILLIONAIRE SCHEME

Monthly Installment	Total Diposit Amount	Total Benefit	Total Amount
3 Year			
23,850/=	858,600/=	1,41,400/=	1,000,000/=
5 Year			
12,900/=	774,000/=	2,26,000/=	1,000,000/=
10 Year			
4,850/=	582,000/=	4,18,000/=	1,000,000/=
12 Year			
3,700/=	532,800/=	4,67,200/=	1,000,000/=
15 Year			
2,630/=	473,400/=	5,26,600/=	1,000,000/=

[এছাড়াও ৫/১০ বৎসর মেয়াদী এইচডিপিএস ও ২৫ বছরে ২৫গুণ দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করার সুযোগ]

আগষ্টিন প্রতাপ গমেজ
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282, Dated 06.06.1978

পেপিলন হেনরি পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ ☎ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

চলতি সংখ্যার মূল্য ৫০ টাকা মাত্র

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885 Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100 Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.weekly.pratibeshi.org